প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ঃ মার্চ, 2020

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক জন-প্রশাসন **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ EPA : 1 পর্যায় ঃ 1 – 4

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 1	অধ্যাপক ইন্দ্রনীল বসু	অধ্যাপক অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়
পর্যায় 2	অধ্যাপক অসিতানন্দ রায়	অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য অধ্যাপক অমিয় চৌধুরী
পর্যায় 3	অধ্যাপক মৈত্রেয়ী বর্ধন রায়	অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য অধ্যাপক অমিয় চৌধুরী
পর্যায় 4	অধ্যাপক পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়	অধ্যাপক অমিয় চৌধুরী

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

ভূমিকা

পর্যায় ১

এই পর্যায়কে চারটি এককে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম একক জন-প্রশাসনের অর্থ, সংজ্ঞা ও পরিধি বর্ণনা করেছে। বেসরকারি প্রশাসনের সঙ্গে জন-প্রশাসনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলিও এই একক আলোচনা করেছে।

একক ২ ঃ এই একক জন-প্রশাসনের বিবর্তনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলো আলোচনা করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো জন-প্রশাসনকে কতটা উন্নত করেছে তাও আলোচনা করা হয়েছে।

একক ৩ ঃ একক তিন জন-প্রশাসনের এক বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করেছে। জন-প্রশাসন কি বিজ্ঞান, জন-প্রশাসনের সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক কি, অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও আইন-এর সম্পর্কের ওপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়।

একক ৪ ঃ চার নম্বর একক আলোচনা করেছে তুলনামূলক জন-প্রশাসন, উন্নয়ন জন-প্রশাসন এবং আধুনিক জন-প্রশাসনের আলোচনায় যে নতুন ধ্যানধারণা গড়ে উঠেছে এই এককে তারই উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে।

পর্যায় ২

এই পর্যায়ে চারটি একক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পর্যায় প্রাথমিকভাবে প্রশাসনে সংগঠনের ভূমিকা, স্তর বিন্যাস আদেশের ঐক্য, নিয়ন্ত্রণের পরিধি, সংগঠনে কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দর ভূমিকা, কর্মধারা ও কর্মীবর্গের ধারণা (ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে), কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ এবং ক্ষমতা প্রত্যর্পণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

একক ৫ ঃ প্রশাসনে সংগঠনের ভূমিকা, স্তরবিন্যাস, আদেশের ঐক্য এবং নিয়ন্ত্রণের পরিধি।

এই এককে আমরা সংগঠনের অর্থ এবং সংগঠনের আলোচনা দুটি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করব। আমরা স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা, সংগঠনে স্তরবিন্যাসের তাৎপর্য, উদ্দেশ্য, সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করব। এইসঙ্গে আদেশের ঐক্য, উহার সমস্যা ও সংশোধিত পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের এলাকা নিয়েও আলোচনা করব।

একক ৬ ঃ সংগঠনে কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দের ভূমিকা, কর্মধারা ও কর্মীবর্গের ধারণা, কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের কার্যাবলি ও কর্মীবর্গের কার্যকলাপ এবং ভারতে কর্মধারার কার্যাবলী ও কর্মীবর্গের আলোচনা।

যে-কোন সংগঠনে কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের একটা বিরাট ভূমিকা থাকে। সংগঠনে পরিচালনা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ইত্যাদির দায়িত্ব থাকে কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের ওপর। সেইজন্য এই এককে আমরা সংগঠনের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দের ভূমিকা ছাড়া কর্মধারা ও কর্মীবর্গের ধারণা, কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের কার্যাবলী ও কর্মীবর্গের কার্যকলাপ আলোচনা করব। উদাহরণস্বরূপ ভারতে কর্মধারার কার্যাবলী ও কর্মীবর্গের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করব।

একক ৭ ঃ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ

এই একক সংগঠনে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের উপর বিশেষ আলোকপাত করেছে। প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণ যেমন দেখা যায়, বিকেন্দ্রীকরণেরও প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার অভাবনীয় সাফল্য সংগঠনকে জটিল ও আকৃতিতে বিরাট করে নেয়। অনেক সময় সংগঠন ভৌগোলিক সীমানাও অতিক্রম করে। কেন্দ্রীকরণ তখন নিছক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বিকেন্দ্রীকরণ কেন্দ্রীকরণের বিকল্প হিসাবে কাজ করে থাকে।

একক ৮ ঃ ক্ষমতা প্রত্যপর্ণ

এই একক অন্যান্য এককগুলি থেকে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। প্রশাসনের ক্ষমতার প্রত্যপর্ণ, তার সুবিধা-অসুবিধা এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতার প্রত্যর্পণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না—এই একক এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছে।

পর্যায় ৩

আগের দুটি পর্যায় আপনারা জন-প্রশাসন সম্বন্ধে নানাভাবে জানতে পেরেছেন। প্রথম পর্যায়ে জন-প্রশাসনের সংজ্ঞা, উদ্ভব, সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে জন-প্রশাসনের সম্পর্ক, জন-প্রশাসনের আধুনিক তত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। পর্যায় ২ জন-প্রশাসন আলোচনার বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করেছে। পর্যায় ৩ জন-প্রশাসনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করেছে। বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য জন-প্রশাসনকে দুই দিক থেকে দেখা যেতে পারে। একটা হল তার কাঠামোগত দিক আর একটি প্রক্রিয়াগত। এই দুটিই কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল। জন-প্রশাসন আলোচনা বিভিন্ন শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে অনেক সমৃদ্ধি হয়েছে। যেমন, ব্যবস্থাপনাশাস্ত্রের এবং মনস্তত্ত্বের প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা জন-প্রশাসনশাস্ত্রের কাজে লাগানো হয়েছে। যোগাযোগ সংক্রান্ত তত্ত্বও এখন জন-প্রশাসনশাস্ত্রের আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য এই পরিচ্ছেদের আলোচনার বিষয়গুলি আমরা কতকগুলি এককে ভাগ করব। আপনাদের সহজভাবে বোঝার জন্য প্রতি এককে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল ঃ

একক ৯ ঃ এই এককে জন-প্রশাসনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি আলোচনা করা হয়েছে।

একক ১০ ঃ প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এই এককে আলোকপাত করা হয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হার্বার্ট সাইমনের তত্ত্বের উপযোগিতা।

একক ১১ ঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা হল জন-প্রশাসন আলোচনার মুখ্য বিষয়। একক-১১ যোগাযোগ ব্যবস্থার নানাদিক, যথাক্রমে—যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, প্রণালীসমূহ, বিভিন্ন রূপ ও প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ করেছে।

একক ১২ এবং একক ১৩ ঃ এই এককগুলিতে জন-প্রশাসনের নেতৃত্ব ও সমন্বয়ের উপর বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

পর্যায় ৪

পর্যায় ৪ জন-প্রশাসন তত্ত্ব-এর শেষ পর্যায়। আপনারা প্রথম তিনটি পর্যায়ে জন-প্রশাসন সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পেরেছেন। এই তিনটি পর্যায়ে জন-প্রশাসন তত্ত্বের সংজ্ঞা, প্রকৃতিসহ জন-প্রশাসনের উদ্ভব, জন-প্রশাসনে আধুনিকীকরণ ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। জন-প্রশাসনের আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে আর কতকগুলি বিষয় যেমন বিকেন্দ্রীকরণ, এককেন্দ্রীকরণ, সমন্বয়, নেতৃত্ব-এর উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। এই বিষয়গুলি আলোচনার পর যে বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের জানা প্রয়োজন কর্মীদের কর্মস্পৃহা ও প্রেষণা (Motivation)। এই পর্যায়কে চারটি এককে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ক্রমিক অনুসারে একক ১৪-র আলোচনায় আছে কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা (Motivation) একটি ধারণা, কি ভাবে জন-প্রশাসন বিজ্ঞানে, গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। এই এককে আরও আলোচিত হয়েছে সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে কর্মস্পৃহার সম্পর্ক।

একক ১৫ ঃ বিশদভাবে কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সংক্রান্ত তত্ত্বাবলী উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

একক ১৬ ঃ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা আলোচনায় হার্জবার্গ ও আব্রাহাম মাসলোরের তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

একক ১৭ ঃ ডগলাস ম্যাকগ্রেগরসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের তত্ত্বের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EPA – 1

জন-প্রশাসনের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায় 1

একক 1 ❑ জন-প্রশাসন ঃ অর্থ ও পরিধি 9

একক 2 ❑ জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তন 23

একক 3 ❑ জন-প্রশাসনের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক 34

একক 4 ❑ তুলনামূলক জন-প্রশাসন, উন্নয়ন-প্রশাসন ও আধুনিক জন-প্রশাসন 42

পর্যায় 2

একক 5 ❑ প্রশাসনে সংগঠনের ভূমিকা, স্তরবিন্যাস, আদেশের ঐক্য এবং নিয়ন্ত্রণের পরিধি 50

একক 6 ❑ সংগঠনে কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের ভূমিকা 70

একক 7 ❑ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ 81

একক 8 ❑ ক্ষমতা প্রত্যর্পণ 89

পর্যায় 3

একক 9 ❑ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া 94

একক 10 ❑ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 97

একক 11 ❑ যোগাযোগ ব্যবস্থা 104

একক 12 ❑ নেতৃত্ব 114

একক 13 ❑ সমন্বয় 122

পর্যায় 4

একক 14 ❑ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা 134

একক 15 ❑ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সংক্রান্ত তত্ত্বাবলী 148

একক 16 ❑ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সৃষ্টি সম্পর্কে ফ্রেডরিক হার্জবার্গের ও আব্রাহাম মাসলোর তত্ত্ব 155

একক 17 ❑ ডগলাস ম্যাকগ্রেগরের পরিচালনা তত্ত্ব এবং কৃস আরগিরিস-এর তত্ত্ব 163

একক ১ ❑ জন-প্রশাসন ঃ অর্থ ও পরিধি

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ প্রস্তাবনা
১.২ জন-প্রশাসনের অর্থ ও সংজ্ঞা
১.৩ জন-প্রশাসনের চরিত্র ও আলোচনাক্ষেত্র
১.৪ জন-প্রশাসন বা সরকারী প্রশাসন ও ব্যক্তিগত বা বেসরকারী প্রশাসন
১.৪.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য
১.৪.২ মূলধন সংক্রান্ত পার্থক্য
১.৪.৩ রাজনৈতিক চরিত্র
১.৫ সারাংশ
১.৬ অনুশীলনী
১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- জন-প্রশাসনের অর্থ ও সংজ্ঞা
- এই বিষয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্টা
- পরিধি ও আলোচনাক্ষেত্র
- জন-প্রশাসনের সঙ্গে বেসরকারী প্রশাসনের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

আপনারা নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন-প্রশাসনের স্নাতক-শিক্ষার্থী। আপনারা নিশ্চয়ই উদগ্রীব হয়ে আছেন যে, এই একক জন-প্রশাসন বিষয়ে কি কি আলোচনা করবে। একক এক প্রধানত অলোচনা করবে জন-প্রশাসনের অর্থ ও সংজ্ঞা, প্রকৃতি এবং সরকারী বা জন-প্রশাসন ও বেসরকারী প্রশাসনের সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে।

জন-প্রশাসন বিষয় হিসেবে নতুন নয়। মানব-ইতিহাসের মতন পুরাতন। তবে, স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পায় সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে গীর্জাব্যবস্থাকে আলাদা করা হয় এবং সরকারের প্রাধান্য মানুষ্য সমাজে স্বীকৃতি পায়। প্রত্যেক সমাজে জনস্বার্থে কিছু কাজ করা হয়। কাজগুলি হ'ল আইন-শৃঙ্খলা প্রণয়ন ও প্রতিরক্ষা। জন-প্রশাসন হ'ল এমনই প্রশাসন যে এই কাজগুলি করে থাকে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকারীরা রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু, এই উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব থাকে জন-প্রশাসনব্যবস্থার উপর। আধুনিককালে জন-প্রশাসন মানুষ্য জীবনে এক অতিপ্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। ক্রমশঃ এর পরিধি ও আলোচনাক্ষেত্র দ্রুত বিস্তৃতলাভ করেছে। শুরুতে জন-প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করত। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার অস্বাভাবিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জন-প্রশাসন শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। জন-প্রশাসন অধুনা বিভিন্ন সকারী আইন, আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার ও সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো যেমন এই জন-প্রশাসনের আওতায় এসে পড়েছে তেমনি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও এর প্রভাবমুক্ত নয়। জন-কল্যাণমূলক রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে জন-প্রশাসন বিশেষভাবে প্রসারলাভ করেছে। এমন কি দীর্ঘকালীন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্ত তৃতীয় বিশ্বে দেশগুলিও আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য 'উন্নয়ন প্রশাসন' রূপে জন-প্রশাসনকে গ্রহণ করেছে এবং অসামান্য ফলপ্রাপ্তি হয়েছে।

১.২ জন-প্রশাসনের অর্থ ও সংজ্ঞা

যদিও 'প্রশাসন' কথাটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তবুও এক কথায় প্রশাসনের মানে নির্দেশ করা খুব সহজ নয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা নানা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলি। রাস্তায় চলাকালীন আমরা যানবাহনের প্রশাসন, কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়মাবলীর নিয়ন্ত্রণ, এমন কি আমাদের দিনপঞ্জীর মধ্যেও প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আমরা কোনও কোনও ধরনের প্রশাসন খুঁজে পাই, অথচ 'প্রশাসন' নামক এই সর্বজনীন ধারণাটার সংজ্ঞা কী হতে পারে? ইংরাজী শব্দ 'Administer' কথাটি এসেছে ল্যাটিন কথা 'ad' এবং 'ministrare' থেকে, যার অর্থ 'to care for, or look after people.' —অর্থাৎ জনসাধারণের সুবিধার্থে কাজ, সেবা বা সাহায্য করা। অভিধানের ভাষায় বলতে গেলে 'প্রশাসন' বা 'Administration' হ'ল 'management of affairs' অর্থাৎ 'কাজকর্মের পরিচালনা'। L. D. White বলেছেন ঃ "প্রশাসন হ'ল নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যপূরণের জন্য বহু মানুষকে নির্দেশ দেওয়া, সমন্বিত করা ও নিয়ন্ত্রণ করা।" (Administration is the direction, co-ordination and control of many persons to achieve some purpose or objective) প্রশাসনবিশেষজ্ঞ Pfiffner এবং Presthus তাঁদের Public Administration বইতে বলেছেন ঃ 'প্রশাসন হ'ল কাংক্ষিত লক্ষ্যপূরণের জন্য মানুষের এবং বস্তুগত উৎপাদনের মিলিত সংগঠন ও নির্দেশন। ('Administration is the organisation and direction of human and material resources to achieve desired ends.') —এই সকল ধারণা থেকে একটা জিনিস ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হচ্ছে যে, 'প্রশাসন' সব রকম মিলিত প্রয়াস, প্রচেষ্টা বা উদ্যোগের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞের মতামত একত্রিত করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে

পৌঁছতে পারি যে, প্রশাসনের উৎপত্তি ঘটে সভ্য মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা থেকে, যার দ্বারা সে যথাযথ পরিচালনব্যবস্থা ঘটিয়ে তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে, মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী। মানুষের সমস্ত কাজই প্রায় যৌথ ও সমবায়মূলক। তাই 'প্রশাসন' মানবজীবনের প্রতি পদক্ষেপেই বিরাজমান। সাধারণ সভায় প্রশাসন হ'ল একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সরকারী, বেসরকারী, ব্যক্তিগত, ছোট-বড় সমস্ত উদ্যোগ বা প্রয়াসকেই বাস্তব রূপ দেওয়া হয়।

প্রত্যেক সমাজব্যবস্থাতেই আমরা দেখি যে, কিছু কিছু কার্যকলাপ সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে, যে সকল কার্যের মূল লক্ষ্য হ'ল লোকহিত বা জনকল্যাণ। যথা—আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা, শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা প্রভৃতি। জন-প্রশাসন প্রধানত এই সকল কাজকর্ম নিয়ে রত। অর্থাৎ প্রশাসন কথাটি যখন সরকারী কার্যকলাপ ও সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখনই সরকারি প্রশাসন, জন-প্রশাসন বা জন-প্রশাসন কথাগুলি এসে পড়ে। জনস্বার্থ বা জনমুখী উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত বলেই জন-প্রশাসন নামটি বেশিরভাগ লেখকই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। কিন্তু, তলিয়ে দেখলে মনে হয় কারণটি কেবলমাত্র তা নয়। শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য যে সংগঠন প্রয়োজন, সেই সংগঠন গঠিত হয় জনগণের মধ্য থেকেই, তাদের দিয়ে যারা তাদের কর্মদক্ষতা প্রমাণ করেছে নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ; তাছাড়া এই সংগঠন পরিচালিত হয় জনগণের তহবিলের সাহায্যে—অতএব সব দিক থেকেই 'জন-প্রশাসন' জন-কেন্দ্রিক, যদিও জনগণের স্বার্থে প্রশাসন বলে বিষয়টি মূলত জন-প্রশাসন নামে অভিহিত।

জন-প্রশাসন এক ধরনের ক্রিয়াকলাপ হিসেবে নতুন নয়। নতুন নয় এই কারণেই যে, যখনই সরকার বিরাজ করেছে সেই সরকার কোনও না কোনও প্রকার প্রশাসনিক সংগঠনের সাহায্যে তার পরিকল্পনা চরিতার্থ করেছে। তবুও গবেষণার এক বিষয় হিসেবে জন-প্রশাসন কোনও দীর্ঘ ইতিহাস দাবি করতে পারে না। তবে মনে রাখতে হবে যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা শুধুমাত্র এ যুগের নয়, অতীতেও এর অস্তিত্ব ছিল। কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারতেও তৎকালীন বিধি-ব্যবস্থার অনেক উল্লেখযোগ্য অলোচনা পাওয়া যায়। মিশরের পিরামিড নির্মাণ, জুলিয়াস সিজারের সৈন্য পরিচালনা বা বিপুল রোম সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা—এ সকল সফল প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা যায়। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীরা অনুভব করতে লাগলেন যে, সরকারকে তার গুরুদায়িত্ব আরও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হ'লে, জন-প্রশাসনকে একটি গবেষণার বিষয় হিসেবে আলাদা করে দেখা দরকার। বলাই বাহুল্য যে, সরকারের চিন্তাধারা বা পরিকল্পনা প্রগতিশীল হ'লেই যে জনগণ উন্নত বা লাভবান হবে এমন কোনও কথা নেই। জন-প্রশাসনিক সংগঠন যদি সুদৃঢ় বা কর্মদক্ষতায় নিপুণ না হয় তাহ'লে কোনও পরিকল্পনাই সরকার ঠিকভাবে রূপায়িত করতে পারবে না। এ রকম চিন্তাধারা আমরা সুস্পষ্টভাবে পাই Woodrow Wilson-এর রচনায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৮০-র দশকে অধ্যাপক উইলসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন-প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক করুণ অবস্থা লক্ষ্য করলেন। দেখলেন যে, নানাপ্রকার দুর্নীতি, দুষ্কর্ম, অনাচার এবং বিশৃঙ্খলা, জন-প্রশাসনের সংগঠনটিকে একেবারে রুগ্ন ও জর্জরিত করে ফেলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই উনি মন্তব্য করলেন যে, সংবিধান রচনা করা, কোনও সংবিধান কার্যকরী করার থেকে ঢের সহজ এবং তখন থেকেই উইলসন বুঝলেন যে, জন-প্রশাসনকে একটি গবেষণার বিষয় হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। ১৮৮৭ সালে উনি সেই বিখ্যাত মন্তব্য করলেন—'There should be a Science of

administration which shall seek to straighten the paths of government, to make its business less unbusinesslike, to strengthen and purify its organisation, and to crown its duties with dutifulness." 'The Study of Administration' প্রবন্ধে উইলসন জন-প্রশাসনকে একটি পৃথক পঠন পাঠন, অধ্যয়ন ও সমাজ-বিজ্ঞানচর্চার নবীন শাখারূপে গড়ে তোলার কথাই বলেন নি, তিনি জন-প্রশাসনের বিজ্ঞান বলে একে অভিহিত করেছেন। মূলত এর উদ্দেশ্য হ'ল সরকার যাতে তার কাজকর্মে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করে এবং যাতে জন-প্রশাসনিক কাঠামোয় কোনও প্রকার দুর্নীতি আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ করতে না পারে। তাই উইলসনের মতে জন-আইনের ব্যাপক ও সুসংবদ্ধ প্রয়োগই হ'ল জন-প্রশাসন। ('Public Administration is the detailed and systematic execution of public law'.)

১.৩ জন-প্রশাসনের চরিত্র ও আলোচনাক্ষেত্র

জন-প্রশাসনকে নানা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এগুলিকে সাধারণভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ ব্যাপক ও সংকীর্ণ। L.D. White, Dimock—প্রভৃতি প্রশাসনবিজ্ঞানী প্রশাসন কথাটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। হোয়াইট বলেছেন, জননীতিকে প্রয়াগ ও কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত কার্যধারা অনুসরণ করে সেগুলি নিয়েই জন-প্রশাসন গঠিত। "Public Administration consists of all those operations having for their purpose the fulfilment or enforcement of public policy as declared by competent authority" আবার লুথার গুলিকের মতে, জন-প্রশাসন সরকারের শাসন বিভাগীয় কাজকর্মের সঙ্গে প্রধান সম্পর্কিত, যদিও এর সাথে আইন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগীয় স্বাভাবিক সমস্যাগুলিও জড়িত। "Public Administration is that part of the Science of administration which has to do with government, and thus concerns itself primarily with the executive branch where the work of government is done, though there are obviously administrative problems also in connection with the legislative and judicial branches." সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, জন-প্রশাসন এইরূপ সীমিত বা সংকীর্ণ অর্থেই বোঝা হয়। মার্শাল ডিমকের মতে, সরকারের কী ও কি ভাবে'র সঙ্গেই প্রশাসন জড়িত। তিনি আরও বলেছেন যে, জন-প্রশাসনকে অনেক সময় সরকারের সামগ্রিক কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু, এই ধারণা অনাবশ্যক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অতএব, তিনি মনে করেন যে, জন-প্রশাসন সরকারের প্রশাসনিক কার্যাবলীর সঙ্গেই সম্পর্কিত, কারণ জন-সংস্থাগুলির কার্যক্রম পরিচালনা করাই জন-প্রশাসনের একমাত্র বা অন্তত, প্রধান কাজ। প্রখ্যাত প্রশাসনবিদ অধ্যাপক উইলোবির মতে 'সরকারের আইন-বিভাগের দ্বারা ঘোষিত এবং বিচার-বিভাগের দ্বারা ব্যাখ্যাত আইনগুলির প্রশাসনিক প্রয়োগই হ'ল জন-প্রশাসনের প্রকৃত কাজ' ('Administrative function is the function of actually administrering the law as declared by the legislature and interpreted by the judicial branches of government.')

যদিও জন-প্রশাসনের ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্য কোনওভাবেই অগ্রাহ্য করা যায় না, তথাপি মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক যুগ, পরিকল্পিত উন্নয়নের যুগ আর আধুনিক রাষ্ট্র প্রশাসনিক রাষ্ট্র (Administrative State)। এহেন পটভূমিতে জন-প্রশাসনকে আরও কর্মদক্ষ এবং সুদৃঢ় করে তোলবার জন্য জন-প্রশাসনকে সংকীর্ণ বা সীমিত অর্থে মেনে নেওয়ার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সব রাষ্ট্রেই প্রশাসনিক কার্যকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং

আজকে যে কোনও রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা হ'ল সরকারী কাজের পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ, পরিধি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা।

জন-প্রশাসনের মূল তাৎপর্য হ'ল এটি, কোনও ব্যক্তিগত কর্মপ্রয়াস নয়, যৌথ প্রয়াস। প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ কার্যক্ষেত্রে মানবিক আচরণেরই প্রতিফলন। মানুষের সহযোগিতা, সমন্বয় প্রভৃতি হ'ল মানবিক উপাদান ; অন্যদিকে উন্নয়ন, উৎপাদন, শ্রমবিভাগ, উৎকর্ষ প্রভৃতি হ'ল বস্তুগত উপাদান। প্রশাসনের একটি সামাজিক তাৎপর্যও আছে। একটি সামাজিক উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করার স্বার্থেও প্রশাসনকে ব্যবহার করা হয়। ই. এন. গ্ল্যাডেনের মতে, একটি সচেতন জনমুখী উদ্দেশ্যকে কার্যকর করাই হ'ল জন-প্রশাসনের লক্ষ্য। কাজেই, তলিয়ে দেখলে জন-প্রশাসনের তাৎপর্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আন্দাজ করা যায়। প্রথমত, জন-প্রশাসনিক বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে সরকারের কর্মদক্ষতার কিভাবে বৃদ্ধি ঘটানো যায় তার ধারণা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, জন-প্রশাসন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, যারা জন-প্রশাসন সংক্রান্ত নানা কর্মে রত, তারা তাদের আরও উন্নত করে তোলার সুযোগ পায় এবং পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে যে, কেবল সরকার বা সরকারী কর্মচারীদের নয়, তাদেরও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে প্রশাসনের সাফল্যের পেছনে। সাধারণ মানুষের সহযোগিতা ছাড়া বা তাদের দায়িত্বশীল আচরণ ছাড়া কোনও জন-প্রশাসন ব্যবস্থাই সফল হ'তে পারে না।

উইলসনের মতে, প্রশাসনিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিরই সহায়ক নয়, সরকারী কার্যালয়ের সাংগঠনিক ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষেরও বৃদ্ধি ঘটায়। শাসনতান্ত্রিক বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার পঠন-পাঠনের দু'টি মূল উদ্দেশ্য আছে ঃ (১) সরকার সুষ্ঠুভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে কী করতে পারে সে সম্পর্কে ধারণালাভে সাহায্য করা (efficiency) এবং (২) কত কম শক্তি বা অর্থ ব্যয় করে কতটা দক্ষ ও সফলভাবে সরকার কাজ করতে পারে সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা (economy)। কিন্তু কেবলমাত্র এই দু'টি উদ্দেশ্যই যদি জন-প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হয়, তাহ'লে জন-প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য আন্দাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, এই ধরনের উদ্দেশ্য তো যে কোনও যৌথ প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষতা (efficiency) আর মিতব্যয়িতা (economy) ছাড়াও জন-প্রশাসনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে—সরকারী আমলা বা কর্মচারিগণ কতটা দক্ষভাবে ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন এবং তাঁদের কাজের মাধ্যমে জনস্বার্থকে (public interest) কতটা তুলে ধরতে পারেন—এই বিষয়টিই সরকারী প্রশাসনের আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনগণের স্বার্থচিন্তা ব্যতীত জন-প্রশাসনের বিজ্ঞান ভাবাই যায় না।

এই কারণেই আধুনিক জন-প্রশাসনের ক্রম-রূপান্তর ঘটেছে। অতীতের দৃষ্টিভঙ্গি আর বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। প্রথমত, প্রশাসনিক উদ্দেশ্যের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক কার্যাবলীর সংখ্যা বৈচিত্র্য ও জটিলতায় বিশাল আকার ধারণ করেছে। তৃতীয়ত, পরীক্ষা ও ভ্রান্তির মাধ্যমে এই ব্যবস্থা পদ্ধতিগতভাবে সুশৃঙ্খল অভিজ্ঞতানির্ভর জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। Pfiffner এবং Presthus তাই বলেছেন—"Its purposes have been completely re-oriented, its functions have enormously increased in number, variety and complexity, and its methodology has grown from trial and error stage into an orderly discipline with an organised, ever increasing body of knowledge and experience."

কিন্তু জনগণের স্বার্থসিদ্ধিই যদি জন-প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হয়, তাহ'লে প্রশ্ন জাগে জনস্বার্থের সংজ্ঞা কি? জনস্বার্থবাদীদের মূল বক্তব্য হ'ল ঃ প্রথমত, সরকার ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্রের আমলারা যদি ক্ষমতাসীনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের নিজ স্বার্থ বা প্রভাবশালী চাপ-সৃষ্টিকারী স্বার্থগোষ্ঠীর অনুকূলে সরকারী সিদ্ধান্তগ্রহণ করে তবে 'জনস্বার্থ' বিপন্ন হবে। তাছাড়া, অনেকে মনে করেন যে, আমলাতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে একটি অচেতন অনুভূতিহীন যন্ত্র (mindless machine) যা সরকারী সকল সিদ্ধান্তকেই বাঁধাধরা নিয়মে, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যকর করে। তাছাড়া, হার্বার্ট সাইমন মনে করেন যে, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলি সব সময় দক্ষতা বা ব্যয়সংক্ষেপের ওপর নির্ভর করে না—এগুলি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের উপরও নির্ভর করে। অতএব, যে কোনও জন-প্রশাসন ব্যবস্থাই যে বৃহত্তর জনগণের স্বার্থ পূর্ণ করবে এ কথাই কখনই নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। জনস্বার্থ কিভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, এ বিষয়ে নানা মতবাদ ক্রমশ গড়ে উঠেছে। এগুলিকে সাধারণভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—(ক) স্বজ্ঞাবাদী দর্শন (Intuitionist philosophy)— জটিল ও পরস্পরবিরোধী সমস্যার সৃষ্টি হ'লে কোনও পরিস্থিতিকে প্রশাসক তার নিজের ধ্যান-ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তার নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, তখন সেই মতই জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বলে গ্রাহ্য হবে। অর্থাৎ স্বজ্ঞাবাদী তত্ত্ব মনে করে যে, কোনও পরিস্থিতিতেই প্রশাসক নিজস্ব মেধা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে সমস্যা সমাধান করবেন; কোনও প্রচলিত পদ্ধতির আশ্রয় নেবেন না। (খ) পরমোৎকর্ষবাদ (Perfectionism)—এই মতবাদে যারা বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন যে, কর্মকুশলতা বা যোগ্যতাবৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের স্বার্থের সুপরিচালনা ও উন্নয়ন বৃদ্ধি করা যায়। সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত, অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের সর্বপ্রকার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই সরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে চালনা করতে হবে। (গ) উপযোগিতাবাদী দর্শন (utilitarian philosophy) ঃ এই মতাদর্শের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হ'লেন জেরেমি বেন্থাম ও জন্ স্টুয়ার্ট মিল্। এঁদের মূল বক্তব্য হ'ল, সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ (greatest good of the greatest number) এবং এই মতবাদ জনস্বার্থতত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে। জনস্বার্থকে পরিমাপ করা যায় সামাজিক সুখ (social happiness)-এর হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা। (ঘ) ন্যায়বিচারতত্ত্ব (Justice Theory)—সরকারী প্রশাসন সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং একটি নৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে কাজ করবে। জন রল্‌স্ মনে করেন যে, সমাজে অর্থ বা সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে সমতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না ঠিকই, কিন্তু এ বিষয়ে দু'টি নিয়ম মেনে চলা উচিত—(১) সকল ক্ষেত্রে দেখা উচিত যে, সুযোগ-সুবিধার যাই তারতম্য থাকুক না কেন, সেই সকল তারতম্যের দ্বারা সাধারণ মানুষ যেন উপকৃত হয়—যথা, হরতালের দিন চিকিৎসকরা গাড়িতে চলাচল করতে পারে (২) তাছাড়া, কোনও কোনও পদের সঙ্গে যদি বিশেষ সুবিধা যুক্ত থাকে, তাহ'লে খেয়াল রাখা দরকার যে, সেই সকল পদে যাতে জনগণের যে কেউই নিজ গুণে আসীন হ'তে পারে। এই দু'টি ধারা অনুসরণ করলে, সামাজিক শক্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

উপরোক্ত মতবাদগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, এদের কোনওটাই ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন নয়। স্বজ্ঞাবাদী তত্ত্ব প্রশাসনিক তত্ত্ব হিসেবে অচল। কারণ, এই তত্ত্ব প্রচলিত ব্যবস্থাকেই সমর্থন করে এবং এটি প্রশাসনিক পরিচালনার উপযোগী নয়। পরমোৎকর্ষবাদ আবার অগণতান্ত্রিক এবং অভিজাতবাদী। উপযোগিতাবাদী মতাদর্শ যদিও সামাজিক কল্যাণের কথা বলে, তথাপি এই মত মুষ্টিমেয় বা সংখ্যালঘুগোষ্ঠীর স্বার্থের কোনও খেয়াল

রাখে না। কাজেই, এটিও সংখ্যালঘুগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে গেলে, অগণতান্ত্রিক এবং এই সব মতবাদের তুলনায় রলসীয় ন্যায়বিচার তত্ত্বকেই অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

তবে কোনও মতই পুরোপুরি অগ্রাহ্য করার কোনও কারণ নেই। সমাজ প্রগতিশীল, পরিবর্তনশীল। কাজেই, যে পটভূমিতে জন-প্রশাসন বিরাজ করে, সেখানে জনগণের স্বার্থ নির্ধারণের কোনও নীতিই চিরন্তন বা চিরস্থায়ী বলে মেনে নেওয়া যায় না। পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রশাসককে তাঁর নিজের বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিচারবোধ, অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে নির্ধারণ করতে হবে যে, জনস্বার্থকে কি ভাবে প্রকৃতপক্ষে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। এবং এই প্রসঙ্গেই মেনে নিতে হয় যে, জন-প্রশাসন কেবলমাত্র বিজ্ঞান নয়, এটি পুরোমাত্রায় একটি কলাও কারণ প্রশাসকের কলাকৌশলকে কোনওভাবেই অগ্রাহ্য করা যায় না।

বর্তমানে সরকারী প্রশাসনের আলোচনাকে কতকগুলি সুস্পষ্ট গন্ডিতে (field) বিভক্ত করা যায়ঃ প্রথমত, রাষ্ট্রনীতি (politics) ও প্রশাসনের (administration) তুলনামূলক একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই তুলনামূলক আলোচনা বিশ্লেষণধর্মী (analytical) ও বাস্তবধর্মী (concrete) উভয়ের আলোকেই করা যেতে পারে। রাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসনের আদর্শ ও প্রক্রিয়াগত পার্থক্য প্রথম শ্রেণীভুক্ত ও উভয়ের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তাদের ভূমিকা দ্বিতীয় শ্রেণীর পার্থক্যের মধ্যে পড়ে। রাজনীতিকে সামাজিক প্রক্রিয়া (social process) হিসেবে বর্ণনা করে বলা হয় এটি সংগঠন ও ক্ষমতার শক্তি হিসেবে চিহ্নিত। রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, আইনসভা, ঊর্ধ্বতন রাজনৈতিক শাসনকর্তৃপক্ষের (higher echelons of the political executive) আচার-আচরণ 'রাজনীতির' পর্যায়ভুক্ত হয়। অপরদিকে, প্রশাসন হ'ল শাসনপরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া যা সরকারের আচার-আচরণ ও কর্মদক্ষতার বিচার-বিশ্লেষণ করে। বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, আমলা ও সরকারী কর্মচারীর আচার-আচরণ এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, এই পর্যায়ে সরকারী প্রশাসনের আলোচনায় বিভিন্ন শাসননীতির ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ও পরিচালনবিজ্ঞানের (Management Science) উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটিও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তৃতীয়ত, সরকারী সিদ্ধান্ত (governmental decisions)-এর প্রভাব সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রিয়াকলাপ এবং অন্যান্য সরকারী ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও এই পর্যায়ে সরকারী প্রশাসনের আলোচনার একটি বিশেষ গণ্ডি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

তাছাড়াও মনে রাখতে হবে, কোনও গবেষণার বিষয় স্থগিত থাকতে পারে না। বর্তমান রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র (welfare state)। যেমন, এই রাষ্ট্রের পরিধি বেড়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশাসনের গুরুভারও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, বেসরকারী সংগঠনের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ক্রমাগতই তার নিজের পরিধি গুটিয়ে আনার চেষ্টা করছে। ফলে, সরকার এখন একমাত্র কারক হিসেবে (doer) নিজেকে পরিবেশন না করে, এক সহায়কের (enabler) ভূমিকায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে জন-প্রশাসনকেও পরিবর্তনশীল এক গবেষণার বিষয় হিসেবে মেনে নেওয়া হচ্ছে। সরকারী কার্যকলাপের পরিধির বিস্তার, শাসনতান্ত্রিক সংস্থাসমূহের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার (discretionary powers) প্রকাশ এবং পেশাদারী ও দক্ষকর্মীর অধিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা শাসনতান্ত্রিক বা প্রশাসনিক রাষ্ট্রনীতির পরিধি বিস্তারের সহায়ক হয়েছে বলা যেতে পারে।

সরকারী প্রশাসনের পরিধি বিস্তারে রাষ্ট্রনীতির মত বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গীও (Pluralist approach) উল্লেখযোগ্য ভূ

মিকা গ্রহণ করেছে। অনেক মার্কিন চিন্তাবিদ তাই 'শাসনতান্ত্রিক বহুত্ববাদ'-কে (administrative pluralism) রাজনৈতিক বহুত্ববাদের প্রতিচ্ছবি মনে করেন। প্রশাসনকার্যে গোষ্ঠী-রাজনীতি দু'ভাবে কাজ করে; বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতামূলক আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন সরকারী পরিষেবা সংস্থার (public service groups) মাধ্যমে নিজস্ব ভূমিকা পালন করে। কেউ কেউ শাসনব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক (formal) দিকগুলির উপর গুরুত্ব দেন, আবার কেউ কেউ শাসনকার্যে শাসন সংস্থাসমূহের প্রভাবের উপরেও গুরুত্ব দেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রশাসনিক, সাংগঠনিক (organisations) ও রাজনৈতিক শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের উপর গুরুত্ব দেওয়াই সরকারী প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। অপরদিকে আবার অনেকে মনে করেন যে, প্রশাসনের পরিচালনামূলক দিকটির (managerial aspect) উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

এফ. এ. নিগ্রো জন-প্রশাসন বলতে কি বোঝায় তার বিস্তৃত বিশ্লেষণের শেষে, একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়েছেন। তাঁর মতে জন-প্রশাসন :

১। একটি জন-সংগঠনের অভ্যন্তরে সহযোগিতামূলক গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টা।

২। শাসন-বিভাগ, আইন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে।

৩। জন নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এইভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হয়।

৪। বেসরকারী প্রশাসন থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক।

। সামাজিক কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে অসংখ্য বেসরকারী গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়।

পরিশেষে প্রশ্ন জাগে যে, জন-প্রশাসন যখন সরকারের ক্রিয়াকলাপের দিকটির (action part of government) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন নিঃসন্দেহে আমরা স্বীকার করি যে, এখানে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রশাসনিক কলাকৌশলের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু, সাথে সাথে প্রশ্ন জাগে যে, গবেষণার বিষয় হিসেবে জন-প্রশাসন কি কখনও বিজ্ঞানের পদমর্যাদা দাবী করতে পারে? রবার্ট ডাল মনে করেন যে, বিজ্ঞানের পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে জন-প্রশাসনের তিনটি কাঁটা আছে যা উপেক্ষা বা অতিক্রম করা প্রায় দুঃসাধ্য। প্রথমত, জন-প্রশাসনের পক্ষে ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, কারণ তার অন্যতম কাজই হ'ল সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা (Social Policy) নির্ধারণ করা। দ্বিতীয়ত, জন-প্রশাসন বিষয়টিই এমন যে, তার মূলে রয়েছে মনুষ্য চরিত্র এবং তার পূর্বাভাস দেওয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব। তৃতীয়ত, জন-প্রশাসন এক গবেষণার বিষয় হিসেবে জন্মলাভ করে পাশ্চাত্যের গর্ভে এবং স্বাভাবিকভাবেই তার বড় অংশটিই প্রাচ্যের দেশগুলির শাসনব্যবস্থার পক্ষে সেরকম গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে না অথবা প্রাসঙ্গিক নয়। এই সব নানাকারণে জন-প্রশাসনের পক্ষে এক সর্বসম্মত বিজ্ঞানের মর্যাদা পাওয়া প্রায় অসম্ভব বলেই চলে। কিন্তু, এও মানতে হবে যে, (Systems Analysis, Decision-Making Thoery, Economic and Mathematical Information Theory ইত্যাদির প্রয়োগে জন-প্রশাসন বিজ্ঞানের পর্যায়ে যথেষ্ট পরিমানে উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নতুন পদ্ধতিতত্ত্বগুলির (new methodologies) প্রবেশ। Survey Research, Operations Research, Planning-Programming-Budgeting System (PPBS), Program Evaluation Review Technique (PERT), Performance Measure-

ment, Environmental Impact Assessment (EIA), Biological Impact Assessment (BIA), Social Indicators Approach প্রভৃতি নানা পদ্ধতিগত সম্ভারে সজ্জিত ও সমৃদ্ধি হয়ে উঠেছে আজকের জন-প্রশাসন।

তবে এই বিজ্ঞানের প্রবণতা যদিও এক স্বাস্থ্যকর লক্ষণ, তবুও মানতে হবে যে, জন-প্রশাসনের পক্ষে কলাকৌশল ব্যতীত এক নিষ্প্রাণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার রূপ একান্ত কাম্য নয়। কারণ, জন-প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্যই হ'ল জন-স্বার্থের সিদ্ধি সুনিশ্চিত করা। অতএব, পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জন-প্রশাসনকে তার গুরুদায়িত্ব পালন করে যেতে হবে এবং সেই দিগন্তে সাফল্য কামনার মধ্যে দিয়েই তাকে তার অস্তিত্ব খুঁজে নিতে হবে। সেই যাত্রাপথে প্রশাসনিক মন (administrative mind) আর বৈজ্ঞানিক মনের (scientific mind) মধ্যে হয়তো কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমন্বয় দেখা যাবে, কিন্তু সে সকল মুহূর্ত ক্ষণস্থায়ী। কারণ, প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানতই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। চার্লস বিয়ার্ডকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, 'ব্যক্তি ও বস্তুর সচেতন প্রয়োগের মাধ্যমে সচেতন মানবিক উদ্দেশ্যকে অনুভব করাই হ'ল প্রশাসকের লক্ষ্য।'

১.৪ জন-প্রশাসন বা সরকারী প্রশাসন ও ব্যক্তিগত বা বেসরকারী প্রশাসন

বলা বাহুল্য প্রশাসন একটি সার্বজনীন ধারণা। আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমরা কোনও না কোনও রকমের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্মুখীন হ'তে বাধ্য। স্কুলে, কলেজে, বাড়িতে, দফতরে সর্বত্রই আমরা কোনও না কোনও ধরনের প্রশাসনের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করি। কিন্তু, প্রশাসনব্যবস্থা বা প্রশাসন যদি এতই সর্বব্যাপী, তাহ'লে সরকারী বা বেসরকারী আখ্যা দিয়ে দু-প্রকার প্রশাসনব্যবস্থার ইঙ্গিতের পেছনে কি কোনও যুক্তি আছে?

প্রশাসন বলতে যদি আমরা বুঝি কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও বোঝাপড়া (understanding) বা সহযোগিতা (co-operation) তাহ'লে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই হোক বা সরকারী ক্ষেত্রেই হোক প্রশাসনের উপস্থিতি অপরিহার্য। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়-কেন্দ্র, পাঠশালা, রাজনৈতিক দলের মতও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন এক ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা ও কর্মপন্থার দ্বারা পরিচালিত, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্মচারী ও নেতৃবৃন্দের বোঝাপড়া ও পরিচালননীতির দ্বারা প্রভাবিত। প্রশাসনিক ব্যবস্থাই, ব্যক্তিগত বা সরকারী, যে কোনও প্রতিষ্ঠানকে সহজ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সাহায্য করে ; এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনগত বা সংগঠনগত সমস্যা দূর করে এবং সর্বোপরি এদের অস্তিত্ব রক্ষায় সহায়তা করে। তাই, হেনরি ফেয়ল, মারি পার্কার ফলেট, এল আরউইক্ প্রভৃতি চিন্তাবিদ মনে করেন, জন-প্রশাসন সর্বত্রই প্রয় একই চিত্র তুলে ধরে; সেহেতু তাঁরা সরকারী এবং বেসরকারী জন-প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করায় ইচ্ছুক নন। ফেয়লের ভাষায় : "The meaning which I have given to the word administration and which has been generaly adopted, broadens considerably the field of administrative science. It embraces not only the public service but enterprises of every size and description, of every form and every purpose." অর্থাৎ প্রশাসনের যে অর্থ সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে সেই অর্থ প্রশাসনবিজ্ঞানের পটভূমির উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটায় এবং ছোটো-বড়ো, সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে সব রকমের এবং সব আয়তনের সংস্থা বা সংগঠনকে আলিঙ্গন করে। এই মত যাঁরা অনুমোদন করেন তাঁরা মনে করেন যে, খুঁটিয়ে দেখলে হয়ত সরকারী ও বেসরকারী

সংস্থার তুলনায় বৃহৎ ও স্বল্পকায় সংস্থার মধ্যে বেশি পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। তাই তাঁদের ধারণা যে, যদিও বা সরকারী ও বেসরকারী প্রশাসনের কিছু কিছু পার্থক্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্ভব তবুও সে সকল পার্থক্য একান্তই মাত্রা বা মাপকাঠির পর্যায় ; সেখানে কোনও মৌলিক ভেদাভেদ লক্ষ্য করা যায় না। কিছু কিছু কাজে, যথা হিসেব রাখায়, কাগজপত্র বা তত্ত্ব গুছিয়ে রাখায় (filing) দুই ধরনের প্রশাসনেই আমরা স্বাভাবিকভাবে একই ধরনের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করি। তাছাড়া, বেসরকারী সংগঠনে প্রচলিত এমন অনেক রীতিনীতি বা কর্মপ্রণালী সরকারী সংস্থার দ্বারা গৃহীত হয়েছে যার সাহায্যে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, আরও ফলপ্রসূ হয়েছে।

কিন্তু, তা সত্বেও মানতে হয় যে, সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের মধ্যে একটা পরিবেশগত পার্থক্য থেকেই যায়—যাকে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। যদিও প্রশাসন সার্বজনীন, তবুও সরকারী ও বেসরকারী প্রশাসনের রূপ ও নীতি এক নয়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উভয়ের মূল পার্থক্যগুলি স্পষ্ট ঃ—

১.৪.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য

সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল জনসাধারণের স্বার্থ বা কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করা। সরকারী প্রশাসন কতটা সাফল্য অর্জন করবে তা অনেকটাই নির্ভর করে কতটা জনস্বার্থ সিদ্ধ হচ্ছে তার ওপর। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য রাখে তার আর্থিক উন্নতি ও লাভক্ষতির দিকে। বেসরকারী প্রশাসন সামগ্রিকভাবে জনস্বার্থের প্রয়োজনে নিযুক্ত নয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মত কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য বা নীতির দ্বারা সরকারী প্রতিষ্ঠান বা প্রশাসন প্রভাবিত হয় না। পরিচালকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাঙ্খা কার্যকর করাই বেসরকারী প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। জনকল্যাণের লক্ষ্য মুখ্য হয়ে ওঠে বলে সরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে আর্থিক লাভ বা মুনাফা অর্জনের নীতিটি বিশেষ গুরুত্ব পায় না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি যে সকল ক্ষেত্রে সরকারী প্রশাসন বিচরণ করে, সে সকল ক্ষেত্রে তো আর্থিক লাভ ও ক্ষতির প্রশ্নই উঠতে পারে না। সরকারী প্রশাসনের উৎকর্ষ এই সমস্ত জনকল্যাণমূলক ও সেবাকেন্দ্রিক কার্যের সঠিক প্রতিপালনে, সরকারকে আর্থিক লাভে সহায়তা করায় না। অন্যদিকে, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাফল্যই নির্ভর করে সে কতটা অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করতে পারে তার ওপর। বলা বাহুল্য, এর থেকে আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, সরকারী সংস্থান মানেই অর্থনৈতিক অবনতি বা আর্থিক ক্ষতি। সরকারী প্রশাসন নিশ্চয়ই মিতব্যয়ী হবে বা তার আর্থিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে, কিন্তু তার মূল লক্ষ্য অবশ্যই জনকল্যাণসাধন, আর্থিক মুনাফা অর্জন নয়।

১.৪.২ মূলধন সংক্রান্ত পার্থক্য

জন-প্রশাসন সংস্থার মূলধন বা খরচাপাতি যোগায় সাধারণ মানুষ। কিন্তু কোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তহবিল তৈরি হয় মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের দ্বারা, যথা, একটি যৌথ মূলধনী কারবারের (joint stock) মূলধন তৈরি হয় মুষ্টিমেয় কিছু অংশীদারের (share-holder) দ্বারা। এই কারণেই বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক দেশে প্রশাসন শুধু যে আইনের শাসনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত তা নয়, আয়-ব্যয়নীতির দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত। সরকারের একটি নির্দিষ্ট আর্থিক লক্ষ্য ও সীমার মধ্যে থেকে প্রশাসনকে কাজ করতে হয়। গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের প্রতিনিধিরাই অর্থবরাদ্দ করতে

পারেন এবং প্রশাসনের অর্থও বরাদ্দ করা হয় জনপ্রতিনিধিদের মারফৎ। স্বভাবতই, সরকারী প্রশাসন অর্থের অপব্যয় ও অপচয় প্রকৃতপক্ষে সরকারকেই দুর্নাম ও পক্ষপাতিত্বের অংশীদার করে। ব্যক্তিগত প্রশাসনের ক্ষেত্রে কিন্তু ঐ ধরনের কোনও আর্থিক বাধ্যবাধকতা বা সীমা নেই।

১.৪.৩ দায়িত্ববোধ বা দায়িত্বশীলতার পার্থক্য

যেহেতু জন-প্রশাসনিক সংস্থানগুলির তহবিল সাধারণ মানুষের দেয় কর, মাশুল, খাজনা ইত্যাদি দিয়ে গড়ে ওঠে সেই কারণে জন-প্রশাসন সব সময়েই জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল থাকে। এর মানে এই নয় যে, বেসরকারী সংস্থানগুলি দায়িত্বহীনভাবে কাজকর্ম করে। কিন্তু, বেসরকারী প্রশাসনের দায়িত্ব বৃহত্তর মানুষের কাছে নয়, তার দায়িত্বশীলতার প্রেক্ষাপট অনেক সীমিত। এ প্রসঙ্গে Huxley-র বক্তব্য বিশেষ কৌতূহলপ্রদ ; তাঁর মতে, 'রাষ্ট্রের ব্যাপারটি খোলাখুলি, কাঁচের ঘরের মত যা বাইরে থেকে সুস্পষ্ট দেখা যায়—এর সাফল্য ও ব্যর্থতা বোঝা যায়। বেসরকারী ক্ষেত্র ইঁটের দেওয়ালে গাঁথাঘর, যার সব কিছুই গোপনীয় সুরক্ষিত'। তাই সরকারী প্রশাসকগণ তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ব্যর্থতার জন্য জনপ্রতিনিধি ও আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। সরকারী প্রশাসকগণ, বিচার-বিভাগ, হিসাবপরীক্ষক সংস্থা, তদারকি সংস্থা ইত্যাদির দ্বারা বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হন। কিন্তু বেসরকারী প্রশাসকগণ তাদের ভালমন্দ বা ব্যর্থতার জন্য সরাসরি জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন না।

১.৪.৪ রাজনৈতিক চরিত্র

প্রকৃতপক্ষে উভয় প্রশাসনের পার্থক্যগুলি সবচেয়ে ভালো দেখা যায় জন-প্রশাসনের রাজনৈতিক চরিত্রের মধ্যে। জন-প্রশাসনের সিদ্ধান্তগুলি রাষ্ট্রের ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে। সেজন্যই এগুলি রাষ্ট্রের সব নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক। কিন্তু বেসরকারী প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মানতে নাগরিকরা সর্বদা বাধ্য নয়। রাজনৈতিক গণতন্ত্র জন-প্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি। প্রশাসনিক ব্যবস্থা হ'ল তারই অঙ্গ। তাই সাইমনের মতে, "জন-প্রশাসন রাজনৈতিক ; অন্যদিকে বেসরকারী প্রশাসন অরাজনৈতিক" (Public administration is political whereas private administration is non-political.)

এই সব পার্থক্য ছাড়াও খুঁটিয়ে দেখলে সরকারী ও বেসরকারী প্রশাসনের মধ্যে আরও কিছু তফাৎ লক্ষ্য করা যায় ঃ

(ক) সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার তুলনায় জটিল। এর প্রধান কারণ হ'ল, আধুনিক রাষ্ট্রের সরকারের কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন ও দ্রুত বৃদ্ধি। পরিকল্পনা, দায়-দায়িত্ব, আয়-ব্যয়, লক্ষ্য ও নীতি নির্ধারণ ও সাংগঠনিক নিয়মাবলী ও কর্তব্য বণ্টনের দিক থেকে সরকারী প্রশাসনের ব্যাপকতা লক্ষণীয়। প্রশাসনিক ব্যাপকতার থেকে প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হ'তে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী প্রশাসন এই জটিলতা থেকে মুক্ত হ'তে পারে না। তাছাড়া, জটিলতার সৃষ্টি হয় পরিচালকবর্গের

মধ্যে আদর্শগত বা কৌশলগত মতভেদ থেকে। সরকারী আইনের মারপ্যাঁচ এবং আমলাদের পেশাগত মনোবৃত্তি থেকেও প্রশাসনিক জটিলতার উদ্ভব হয়। তাছাড়া, রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তাভাবনা সরকারী প্রশাসনে প্রতিফলিত হয় এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা জন-প্রশাসনিক সংস্থাগুলির ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

(খ) সরকারী প্রশাসন একটি বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; যে আইন একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা সৃষ্ট। সরকারী প্রশাসনের ক্রিয়াকলাপ এই নির্দিষ্ট আইনের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ। আইনের নির্দিশেই প্রশাসনকে দায়িত্বপালন করতে হয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন আইনের দ্বারা পরিচালিত হ'লেও আইনের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে একে কাজ করতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

(গ) সরকারী প্রশাসনের কার্যক্ষেত্র বেসরকারী প্রশাসনের তুলনায় শুধু ব্যাপক তাই নয় সমাজের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিই সরকারী প্রশাসনের আওতায় পড়ে। সরকারী প্রতিষ্ঠান কখনও আর্থিক লাভক্ষতি বড় করে দেখে না বলে জনস্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি জন-প্রশাসনের দায়িত্বেই বরাদ্দ থাকে। প্রতিরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অর্থ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য, যোগাযোগব্যবস্থা প্রভৃতি লোকহিত (public goods) জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলির যথাযথ ও উপযুক্ত পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সরকারী প্রশাসনের। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্বলাভ করে, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের দায়দায়িত্ব, মনোভাব, ও লক্ষ্য ঠিক সরকারী প্রশাসনের মত জনকল্যাণমুখী বা দায়িত্বসম্পন্ন হয় না। এর ফলে জন-প্রশাসন সরকারের একচেটিয়া ব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করে।

(ঘ) জাতির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় এবং বুনিয়াদী বিষয়গুলি পরিচালনা করে জন-প্রশাসন, যথা; দেশের প্রতিরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বেসরকারী প্রশাসন এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিচালনা করে না। তাছাড়া, জন-প্রশাসন বেসরকারী প্রশাসনের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক ও সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করে। সেই কারণে সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, জন-প্রশাসকরা তাঁদের বেসরকারী দোসরদের তুলনায় বেশি সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে থাকেন।

(ঙ) জন-প্রশাসকবৃন্দ অন্তরালে থেকে সংগঠন পরিচালনা করেন। তাঁরা রাষ্ট্রের পক্ষে, নিজেদের প্রশাসনিক পদমর্যাদায় প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন। নিজেদের ব্যক্তিগত নাম ব্যবহার করেন না। অপরপ্রান্তে, বেসরকারী শিল্প-উদ্যোগীরা, সফল ব্যবসায়িবৃন্দ সর্বদাই তাদের ব্যক্তিগত সুনাম প্রচারে উদ্যোগী হন।

(চ) তাছাড়া, বৃহৎ সংগঠন পরিচালনা করা জন-প্রশাসনের বিশেষত্ব। যেমন, রেলব্যবস্থা, সৈন্যবাহিনী পরিচালনা, দূরদর্শন ও সম্প্রচার। অপরদিকে ক্ষুদ্র সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করাই হ'ল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষত্ব।

(ছ) সরকারী ও বেসরকারী প্রশাসকদের মধ্যে মানসিকতায়ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মনে করা হয় 'সরকারী' এই শীলমোহর বা ছাপের জন্য জন-প্রশাসক অনেক কার্যকরী ভূমিকাগ্রহণ করতে পারে। কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের মনোভাব-কর্তব্যপালনের মনোভাব। কর্তব্যসচেতনতার মনোভাব সরকারী প্রশাসনের মূল কথা। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই মনোভাব বা দায়িত্বের প্রশ্নটি অবহেলিত হয়।

অ্যাপল্‌বির (Appleby) মতে, তিনটি দিক থেকে সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ঃ (১) কর্মক্ষেত্রের প্রসার, প্রতিক্রিয়া ও সুবিবেচনা ; (২) জনমুখী দায়িত্ব এবং (৩) রাজনৈতিক প্রকৃতি। সরকারী ক্রিয়াকলাপের পরিধি যেমন ব্যাপক ; জনগণ ও দেশের উপর এর ফলাফলও তেমনি সুদূরপ্রসারী। কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে সুবিবেচনার নীতিটিই সরকারী প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। সরকার যথাযোগ্য বিবেচনার সঙ্গে সমস্ত সমস্যা ও বিবেচনা মোকাবিলা করে থাকে। সব প্রতিষ্ঠানই কমবেশি রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু সরকার সম্পূর্ণভাবে ও গভীরভাবে রাজনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সরকারী ও বেসরকারী প্রশাসনের মধ্যে কিছু পরিবেশগত মৌলিক ভেদাভেদ আছে, কিন্তু বর্তমান যুগে কোনো সুদৃঢ় সীমারেখা টানার পূর্বে, তাদের সাদৃশ্যগুলিও মনে রাখা দরকার। প্রথমত, সরকারী বা বেসরকারী উভয় প্রশাসনই পরিকল্পনা (planning), সংগঠন (organisation), আদেশ (command), সমন্বয় (coordination), রিপোর্ট পেশ (reporting), হিসাব-নিকাশ (accounting) প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ নীতির দ্বারা পরিচালিত। লুথার গালিকের POSDCORB-এর দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ পরিকল্পনা (planing), সংগঠন (organisation), কর্মচারী নিয়োগ (staffing), পরিচালনা (directing), সমন্বয় (coordination), রিপোর্ট (reporting) ও আয়-ব্যয়ের হিসাব (budgeting) সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রশাসনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত, দুই প্রকার প্রশাসনব্যবস্থায়ই প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজনে কর্মচারীদের উপযুক্ত শিক্ষা-শিক্ষণ-প্রণালীর (training) গুরুত্বস্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, সরকারী প্রশাসনিক সংস্থার ন্যায় কোনও কোনও বেসরকারী প্রশাসনের কার্যকলাপও জনজীবনকে স্পর্শ করতে পারে। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত পরিবহণব্যবস্থা বা বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতাগুলি (utilities) জন-জীবনকে কোনও অংশে কম স্পর্শ করে না। তাছাড়া, বর্তমানে আমরা দেখি যে, বিভিন্নপ্রকারের বেসরকারী সংগঠন (Non-governmental organisations বা NGOs) সমাজকল্যাণের কাজে রীতিমত ব্রতী হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এমন কি, সরকার স্বয়ং এই সব সংস্থাগুলিকে উন্নয়নমূলক কাজে যোগদান করার জন্য অনুপ্রাণিত করছে এবং এদের কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করছে। চতুর্থত, সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রেই প্রশাসন হ'ল এক ধরনের সংঘবদ্ধ প্রয়াস (group effort) যেখানে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী পারস্পরিক আদান-প্রদান বা বোঝাপড়ার (understanding) মাধ্যমে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে কার্যকর করে। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, উভয় ক্ষেত্রেই কিছু বিশেষ ধরনের সমস্যা লক্ষ্য করা যায়, যেমন, সিদ্ধান্তগ্রহণের সমস্যা।

১.৫ সারাংশ

সব সমাজেরই নিজস্ব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকে। এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাও থাকে। বর্তমানের আধুনিক সমাজে জন-প্রশাসন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এর পরিধিও খুব ব্যাপক। সরকার জনস্বার্থে যে কাজগুলো করে থাকে সে কাজ জন-প্রশাসনের আলোচনার বিষয়। সরকারী প্রশাসন ও বেসরকারী প্রশাসনের সাথে সাদৃশ্য যেমন আছে,

বৈসাদৃশ্যও তেমন আছে। এই এককে আমরা জন-প্রশাসনের চরিত্র, আলোচনাপরিধি এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রশাসনের পার্থক্য আলোচনা করলাম। পরবর্তী এককে জন-প্রশাসনের বিবর্তন আলোচনা করব।

পরিচালক-পরিচালিতের সম্পর্ক নির্ধারণের সমস্যার সম্মুখীন সরকারী বা বেসরকারী, দুই ধরনের সংস্থাই হতে পারে।

এই সকল সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, অনায়াসেই বলা যায় যে, সরকারী প্রশাসনের অনেক কিছুই ব্যক্তিগত বা বেসরকারী প্রশাসনের সহযোগিতায় লাভ করা যায়। Felix Nigro তাই বলেন যে, 'সরকারী-ব্যক্তিগত যৌথ প্রয়াস' (The public-Private partnership)-এর প্রশ্নটি আজকের দিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিককালে তাই 'বেসরকারী' ও 'সরকারী' ধারণা দুটির মধ্যে সীমারেখাটি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে উঠছে।

১.৬ অনুশীলনী

১। জন-প্রশাসনের একটি সংজ্ঞা দিন।

২। জন-প্রশাসনের পরিধি ও অলোচনাক্ষেত্র ব্যাখ্যা করুন।

৩। জন-প্রশাসন ও বেসরকারী প্রশাসনের প্রভেদ নির্ণয় করুন।

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

Bhattacharjya, Mohit : Public Administration (2nd Edition) Chapter 1 ; The World Press Private Ltd ; Calcutta, 1987.

Nigro. Felix A. and Nigro, Loyd G. : Modern Public Administration ; Harjee and Row ; New York. 1980.

Waldo, Dwight : Public Administration in International Encyclopaedia of Social Science.

White, L. D. : Introduction to the study of Public Administration ; Eurasia Publishing House ; New Delhi, 1968.

একক ২ ❑ জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তন

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তনের অলোচনার প্রয়োজনীয়তা

২.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

২.৪ রাজনীতি—প্রশাসন দৃষ্টিভঙ্গি

২.৫ সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি

২.৬ মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গি

২.৭ ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি

২.৮ উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি

২.৯ জননীতি দৃষ্টিভঙ্গি

২.১০ নব জন-প্রশাসন

২.১১ গণ-পছন্দ দৃষ্টিভঙ্গি

২.১২ সারাংশ

২.১৩ অনুশীলনী

২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তন ব্যাখ্যা করা। এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- জন-প্রশাসনের বিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
- জন-প্রশাসন একটি গবেষণার বিষয় হিসেবে কতটা স্বাতন্ত্র্য দাবী করে
- পৃথক শাস্ত্ররূপে জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তন ও বিকাশের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

২.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তন আলোচনা করব। বিস্তৃতভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা প্রাচীন, উদার গণতান্ত্রিক ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীও ব্যাখ্যা করব। জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসকে আমরা আটটি দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাগ করেছি। আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে শুধুমাত্র পঠন পাঠনের সুবিধার জন্য। এই বিবর্তন গড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন স্থান, কাল স্তরে। তবে ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করার আগে আমরা জন-প্রশাসনের বিবর্তনের ইতিহাস পড়ার প্রয়োজনীয়তা কি তা বিচার-বিশ্লেষণ করব।

২.২ জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তনের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

জন-প্রশসন স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে যতটা গুরুত্ব পেয়েছে এর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা ততটা গুরুত্ব পায় নি। এর সম্ভাব্য কারণ হ'তে পারে যে, আধুনিক প্রেক্ষাপটে জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তন বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে নি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও অসম্পূর্ণ নয় কি?

বিবর্তন হ'ল কোন একটি বিষয়ের ক্রম-উন্নতি ও বিকাশ। এই বিকাশ ঘটে থাকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে কেন্দ্র করে। তাই বিবর্তন আলোচনায় অতীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অতীত শুধু বর্তমানের পূর্বাভাস দেয় না, অতীত বিষয়ের বিকাশের ছাঁচ তৈরী করে দেয়। এই প্রসঙ্গে E. H. Carr-এর উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। E. H. Carr-এর মতে, The history is an unending dialogue between the past and the present. এই অর্থে অতীত আলোচনার একটা সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা থেকে যায়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কোন বিষয়কে খুব সহজেই বোঝা যায়। পরিশেষে বলা যায় যে, বিবর্তন আলোচনার দু'টি উদ্দেশ্য আছে—(১) তাত্ত্বিক ও (২) প্রয়োগবাদ সম্পর্কীয়। তাত্ত্বিক দিক থেকে বিষয়টির পরিধি বিচার করা যায় এবং প্রয়োগবাদ দৃষ্টিভঙ্গিতে অতীতের জ্ঞানকে বর্তমানের উপযোগী করে প্রয়োগ করা যায়।

২.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

জন-প্রশাসন ধারণাটির তাৎপর্য খুব সাম্প্রতিককাল থেকে স্বীকৃতি পেলেও, প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ সুদূর ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়েই লক্ষিত হয়। এমন কি বলা যেতে পারে যে, প্রশাসন বলতে যদি আমরা মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বুঝি, তাহ'লে যবে থেকে মানুষ সমাজজীবনে অভ্যস্ত হয়েছে, প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ তখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশগুলিতে যেখানে যেখানে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, সে সকল জায়গায়ই সুদীর্ঘকাল ধরে কোনও না কোনও প্রকারের জন-প্রশাসনিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল। এমন কি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসন্ধান করলে আমরা প্রাচীন ভারতের তৎকালীন জন-প্রশাসনিক কাঠামোর এক সুদৃঢ় বিবরণ পাই; শুধু তাই নয়, জন-প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ করার জন্য কৌটিল্য তাঁর রচনায় নানা উপদেশ রেখে

গেছেন। তবে, যদিও জন-প্রশসন এক ধরনের বিশেষ ক্রিয়াকলাপ হিসেবে মানুষের সাধারণ সমাজজীবনেরই প্রায় সমসাময়িক তবুও গবেষণার এক বিষয় হিসেবে জন-প্রশাসন খুব বৃহৎ এক ইতিহাস দাবী করতে পারে না। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে জন-প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ রাষ্ট্রের পটভূমিতেই স্বীকৃত হয়েছিল, যেহেতু রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ সুস্পষ্টভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিপূরণ করার জন্যই জন-প্রশাসনিক কাঠামোর উদ্ভব, সেহেতু বহুকাল জন-প্রশাসন সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, প্লেটোর রিপাব্লিক্ এবং স্টেট্সম্যান অ্যাণ্ড দি ল'জ বইগুলিতে, অ্যারিস্টটলের পলিটিক্স্ গ্রন্থে, এমন কি মধ্যযুগে ম্যাকিয়াভেলীর 'প্রিন্স' গ্রন্থে, এক কথায় সমগ্র রাজদর্পণ সাহিত্যে (mirror of princes literature)-এ আমরা জন-প্রশাসনের সারগর্ভ আলোচনা পাই। কিন্তু, সে সকল আলোচনায় জন-প্রশাসনিক ব্যাপারে কোনও গভীর আলোকপাত পাওয়া না ; সেখানে রাষ্ট্রই মুখ্য, অন্য সবকিছু গৌণ। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যালোচনার ধারা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে যেমন একটি স্বতন্ত্র পঠন-পাঠন শাস্ত্র বা রাষ্ট্রচর্চার বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করেছিল, প্রশাসনিকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অভাব দেখা গেছে। এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই যে, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও সরকারী ক্ষেত্রে প্রশাসন বা পরিচালনার প্রশ্নটি ততটা প্রাধান্য পায় নি। Peter Self-এর মতে, "The study of Public Administration developed as an off-shoot of political science or public law and until recently administration as an academic subject was the very plain step-sister of these older disciplines." অর্থাৎ, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, প্রশাসন কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বা সরকারী আইনের অংশ হিসেবেই, তাদের এক অগুরুত্বপূর্ণ সহোদরা হিসেবেই। প্রশাসন যে ততটা গুরুত্বলাভ করে নি, তার মূলে কয়েকটি কারণ, লক্ষ্য করা যায়—প্রথমত, জনসাধারণ সরকারী কার্যাবলী সম্পর্কে ততটা সচেতন ছিল না ; দ্বিতীয়ত, জনসাধারণকে এ সম্বন্ধে সচেতন করার ব্যাপারে কোনও রাজনৈতিক সংস্থা বা কোনও রাজনৈতিক দল উদ্যোগী হয় নি ; তাছাড়া, অনেকে মনে করেন যে পূর্বে রাষ্ট্র প্রধানত পুলিশীরাষ্ট্র ছিল, অর্থাৎ রাষ্ট্রে কর্মপরিধি আজকের রাষ্ট্রের মতে, সুপরিব্যাপ্ত ছিল না এবং তার কর্মপরিধিও সুপ্রসারিত ছিল না। ফলে, মানুষের সরকারী ক্রিয়াকলাপ বা জন-প্রশাসনিক বিষবস্তু নিয়ে কোনও সুদীর্ঘ আলোচনার বা ভাবনাচিন্তার অবকাশ ঘটে নি। অতএব, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সরকারী আইনের শাখা হিসেবেই। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর ক্রমশ এই সকল রাষ্ট্রগুলি যখন জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করল তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাজকর্মের পরিধি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে জন-প্রশাসনের দায়িত্বও বৃদ্ধি পেল। শুধু তাই নয়, সমাজবিজ্ঞানীরা জন-প্রশাসনের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। জন-প্রশাসনকে সমাজবিজ্ঞানের নবীনতম শাস্ত্ররূপে স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য দান করেছেন আমেরিকার লেখক, গবেষক ও অধ্যাপকবৃন্দ।

কিন্তু জন-প্রশাসন একটি গবেষণার বিষয় হিসেবে যে স্বাতন্ত্র্য আজ প্রদর্শন করে, পূর্বে তা ছিল না। Felix Nigro মনে করেন যে, 'পঠনশাস্ত্র হিসেবে আজকের জন-প্রশাসন তার প্রারম্ভকালের তুলনায় অনেকটাই আলাদা।' (Public Administration as a field of study is substantially different today from what it was at its inception.) বলা যেতে পারে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ৮০-র দশক থেকে জন-প্রশাসনের এক ক্রমবিবর্তন ঘটেছে এবং সেই ধারাবাহিকতা সময়ের তালে তালে ছন্দ মিলিয়ে যেন আজও নিজেকে সতেজ ও সজীব রেখেছে। আজ এই শাস্ত্রটির গুরুত্ব, পরিধি ও ব্যাপকতা বিশ্লেষণ করে, একে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের আওতা থেকে ভিন্ন করে এক পৃথক এবং স্বতন্ত্র পঠন-পাঠনের বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পৃথক শাস্ত্ররূপে জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তন ও বিকাশের কাহিনীকে প্রধানত পাঁচটি দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাগ করা যেতে পারে।

২.৪ রাজনীতি-প্রশাসন দৃষ্টিভঙ্গী

যদিও জন-প্রশাসন সমপের্ক চিন্তাভাবনা অনেক দিন থেকেই জার্মানী, ব্রিটেন প্রভৃতি অন্যান্য দেশে শুরু হয়েছিল, তবুও মানতেই হয় যে, অধ্যয়ন বা গবেষণার বিষয়রূপে জন-প্রশাসনকে বিবেচনা করার অগ্রদূত হ'লেন উড্রো উইলসন। সুদূর ১৮৮৭ সালে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত—'The Study of Administration' প্রবন্ধে জন-প্রশাসনকে একটি পৃথক পঠন-পাঠনের বিষয় এবং সমাজবিজ্ঞানচর্চার একটি নবীন শাখারূপে গড়ে তোলার কথাই শুধু বলেন নি, তিনি রাজনীতি ও প্রশাসনের বিভাজনও ঘটিয়েছিলেন। এই কারণে সাধরণভাবে উড্রো উইলসনকে জন-প্রশাসনের জনক বা স্রষ্টা হিসেবে অভিহিত করা হয়। উড্রো উইলসনের জন-প্রশাসনের ধারণার আবির্ভাব যে সময়ে ঘটেছিল তখন নৈতিকতাই ছিল রাষ্ট্রের উৎকর্ষ পরিমাপের মাপকাঠি; সে যুগে রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতা বা প্রশাসনিক কর্মনৈপুণ্যের চেয়ে জনস্বার্থরক্ষার প্রশ্নটিই প্রাধান্য পেয়েছিল। তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন-প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উড্রো উইলসন নানারকমের দুর্নীতি, অনাচার, অর্থের অপচয় ও গোলযোগ লক্ষ্য করলেন। জন-প্রশাসনের এই মলিন রোগাক্রান্ত চেহারায় হতাশ হয়ে উইলসন মন্তব্য করলেন যে, কোনও সংবিধান কার্যকরী করার তুলনায় সংবিধান রচনা করা ঢের সহজ। তিনি সুস্পষ্ট যুক্তিসম্মত আলোচনার মাধ্যমে বোঝাতে চাইলেন যে, কোনও সরকারের কর্মপরিকল্পনা যতই সদিচ্ছাভিত্তিক হোক না কেন, তার চিন্তাধারা বা কর্মসূচী যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, সেই সব কর্মপ্রণালী কোনওমতেই কার্যকরী বা ফলপ্রদ হবে না, যদি না সরকারের বাহুযুগল, অর্থাৎ, তার জন-প্রশাসনিক কাঠামো বলিষ্ঠ বা সুদক্ষ ও সুদৃঢ় না হয়। তিনি তাই রাজনীতি এবং জন-প্রশাসনিক কাজকর্মকে দুইটি পৃথক ক্রিয়াকলাপ (Politics-administration dichotomy) হিসেবে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। বলা যেতে পারে যে, এই সময় থেকেই প্রশাসনকে তথা জন-প্রশাসনকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ বা উৎসাহ সৃষ্টি হয়। উইলসন যে জন-প্রশাসনকে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র পঠন-পাঠনের বিষয় হিসেবেই গড়ে তোলার কথাই শুধু বললেন তা নয়, তিনি গবেষণা ও প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়নের মাধ্যমে জন-প্রশাসনকে একটি বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার ওপর জোর দিলেন, কারণ, তাঁর ভাষায় এটা দরকার ছিল "to rescue executive methods from the confusion and constliness of empirical experiment and set them on the foundations laid deep in principle." সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, একদিকে জনগণের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, সরকার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, আর অন্যদিকে প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা, সংগঠিত নিয়মকানুন ও প্রশাসনিক পরিচালনাব্যবস্থা—এই দু'টি পরস্পরবিরোধী ধারণাকে সম্পূর্ণ দু'টি পৃথক পট-ভূমিতে, বিভক্ত করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা উইলসন বোধ করেছিলেন। এই বোধই ছিল জন-প্রশাসন নামক স্বতন্ত্র অধ্যয়নক্ষেত্র সৃষ্টির প্রথম প্রকৃত পদক্ষেপ। এই যুগকে তাই উইলসনের যুগ বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জন-প্রশাসনের পার্থক্যের যুগ আখ্যা দেওয়া হয়। দু'টির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ককে অস্বীকার করার উপায় নেই, তবুও দু'টিকে পৃথক গবেষণার বিষয় হিসেবে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জন-প্রশাসন সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভাবনাচিন্তার চরকাটা যখন উইলসন ঘুরিয়েই দিলেন, তখন প্রায়শই নানা জায়গায় এই ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন দেখা গেল। ১৯৯৯ সালে ফ্র্যাঙ্ক গুডনাউ (Frank Goodnow) তাঁর 'Politics and Administration' গ্রন্থে রাজনীতি ও প্রশাসনিক কার্যাবলীর পার্থক্য করেন। তাঁর মতে, রাজনীতি সরকারের নীতি ও রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশ করার কাজ করে, অপরদিকে প্রশাসনের কাজ হ'ল গৃহীত নীতিগুলিকে কার্যকরী ও বাস্তবায়িত করা। অর্থাৎ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের নীতি গঠন করে এবং জন-প্রশাসন সেই সকল নীতিকে বাস্তবে

রূপায়িত করে। অতএব, রাষ্ট্রনীতিকে যদি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (end) হিসেবে ধরা হয়, তাহ'লে জন-প্রশাসনকে বা জন-প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপকে উদ্দেশ্যসাধনের উপায় (means) বা যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

২.৫ সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গী

রাজনীতি ও প্রশাসনের বিভাজনের প্রশ্নটি পরবর্তীকালে আরও গুরুত্ব পেল। শুধু তাই নয়, জন-প্রশাসনকে একটি উন্নত মানে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা সে সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গেল। প্রশাসনকে মূল্য-নিরপেক্ষ পরিচালন-বিজ্ঞান (a value-free science of management) হিসেবে পেশ করা যেতে পারে কিনা, এ সম্বন্ধে অনেকে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষক ও পণ্ডিতগণের মানসিক পটভূমিকায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল দক্ষতা (efficiency) ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির (scientific approach) উপর। এই দৃষ্টিভঙ্গির অগ্রণী ব্যাখ্যাকার ছিলেন ফ্রেডেরিক উনস্লো টেলর (Fredrick Winslow Taylor), Midvale Steel Works নামক কারখানার ফোরম্যান হিসেবে টেলর বিভিন্ন কর্মীর কর্মপ্রণালী খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন এবং তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লেন যে, সঠিক ব্যবস্থা থাকলে যে কোনও কর্মীই কোনও স্বল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও বিশেষ কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে। অর্থাৎ, পরিচালনব্যবস্থার শৃঙ্খলাহীনতার পেছনে মানুষ নয়, ব্যবস্থাই দায়ী। এই ধারণার ভিত্তিতে টেলর প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত ধারণা প্রতিষ্ঠা করলেন। শ্রমবিভাগ ও দায়িত্ববণ্টনের নীতি, শ্রমিকের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নীতি, শ্রমিককে উদ্যোগী ও উৎসাহিত করার নীতি, কার্যনির্বাহের সময়সীমা ও নীতিনির্ধারণ প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মত নীতিকে কার্যকর করে প্রশাসন ও পরিচালনায় কতটা উৎকর্ষ আনা যায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ও উল্লেখযোগ্য পরামর্শ দিলেন টেলর। এই সময়কালের প্রধান বক্তব্য ছিল যে, প্রশাসনের কিছু নির্দিষ্ট নীতি আছে, যেসব নীতি উদঘাটন বা আবিষ্কার করা এবং তা কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত করাই হ'ল প্রশাসনিক গবেষকদের মূল লক্ষ্য।

টেলরের গবেষণার মাধ্যমে উপনীত সকল প্রশাসনিক নীতিকে ভিত্তি করে হেনরী ফেয়ল, লুথার, গালিক, জেমস্ মুনি, লিণ্ডাল আরউইক্ এরপর গড়ে তুললেন প্রশাসন ও পরিচালনা সম্পর্কিত কতকগুলি আদর্শনীতি। ফেয়ল প্রশাসনে কর্ম বিভাগ, বিশেষীকরণ, কেন্দ্রীকরণ, নিয়মশৃঙ্খলা, আদেশের ঐক্য প্রভৃতি ধারণার প্রসার ঘটান। লুথার গালিক প্রতিষ্ঠিত করেন পরিচালনার বিখ্যাত সূত্র POSDCORB অর্থাৎ, পরিকল্পনা (planning), সংগঠন (organizing), কর্মচারী নিয়োগ (staffing), নির্দেশ (directing), সমন্বয় (co-ordinating), রিপোর্ট (reporting) ও আয়-ব্যয়ের হিসাব (budgeting)—সংগঠনের সাতটি উল্লেখযোগ্য নীতি। নিঃসন্দেহে POSDCORB পদ্ধতি জন-প্রশাসন শাস্ত্রের বিষয়বস্তু নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাই ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত লুথার গালিক ও লিণ্ডাল আরউইকের প্রবন্ধ—'Papers on the Science of Administration'-কে সে যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ সালের সময়সীমাটি ছিল জন-প্রশাসনের সুবর্ণযুগ। এই সময় জনপ্রশাসন শাস্ত্ররূপে পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন, গবেষণা ও বিশ্লেষণের চরম শিখরে উঠেছিল। ফেলিক্স নিগ্রোর মতে, এই সময় জন-প্রশাসনের সাফল্যের সংখ্যা ছিল অনেক। কারণ, জনপ্রশাসন নতুন শাস্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং জন-পরিষেবার মান উন্নত হয়েছিল। ("The successes were many because public administration did achieve recognition as a new field and the public service was improved.")

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জনপ্রশাসনের পটভূমিতে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন ম্যাক্স হেববার (Max Weber)। তাঁর 'Bureaucratic Model' সরকারের সমস্যাকে সম্পূর্ণ বাস্তব ও অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে বিচার করতে সাহায্য করে; যদিও অনেকেই মনে করেন যে, হেববার যে আমলাতন্ত্রের মডেল বা নীতি ও শর্তকে প্রশাসনিক উৎকর্ষের মানদণ্ড হিসেবে বেছে নিয়েছেন তা অনেকাংশেই 'কর্তৃত্বতান্ত্রিক ও যান্ত্রিক' (authoritarian and mechanistic)। তথাপি, জন-প্রশাসনের এক বিজ্ঞানের দিকে হেববারের আমলাতন্ত্র এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

২.৬ মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গী

কিন্তু জন-প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি কি কেবলমাত্র সাংগঠনিক কলাকৌশল বা ব্যবস্থা সম্পর্কিত উন্নতির ওপরই নির্ভরশীল? এ কথা অস্বীকার করা চলবে না যে, জন-প্রশাসনের মূলে রয়েছে 'জন' অর্থাৎ, জনসাধারণ। সমস্ত জনপ্রশাসন ব্যবস্থা চালনা করে মানুষ এবং তার অন্যতম লক্ষ্য হ'ল জনকল্যাণসাধন করা। অতএব, প্রশাসন পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই যে, শেষ কথা নয়, সামাজিক মানসিক বা পরিবেশগত উপাদানও যে, জন-প্রশাসনকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করে, সেই তত্ত্ব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরলেন এলটন্ মেয়ো (Elton Mayo) ও তাঁর সঙ্গীরা। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত Harvard Business School-এর পক্ষে চিকাগো শহরের কাছে অবস্থিত Western Electric Company-র Hawthorne plant-এ মেয়ো এবং তার সঙ্গীরা সুদীর্ঘ অনুসন্ধান এবং গবেষণার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লেন তা এই যে, কর্মোদ্দীপনার উপর ভৌত পরিবেশের চেয়ে সামাজিক, ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাব অনেক বেশী। এই গবেষণা সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে সর্বপ্রথম সংগঠনের পদ্ধতিগত ধারণার জন্ম দেয় এবং 'মেশিন মডেল'-এর মূল অনুমানগুলির অনেকগুলিকেই খণ্ডন করে Felix Nigro তাই মন্তব্য করেছেন—"this research led to the first systematic conception of organization as social system and destroyed some of the basic assumptions of the machine model." একজন প্রশাসনিক কর্মী সামাজিক সচেতন মানুষ। সে কোনও যন্ত্র নয়। তার আশা-আকাঙ্খা, ব্যথা-বেদনা, অভাব-অভিযোগ, সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি বোধগুলির দিকে যদি যথেষ্ট দৃষ্টিপাত না করা হয় তাহ'লে যেকোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থাই দীর্ঘকাল ধরে দক্ষতা বা উৎকর্ষ প্রদর্শন করতে অক্ষম হবে। তাছাড়া, সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস বা পরিবেশগত উন্নতি সাধনের মাধ্যমে জন-প্রশাসনিক ব্যবস্থার দক্ষতা কিছুদিনের জন্য সিদ্ধ হ'লেও তা একান্তই ক্ষণস্থায়ী হবে। অর্থাৎ, মেয়োর বক্তব্য হ'ল পরিচালনার মানবিক উপাদানকেও গুরুত দিতে হবে। মানবিক উপাদান বলতে মেয়ো এবং তাঁর সঙ্গীরা বুঝেছেন কাজের ক্ষেত্র, কাজের পরিবেশ, পরিচালক ও কর্মীর অভিপ্রায়, পরিতৃপ্তি প্রভৃতি। তাছাড়া, কর্মীদের সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদার করতে হবে, তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে এবং তবেই তাঁদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসন বা পরিচালনার ব্যাপারটি যে, পরিচালক-পরিচালিতের সম্পর্ক, পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের ফল একথাটি প্রতিষ্ঠিত করেন এই সব গবেষকজন। তাই এই নতুন প্রতিবাদীগোষ্ঠী জনপ্রশাসন শাস্ত্রে 'মানবিক সম্পর্কের ঘরানা' (Human Relations School নামে পরিচিত।

পরবর্তীকালে জে. এল. মোরেনো (J. L. Moreno), চেষ্টার বার্নার্ড (Chester Bernard) প্রমুখ আরও নতুন নতুন গবেষণার সাহায্যে প্রশাসন ও পরিচালনার মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উপাদানগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৯

সালের American Society for Public Administration প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল জন-প্রশাসনের বিজ্ঞান, পদ্ধতি এবং শিল্পের পরিবর্ধন করা এবং সরকারী কর্মীগোষ্ঠীর সর্বস্তরের, যেমন শিক্ষক, গবেষক, আলোচক, সামাজিক নেতৃবর্গ এবং এই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ অন্যান্য গোষ্ঠীকে এর সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করা। অর্থাৎ জন প্রশাসনকে সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা এই সময় শুরু হয়।

২.৭ ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী

জন-প্রশাসনের একটি ভিন্ন দিকে এবার আলোকপাত করলেন হার্বার্ট সাইমন (Herbert Simon)। টেলর, ফেয়ল প্রমুখ বৈজ্ঞানিক পরিচালনার প্রবক্তাগণ প্রশাসনকে বিজ্ঞানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সকল নীতির উল্লেখ করেছিলেন, সাইমন সেগুলিকে নিতান্তই প্রবাদ বা জনশ্রুতি বলে মনে করলেন, কারণ, এগুলি কেবলমাত্র অসংলগ্ন এবং অস্পষ্টই নয়, এগুলিকে প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী করাও প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। সাইমন ভেবেছিলেন যে, মূলত মানুষ যেমন চিন্তাশীল প্রাণী, তেমনি একটি প্রশাসনিক সংস্থাও মূলত একটি সিদ্ধান্তকারী যন্ত্র (decision-making apparatus) ১৯৪৫ সালে সাইমন তাঁর Administrative Behaviour গ্রন্থে 'যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তের' (rational decision-making) একটি মডেল উপস্থিত করলেন। সাইমনের আলোচনায় পরিচালনার বৈজ্ঞানিক ও মানবিক উপাদান—উভয়ই প্রাধান্য পেল। সংগঠনের মূল বা কেন্দ্রবিন্দু যে, সিদ্ধান্ত সে সম্বন্ধে সাইমন বিন্দুমাত্র সন্দিগ্ধ নন ; তাই তাঁর মত হ'ল যে, কোনও সাংগঠনিক বা প্রশাসনিক সংস্থার সাফল্য, দক্ষতা বা উৎকর্ষ তখনই সাধিত হবে যখন সেই সংস্থা যথার্থ বা যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত (correct or rational decision) গ্রহণ করতে পারবে এবং সিদ্ধান্ত তখনই যথাযথ বা যুক্তিসঙ্গত হিসেবে ধার্য হবে যখন পারিপার্শ্বিক, পরিবেশগত ও বিকল্প সকল পন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে যুক্তি ও বিবেচনার ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

সাইমনের তত্ত্বে প্রশাসন বিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের পারস্পরিক আদান-প্রদানের নীতি অর্থাৎ, সহযোগিতার প্রশ্নটি প্রাধান্য পেয়েছে ; কারণ, সাইমন ভেবেছিলেন যে, এই পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদান-প্রদান যত সুদৃঢ় হবে, জন-প্রশাসন বিজ্ঞানের ততটাই বিকাশ ঘটবে। সাইমনের দৃষ্টিতে পরিচালনার বৈজ্ঞানিক দিকটির সঙ্গে সঙ্গে যেমন মানবিক দিকটিও সুস্পষ্ট হয়েছিল, তেমনি এই পর্যায়ে ক্রমশ অতীতের সেই রাজনীতি ও প্রশাসনের মধ্যবর্তী সুস্পষ্ট সীমারেখাটিও ধোঁয়াটে হয়ে উঠতে লাগল। জন-প্রশাসনের বৈজ্ঞানিক চরিত্রে সংশয় দেখা দিল।

২.৮ উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গী

আর্ন্তজাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আবির্ভাবে জনপ্রশাসন ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সামগ্রিক উন্নয়নে পাশ্চাত্য সংগঠন তত্ত্বগুলি বিশেষ কোনও সুবিধা করতে পারে নি। 'জন-প্রশাসনের বিজ্ঞান ঃ তিনটি সমস্যা' (The Science of Public Administration : Three Problems)—এই প্রবন্ধে রবার্ট ডাল (Robert Dahl) জন-প্রশাসনের বিজ্ঞানের বিকাশের পথে উল্লেখযোগ্য তিনটি সমস্যার দিকে

দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। যথা—(১) জন-প্রশাসনের বিষয়বস্তু থেকে মূল্যায়নসূচক আলোচনা বাদ রাখা প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। তাছাড়া, দক্ষতা বা উৎকর্ষ বিধায়ক পন্থা যতই বিজ্ঞানসম্মত (scientific) হোক না কেন, সে সব পন্থা বা উপায় কোনও লক্ষ্য বা আদর্শকেই ভিত্তি করে গৃহীত হবে। (২) তাছাড়া, জন-প্রশাসনের বিষয়বস্তু অবিচ্ছেদ্যভাবে মানবজীবন ও মনুষ্যচরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই, ডাল মনে করলেন যে, যান্ত্রিকভাবে নয়, জনপ্রশাসনকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করতে হবে। (৩) শেষত রবার্ট ডাল বললেন যে, জন-প্রশাসন প্রকৃতপক্ষে গড়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পটভূমিতে, সেখানকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। অতএব, একটি বিশেষ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যে, নীতি প্রযোজ্য, প্রশাসনিক যে সকল ধ্যান-ধারণা উল্লেখযোগ্য, সে সকল প্রণালী বা নীতি ভিন্ন সমাজব্যবস্থায় বা ভিন্ন দেশে কোনওমতেই সমানভাবে কার্যকরী করা যাবে না।

অতএব, ডাল বললেন যে, জন-প্রশাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'ল মুষ্টিমেয় কয়েকটি পাশ্চাত্যের দেশের গণ্ডী কাটিয়ে আন্তর্জাতিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক নীতি-নির্ধারণ করতে হবে। তাই লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জন-প্রশাসনের আলোচনা শুধুমাত্র উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে নি, তা ইরোপকেন্দ্রিকতা (Eurocentrism) বা অন্যতম পাশ্চাত্য নৃকুলকেন্দ্রিকতা (ethnocentrism) ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও। Development Administration বা উন্নয়নের প্রশাসন কথাটি তাই আজ প্রশাসন শাস্ত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এক্ষেত্রে ফ্রেড রিগ্‌স্-এর (Fred Riggs) অবদান গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যখন আমেরিকায় গৃহীত প্রশাসনিক নীতি তৃতীয় বিশ্বে ফলপ্রসূ হ'ল না, তখন রিগ্‌স্ বোঝালেন যে, কোনও প্রশাসনিক সংগঠন বা সংস্থা একটি বিশেষ পরিবেশেই বিরাজ করে; শুধু তাই নয় এই পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। অতএব, পরিবেশ বা পরিস্থিতি ব্যতীত কোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হ'তে পারে না। এই বক্তব্য আগাগোড়া বাস্তব্যবিদ্যক (ecological)

২.৯ জননীতি দৃষ্টিভঙ্গী

তবে, এই শতাব্দীর ছয়ের দশক জন-প্রশাসনের বৈজ্ঞানিকীকরণের দিক থেকে আশঙ্কাপূর্ণ হ'লেও, সাতের দশক আবার জন-প্রশাসনের উন্নতির দশক হিসেবে দেখা দিল। ১৯৬৭ সালে American Society for Public Administration-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল National Academy of Public Administration। এই Academy মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে মেধাবী গবেষক ও প্রশাসকদের আকর্ষণ করার জন্য। এর উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে গবেষণার ও অধ্যয়নের মান উন্নয়ন করা, বুদ্ধিজীবী ও উৎসাহী প্রশাসকদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে একটি কার্যকরী সংস্থায় পরিণত হওয়া এবং জন-প্রশাসনের সমস্যাগুলির সমাধানের বিশ্বাসযোগ্য উৎসরূপে সকলের শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা। (Its purpose is to bring administrators and scholars together in a two-way exchange of ideas...to foster both research and education in public administration to serve as an effective agent for the interests and energies of the profession [scholars, administrators and men of stature in public affairs], and to be a trustworthy source of advice on problems of public administration). বর্তমানে জন-প্রশাসনের স্বতন্ত্র এবং সংকটহীন অস্তিত্ব এই Academy-র সাফল্য যথেষ্ট পরিমাণেই ইঙ্গিত করে।

বর্তমানে জন-প্রশাসনের বিষয়বস্তু অনেকটাই জননীতি চর্চার সঙ্গে মিলিত হয়েছে; তাছাড়া, সরকারের

জনকল্যাণমূলক সংস্থার রূপ ধারণ করায় জন-প্রশাসনও তার পরিধির মধ্যে জননীতি চর্চার উদ্যোগকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রশ্ন জেগেছে, বর্তমানে জন-প্রশাসন কতটা প্রকৃত মানবজীবনের নিগূঢ় সত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে, তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কতটা প্রযোজ্য। কেউ কেউ তাই মনে করেন যে, নতুন প্রশাসন বিজ্ঞান বা 'abstract-truth'-এর দিকে না তাকিয়ে 'public problems' এর দিকে নজর দেবে। গবেষক, প্রশাসক ও জননেতাদের মিলিত প্রচেষ্টায় জনপ্রশাসন হয়ে উঠবে দায়িত্বশীল।

জন-প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা তাই ক্রমশ সুদৃঢ় এবং সুপ্রসারিত হচ্ছে। প্রথমত, জন-প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপকে ভিন্ন বা পৃথক এক কর্মস্থল হিসেবে দেখার সুযোগ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক গবেষণা শাসনপদ্ধতিকে উন্নত ও দক্ষ করে তুলতে সাহায্য করছে। তৃতীয়ত, একটি প্রশাসনিক বিজ্ঞানের দিকে যে, পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাকেও অস্বীকার করা যায় না ; যার ফলে আমাদের প্রশাসনিক বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধিও সঞ্চয় ঘটছে। চতুর্থত, প্রশাসনিক কর্মিবৃন্দ তাঁদের দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হচ্ছেন, এবং বিশেষভাবে বলা যেতে পারে যে, সাধারণ মানুষ ও জনগণ যথার্থ নাগরিকের দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। প্রশসন বিজ্ঞানে তাই বর্তমানে প্রাধান্য পেয়েছে নগর সমস্যা, শ্রমিকের সমস্যা এবং নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা, এক কথায়, the concept of social service।

২.১০ নব জন-প্রশাসন

জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তনের কাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হ'ল—নব জনপ্রশাসন আন্দোলন (New Public Administration)। ষাটের দশকের শেষ ভাগে কয়েকজন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ও জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ জন-প্রশাসনের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা ও সূত্রগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তাঁরা Dwight Waldo-র নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালে সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনোব্রুকে একটি সম্মেলনে মিলিত হ'লেন এবং ঘোষণা করলেন যে, জন-প্রশাসনকে কেবলমাত্র একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে ধরা যাবে না ; কারণ, সমাজে যারা দরিদ্র, লাঞ্ছিত, পতিত, শোষিত ও অবহেলিত, তাদের দুঃখমোচনে যদি সমাজের প্রশাসনিক সংস্থাগুলি ব্রতী না হয়, তবে বিস্তৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আর কী হ'তে পারে ? অর্থাৎ, জন-প্রশাসনকে সমাজের এই গরিষ্ঠ বঞ্চিত অংশের ব্যথা-বেদনা উপশমের নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অতএব, জন-প্রশাসনকে কর্মতৎপর, সংবেদনশীল, হার্দ্যিক ও সক্রিয় হ'তে হবে। সেজন্য নব জনপ্রশাসন চারটি বিষয়ের উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় ঃ প্রাসঙ্গিকতা, মূল্যবোধ, ন্যায়বিচার ও পরিবর্তন। সামাজিক সমস্যার প্রাসঙ্গিকতার প্রেক্ষাপটে জননীতি প্রণীত হবে। জন-প্রশাসনের পক্ষে মূল্যবোধ বর্জন করা অবাস্তব হবে তাই নয়, তার প্রাসঙ্গিকতাও লোপ পাবে। তাছাড়া, এই শাস্ত্র অবশ্যই দুর্বল, দুঃস্থ মানুষের দুর্দশা অনুভব করবে ও তাদের পক্ষ সমর্থন করবে। এই ধরনের আদর্শ পোষণ করলেই হবে না, জনকল্যাণের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য জন-প্রশাসনকে কর্মমুখী (action oriented) হ'তে হবে। সরকারী সংগঠনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জনগণের সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করা নয়, সমস্ত মানুষের সামনে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সমান সুযোগ সম্ভাবনার সৃষ্টি করাও জন-প্রশাসনের গুরুত্বদায়িত্ব। মিনোব্রুকে সম্মিলিত গবেষক ও বিশেষজ্ঞজন মনে করলেন যে, উক্ত লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছতে হলে আমলাতান্ত্রিক (bureaucratic) রাষ্ট্রের কাঠামো বর্জন করতে হবে ; কারণ, আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে

বর্তমানে ন্যায়বিচার ও আদর্শভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি আশা করা যায় না। সেখানে কেবল ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির নিজেদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ সিদ্ধ হয়। ফেলিক্স্ নিগ্রো তাই বলেছেন যে, নতুন জনপ্রশাসন মনে করে যে, সরকারী প্রশাসকগণের উচিত তাদের আপাতঃ নিরপেক্ষতা ত্যাগ করা ও সমাজকল্যাণে ব্রতী হওয়া। তাই মিনোব্রুককে যে আন্দোলনের জন্ম হয় তাকে তত্ত্ব-বিরোধী (anti-theoretic) দৃষ্টবাদ-বিরোধী (anti-positivist), এবং ব্যবস্থাপনা-বিরোধী (anti-management) বলা হয়। এর ইতিবাচক মূল্য এই যে, নতুন জন-প্রশাসন জনপ্রশাসনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খুব কাছে নিয়ে এসেছে। তৃতীয় বিশ্বে সমাজসচেতন প্রগতিশীল এই নতুন জন-প্রশাসনের গুরুত্ব, তাৎপর্য বা প্রাসঙ্গিকতা উপেক্ষা করা যায় না। Waldo তাই জন প্রশাসনকে "a self-conscious study" বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, জন-প্রশাসন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয় শাস্ত্র নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে পরস্পরের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিলিত হতে পারলেই সরকারের কার্যক্রম ও লক্ষ্য সফল হবে। একমাত্র রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই জন-প্রশাসনের প্রকৃত আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়িত করতে পারবে।

২.১১ গণ-পছন্দ দৃষ্টিভঙ্গী

জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তনের আলোচনায় আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল 'public choice approach'। মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গি চিরাচরিত আমলাতন্ত্রের সমালোচনা করে সমাজে গণ-সংস্থার বৃদ্ধি ও প্রসারের কথা বলে যার সাহায্যে জনগণের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু পৌছে দেওয়া সম্ভব হবে। Vincent Ostrom তাই আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের পরিবর্তে নতুন এক ধরনের গণতান্ত্রিক প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করেন, যার ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে জন-প্রশাসন জনগণের সহযোগিতায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বহুমুখী সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে পাবে। জনগণের আস্থা ও সহযোগিতায় অনুপ্রাণিত এই সকল গণ-সংস্থার সমন্বয়ের দ্বারা পরিবেশগত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনগণের সকল সমস্যার নিষ্পত্তি হবে। অতএব, এই মতের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা মনে করেন যে, জন-প্রশাসনের আধার হ'ল রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি। জন-প্রশাসনকে তাই রাজনীতি বা রাজনৈতিক সংগঠনের (political organization) পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, সমালোচনাত্মক তত্ত্বের (Critical Theory) কথা। এই দৃষ্টিভঙ্গির যাঁরা পৃষ্ঠপোষক তাঁরা মনে করেন যে, বর্তমান রাষ্ট্রে সরকারের দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক এই আধিপত্য জনসাধারণের দ্বারা অনুমোদিত হয় নি, কারণ জনসাধারণ আমলাতন্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট অনীহা পোষণ করে এবং একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হিসেবে একে আস্থার অযোগ্য বলে মনে করে। তাছাড়া, এই সমালোচক গোষ্ঠী আমলাতন্ত্রের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাসের (hierarchy) বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন এবং মনে করেন যে, যতক্ষণ না প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ (administrative decentralization) প্রশাসনিক পুনঃসংগঠন (administrative reorganization) এবং সামাজিক সম্পর্কের গণতান্ত্রিকীকরণ (democratisation of social relationships) ঘটছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণের বাস্তব সমস্যা সমাধানের পথে নানা ধরনের বাধা-বিঘ্ন থেকেই যাবে।

পরিশেষে, বলা যেতে পারে যে, গবেষণা ও অধ্যয়নের এক বিষয় হিসেবে জন-প্রশাসন আজও একটি সুস্পষ্ট সত্তা গড়ে তুলতে পারে নি। তার প্রধান কারণ এই যে, জন-প্রশাসনকে সব সময়েই পরিবেশগত, পারিপার্শ্বিক

সব রকম পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়েছে। প্রশাসনিক দক্ষতা বা উৎকর্ষসাধনই তাই আজ জন-প্রশাসনের মূল লক্ষ্য নয়। প্রশাসন আজ তাই জনকল্যাণসাধন ও সামাজিক ন্যায়বিচার (social justice) নিয়েও যথেষ্ট চিন্তিত। তাছাড়া, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও সমাজব্যবস্থায় আমরা বেসরকারী সংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানতেই হবে যে, সরকারের গুরুভার কিছুটা লাঘব হয়েছে ; সরকার আজ বহু বেসরকারী সংস্থাকে (non-governmental organizations) আমন্ত্রণ জানাচ্ছে প্রশাসনিক তথা সামাজিক ক্রিয়াকলাপে উদ্যোগী হ'তে ; কারণ, বর্তমান সমাজের জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য জনগণের সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই, বর্তমানে সরকার নিজেকে কর্তার (doer) চেয়ে 'সহায়ক' enabler) হিসেবে উপস্থাপিত করছে।

সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে তাই জন-প্রশাসনের সত্তা সুস্পষ্ট হয় নি। কিন্তু তাই বলে জন-প্রশাসন গবেষণার বিষয় হিসেবে অবহেলার যোগ্য নয়। পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে বলেই জন-প্রশাসনকে তার ক্রমবিবর্তনের কোনও অধ্যায়েই শিথিলতা গ্রাস করে নি ; আজও জনপ্রশাসন প্রগতিশীল ও পরিবর্তনশীল।

২.১২ সারাংশ

যে কোনও সমাজবিজ্ঞান অলোচনা ও বিশ্লেষণে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী অতি প্রয়োজনীয়। তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া কোন সমাজবিজ্ঞানের রীতিবদ্ধ আলোচনা করা যায় না। এই এককে আমরা জন-প্রশাসনের বিবর্তনের যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে তা আলোচনা করেছি। জন-প্রশাসনের ক্রমবিবর্তনের আলোচনার যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আছে তাও আমরা এই এককে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছি।

২.১৩ অনুশীলনী

১। জন-প্রশাসনের বিবর্তনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করুন।

২। জন-প্রশাসনের বিবর্তনের যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী তার মধ্যে কোনগুলি আধুনিককালের উপযুক্ত ও কেন?

২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

Arora Ramesh K. : Comparative Public Administration. Associated Publishing House, New Delhi, 1985.

Riggs Fred : Administration in Developing Countries Countries : The Thoery of Prismatic Society, Houghton Clifflin Boston, 1964.

Varma, S. P. and Sharma S. K. : Comparative Administration, IIPA, New Delhi, 1983.

একক ৩ ❑ জন-প্রশাসনের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ জন-প্রশাসন কি বিজ্ঞান?
৩.৩ জন-প্রশাসন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান
৩.৪ জন-প্রশাসন ও অর্থনীতি
৩.৫ জন-প্রশাসন ও সমাজতত্ত্ব
৩.৬ জন-প্রশাসন ও ইতিহাস
৩.৭ জন-প্রশাসন ও আইন
৩.৮ সারাংশ
৩.৯ অনুশীলনী
৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা সমাজবিজ্ঞানে জন-প্রশাসনের স্থান এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক আলোচনা করব। সুতরাং এই একক পড়ে আপনি পারবেন—

- জন-প্রশাসনের অখণ্ড চরিত্র বর্ণনা করতে
- ভিন্ন ভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে
- কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে জন-প্রশাসনের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, এবং আইনের সম্পর্ক আছে তা আলোচনা করতে।

৩.১ প্রস্তাবনা

মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবজন্তুর প্রধান পার্থক্য বোধ হয় এই যে, অন্যান্য প্রাণীকে যেখানে প্রকৃতির কাছে অসহায় বোধ করতে হয়, প্রকৃতির দপট বা খামখেয়ালী আচরণ গ্রাহ্য করতে হয়, সেখানে মানুষ তার সুবিধার জন্য প্রকৃতিকে প্রভূত পরিমাণে বশ করতে শিখেছে। সে তার নানা আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজেকে প্রকৃতির বৈরিতা

ও প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু ক্রমশ মানুষ অনুভব করল যে, তার সুবিধার জন্য সে যেমন তার ভৌগলিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তেমনি তার সামাজিক তথা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক জীবনের পটভূমিতেও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এই বিশ্বাস মানুষকে সমাজবিজ্ঞানের চর্চায় উদ্বুদ্ধ করল—ক্রমে মানুষ তার নিজের সৃষ্টি করা সমাজ জীবনের রহস্য উন্মোচনে, তার উন্নয়ন, অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণে ব্রতী হ'ল—সমাজবিজ্ঞান তার শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে উদয় হ'ল, যথা ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, প্রশাসন শাস্ত্র ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এ সকল শাখা-প্রশাখা মানবজীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উপর দৃষ্টিপাত করে। এ কথা সত্য যে, বিভিন্ন বিষয়ের কার্যধারা পদ্ধতি ও প্রকরণ ভিন্নতর। কিন্তু, তাই বলে তাদের আন্তঃসাদৃশ্য উপেক্ষা করা যায় না। শুধু তাই নয়, তাদের আন্তঃশাস্ত্রীয় সম্পর্ককেও (inter-disciplinary relations) অস্বীকার করা অসম্ভব, কারণ প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন হয়ে একে অপরকে অস্বীকার করে এদের পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়।

বলা যেতে পারে যে, আধুনিক গবেষণা পদ্ধতির মূল কথাই হ'ল সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময় এবং তুলনা ও প্রতিতুলনা। এই ধরনের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়েই প্রতিটি শাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, প্রতিটি শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী পরিপূর্ণতা লাভ করবে। তাই জন-প্রশাসনও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, অন্যের প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজের বিকাশ ও উন্নয়ন করতে পারবে না। অন্যান্য শাখার মতো জন-প্রশাসনও মানুষের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে, ফলে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও জন-প্রশাসন একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

৩.২ জন-প্রশাসন কি বিজ্ঞান ?

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো-এ্যারিস্টটলের সময় থেকে সমাজবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে দেখা হ'ত, কিন্তু কালক্রমে এর বিভিন্ন দিকগুলি বিশ্লেষণ করার জন্য এই সমাজবিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। সমাজবিজ্ঞানের দ্রুত পরিবর্তন আনে শিল্পবিপ্লব। শিল্পবিপ্লবের জন্য চারিদিকে নতুন নতুন গবেষণা, উদ্ভাবন চলতে থাকলে সমাজবিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি হয় এবং বিভিন্নরূপে আবর্তিত হ'তে থাকে। সমাজবিজ্ঞান ভাগ হয়—অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জন-প্রশাসন, সমাজবিদ্যায়।

জন-প্রশাসনের অভাবনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আর একটি প্রশ্ন এসে যায়—জন-প্রশাসন কি সত্যি সমাজবিজ্ঞান ? বিজ্ঞান হিসেবে জন-প্রশাসন তাৎপর্য কতখানি ?

জন-প্রশাসনকে বিজ্ঞান বলা যাবে কি না ১৮৮৭ সালে উড্রো উইলসন তাঁর The Study of Public Administration নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। উইলসন বলেছেন যে, সরকারী কাজকর্মকে সরল ও সংগঠনকে ক্রটিমুক্ত ও শক্তিশালী করার জন্য জন-প্রশাসনের একটি নিজস্ব বিজ্ঞান থাকা উচিত। ("...there should be a sciene of administration which shall seek to straighten the paths of Governments to make its business less unbusiness like, to strengthen and purify its organisation and to crown its duties with dutifulness. This is one reason why there is such a science." Wilson.)

বিজ্ঞানের কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(১) নিশ্চয়তা, (২) বৈধতা, (৩) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বিজ্ঞানের একটা উদারনৈতিক অর্থ আছে। পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে কোনও কিছু সম্বন্ধে যদি পূর্বাভাস দেওয়া যায় তাহ'লে তাকে বিজ্ঞান বলা হয়। বিজ্ঞান কতকগুলি সুগঠিত ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে। পদ্ধতিগুলো হ'ল—পরীক্ষণ, অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ, সত্য প্রতিপাদন ইত্যাদি। গ্রীক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল মনে করেন যে, কলা হ'ল কিছু কাজ করা এবং বিজ্ঞান কিছু জানা। তাই, বিজ্ঞান অজানাকে জানার জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে আমরা বিভিন্ন বিষয়কে ভৌত বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে ভাগ করতে পারি। এই তিনটি বিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র হ'ল মানবজীবনকে কেন্দ্র করে, তবে তফাৎ হ'ল বিজ্ঞান কোন ঘটনা বা তথ্যকে মূল্যবোধ, ভালমন্দ বা নৈতিকবোধ নিয়ে বিচার করে না ; কিন্তু সমাজবিজ্ঞান করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, মনস্তত্ত্ব-এর সিগমণ্ড ফ্রয়েড-এর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সর্বকালে এবং সর্বস্তরে এই অবদান কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কিন্তু, ভৌত বিজ্ঞানে সঠিকতা বা নিশ্চয়তা বিচার এত সূক্ষ্ম যে, ফ্রয়েডের অবদানকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায় না। উপরন্তু ভৌত বিজ্ঞানে সংগৃহীত তথ্যকে কোন মানবিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয় না।

জন-প্রশাসন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ করে। অতীতের জ্ঞানকে ভবিষ্যতে কাজে লাগায়। এই অর্থে জন-প্রশাসনকে বিজ্ঞান বলা যায়। এটি গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জনপ্রশাসন প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানই নয়। কারণ, জন-প্রশাসনের সঙ্গে নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধ এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, জন-প্রশাসনে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা চলে না। সুতরাং জন-প্রশাসন সে অর্থে বিজ্ঞান নয়।

বরং, জন-প্রশাসনকে সমাজবিজ্ঞান বলা চলে। কারণ, সমাজবিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হ'ল মানবসমাজ। জনগণ-ই হ'ল জন-প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। জন-প্রশাসনের বিভিন্ন সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জনগণকে ভালমন্দ নিয়ে অলোচনা করে, এর সদর্থক ও নেতিবাচক—উভয়ই আছে। "কি" ? এবং "কি হওয়া উচিত"—এইটা হ'ল জন-প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা জন-প্রশাসন নীতি মূল্যবোধ আদর্শ দিয়ে বিচার করে থাকে।

৩.৩ জন-প্রশাসন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

জন-প্রশাসনের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ বহুকাল ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গর্ভেই লালিত হয়েছে জন-প্রশাসন। অর্থাৎ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানই হ'ল জন-প্রশাসনের উৎস ; যে কারণে অনেকে জন-প্রশাসনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি উপশাখা হিসেবে গণ্য করেন।

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ক্রোড়ে জন্ম নিয়েছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য ছিল রাষ্ট্র, তার উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও প্রকৃতি। নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ; সে কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি নীতিবাচক (normative) বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হ'তে লাগল, পুলিশ রাষ্ট্র ধীরে ধীরে স্থান করে দিল জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে

(Welfare State)। ফলে, রাষ্ট্রের কর্মসূচী আয়তনে বাড়লো, প্রয়োজন হ'ল উপযুক্ত বিধিনিয়ম প্রণয়নের ও তার বাস্তবায়নের। এই প্রয়োজনবোধই হ'ল জন-প্রশাসনের জনক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হ'ল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম রচনা, নীতি নির্ধারণ ও আইন-প্রণয়ন। আর যথাযথ সংগঠনের মাধ্যমে সঠিকভাবে নির্ধারিত নীতি ও প্রণীত আইনকে রূপায়িত বা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব জন-প্রশাসনের। কিন্তু, এর মানে এই নয় যে, নীতি নির্ধারণ ও নীতি রূপায়ণ দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক স্তরের ক্রিয়াকলাপ। এই পৃথকীকরণ তাত্ত্বিক (theoretical) বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও প্রকৃতপক্ষে অচল এবং অকাম্য। কারণ, রাজনৈতিক নেতারা বা রাজনীতিবিদ্‌রা সব সময়েই চাইবেন এমন নীতিই নির্ধারিত করতে যাকে নির্বিঘ্নে বাস্তবায়িত করা যাবে এবং সেহেতু তাঁদের প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা (consultation) করে নেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। আধুনিক জন-প্রশাসন নিষ্ঠা, সততা, দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে জননীতি বাস্তবায়নের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, জনবিরোধী নীতি গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার গুরুদায়িত্ব এখন কেবলমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নয়, সে দায়িত্ব যথেষ্ট পরিমাণে জন-প্রশাসনেরও। এর থেকেই অনুমান করা যায় যে, দুই-এর মধ্যে সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ ও পরিপূরক।

বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু আর রাষ্ট্র নয়। আধুনিক রাজনীতিবিদ্‌রা রাজনীতিকে এক ধরনের মানবিক আচরণ (human behaviour) হিসেবে দেখতে চায়— যে আচরণের মূলে বা গভীরে রয়েছে বিরোধ ও বিরোধ-মীমাংসার প্রয়াস (conflict and attempted resolution of conflicts)। বর্তমান রাষ্ট্রে আমরা দেখতে পাই যে, বিরোধ ও সংঘাতের পটভূমিতেই আইন প্রণয়ন করা হয়। সেই আইন প্রয়োগ করতে হয় জন-প্রশাসনিক সংস্থার মাধ্যমে শাসনবিভাগের দ্বারা। অতএব জন-প্রশাসন আইন প্রয়োগে মধ্যস্থতাকারী বা মীমাংসাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে। অর্থাৎ, বিরোধের মীমাংসা হবে কি না, তা প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে প্রশাসনিক দক্ষতার উপর। তাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য এবং সরকারী সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার মূল দায়িত্ব আজ জন-প্রশাসনের।

কিন্তু, জন-প্রশাসন সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার নিতান্তই এক যন্ত্র নয়। বর্তমানে জন-প্রশাসন সরকারের নীতি নির্ধারণ বা উদ্দেশ্য স্থাপনের কাজেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির দ্রুত উন্নয়নের প্রয়োজনে ; জন-প্রশাসন এখানে প্রয়োজন আনুপাতিক রাষ্ট্রনীতির কথা ভাবছে। তাই বহু প্রখ্যাত প্রশাসনবিদ্ মন্তব্য করেছেন যে, কোনও দেশের পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। আজ এক স্বতন্ত্র প্রগতিশীল ও পরিবর্তনশীল গবেষণা ও অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে গণ্য হ'লেও, জন-প্রশাসনের ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অস্বীকার করা অসম্ভব।

৩.৪ জন-প্রশাসন ও অর্থনীতি

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, রাজশক্তি তখন মূলত তিনটি কাজ করত : রাজস্ব আদায়, আইনের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্রের পরিধির বৃদ্ধি ঘটানো। তিনটি কাজেই প্রশাসনের ব্যবহার ছিল অনিবার্য। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রশাসন ও অর্থনীতির পারস্পরিক যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রভাবিত

করেছিল, কারণ প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব সংগৃহীত হ'ত, আবার রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজনে প্রশাসনকে ব্যবহার করা হ'ত।

আধুনিক যুগেও আমরা অর্থনীতি আর জন-প্রশাসনের নিবিড় সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করতে পারি না। বর্তমান পৃথিবীতে তিন ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামোর দর্শন পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের বেশীর ভাগ দেশগুলিতে, যেখানে উদারনৈতিক গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, সে সব জায়গায় ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (capitalism) বিরাজ করে। এখানে উৎপাদনের সব উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা (socialism) স্থাপিত। আর কিছু কিছু দেশে মিশ্র অর্থনীতি (mixed economy) রয়েছে, যেখানে অবাধ বাণিজ্য (free enterprise) ও সমাজতন্ত্র (socialism) উভয়ের কিছু কিছু উপাদান একই কাঠামোয় অবস্থান করে। কিন্তু, যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হ'ল এই যে, এই তিন ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামোতেই প্রশাসনিক দায়িত্বপালনের বা সরকারের ভূমিকার গুরুত্ব অসামান্য। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গ। সরকারের কাছে এই সব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার প্রধান হাতিয়ার হ'ল জন-প্রশাসন। তাই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ ও তার প্রতিকার পরিকল্পনা ও সাধন হ'ল জন-প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক সাফল্যই বর্তমান রাষ্ট্রের প্রগতি বা উন্নয়নের মাপকাঠি এবং এই সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে জন-প্রশাসনের কর্মদক্ষতা ও উৎকর্ষের উপর।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, প্রশাসনবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের মতো অর্থনীতি বা অর্থবিজ্ঞানও তাই আজ সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা, যে শাখা জন-প্রশাসনের সঙ্গেও এক নির্ভরশীল ও পরিপূরক সম্পর্কে আবদ্ধ। তবে, অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে জন-প্রশাসনের একটি তফাৎ এই যে, প্রথমটির ক্ষেত্রে তত্ত্ব নির্মাণের ভিত্তি এক মূল্য বা উপযোগিতার সর্বাধিকরণকারী 'economic man' কিন্তু জন-প্রশাসনের তত্ত্ব নির্মাণের কেন্দ্রে আছে এক প্রশাসনিক মানুষ বা 'administrative man' যার কথা বলেছেন (Whyte)। সে সর্বাধিকরণ, (maximization) বা (optimization) চায় না। সে চায় অসম্পূর্ণ তথ্য আর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিস্থিতিতে যথেষ্টীকরণ (satisfying)।

৩.৫ জন-প্রশাসন ও সমাজতত্ত্ব

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল মনে করেছিলেন যে, মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী। অর্থাৎ সমাজবিহীন জীবন মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। অতএব, সমাজই হ'ল মানুষের বহুমুখী ক্রিয়াকলাপের আধার; স্বাভাবিকভাবেই তার সমাজজীবন বা তার সামাজিক চরিত্র তার সব রকম কার্যক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সমাজতত্ত্বকে জন-প্রশাসনের মতই এক নবীন পঠন-পাঠন অধ্যয়নের শাস্ত্র হিসেবেই গণ্য করা যায়। ১৮৪২ সালে ফরাসী চিন্তাবিদ্ অগাষ্ট কোঁত (August Comte) তাঁর Positive Philosophy গ্রন্থে 'সমাজতত্ত্ব' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, সমাজতত্ত্বই সমাজবিজ্ঞানের সকল শাখার মূল উৎস বা শাস্ত্র (Mother science)। যে কোনও সমাজবিজ্ঞানেরই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। তবুও Robert Bierstedt-এর মতে, 'সমাজতত্ত্ব' বলতে বোঝায় সমাজ কাঠামো সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা গবেষণা, সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন

উপাদান বা অংশগুলির মধ্যে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস স্থাপনের প্রয়াস এবং সেই অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ, সম্ভব হ'লে সামাজিক পরিবর্তনের সাধারণ প্রণালীগুলির প্রকৃতি আবিষ্কার। (Sociology is an enquiry into the structure of society, an endeavour to achieve an orderly arrangement of the components of that structure, to delineate the relationship of those components to one another, and to discover, if possible, the general processes of social change). Bierstedt যে সমাজ কাঠামোর কথা বলেছেন সেই কাঠামোর একটি অন্যতম স্তম্ভ হ'ল জন-প্রশাসন। প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ, মানুষের সামাজিক চরিত্রেরই এক প্রতিফলন ; প্রশাসনিক পদ্ধতি সামাজিক পদ্ধতিরই অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু সামাজিক কাঠামোর পরিধিতে বা পরিসরেই জন-প্রশাসন কাজ করে সেহেতু সামাজিক পরিবেশ (social ecology) বা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি (social norms) জন-প্রশাসনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

জন-প্রশাসন জনস্বার্থ বা জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে সকল সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা আইনগত প্রেক্ষাপটেই বিবেচিত হয় না। মানুষের সামাজিক চরিত্র বা সমাজজীবনের রূপরেখাও তার নির্ণয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। সামাজিক সংস্কার, মূল্যবোধ সবকিছুই প্রশাসনিক নীতির গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করে। ফলে, প্রশাসক ও প্রশাসনবিজ্ঞানীকে সমাজতত্ত্বের কলাকৌশল ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হ'তে হয়। সমাজতত্ত্ব তাই জন-প্রশাসনের এক নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক।

জন-প্রশাসন এবং সমাজতত্ত্ব উভয়েই মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও আচার-আচরণের কারণ খুঁজতে আগ্রহী। কিন্তু, দুই বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু ভিন্ন। সমাজতত্ত্ব মানুষের সামাজিক জীবনের বহুমুখী বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করে ; আর জন-প্রশাসন সমাজস্থ মানুষের রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক জীবনের কলাকৌশল উদ্‌ঘাটন করে। তাই Tom Bottomore এবং F. H. Giddings মনে করেন যে, উভয় বিজ্ঞানের গবেষণাক্ষেত্র ভিন্ন। সমাজতত্ত্ব মানুষের সামাজিক কাঠামোর গবেষণায় রত, আর জন-প্রশাসন সেই কাঠামোর একটি নির্দিষ্ট বা বিশেষ অংশ, অর্থাৎ, সরকারী কার্যধারা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। কিন্তু সরকার যেহেতু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই তার দায়দায়িত্ব পালন করে, স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক জীবন সরকারী সিদ্ধান্ত বা কর্মপ্রণালী বা আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয় ; আবার সমাজজীবন ও সমাজের আদর্শ, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি উপাদান প্রশাসনিক ব্যবহার বা সংস্থাকে স্পর্শ করে। তাই সমাজতত্ত্ব ও জন-প্রশাসন যদিও সমাজের ভিন্ন স্তরের গবেষণায় রত, তথাপি দু'টি বিষয়ই একে অপরের নির্ভরশীল ও পরিপূরক।

সমাজ ও রাষ্ট্র সরকার ও প্রশাসনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অতএব, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রশাসনবিজ্ঞান এক তেরঙ্গা পতাকার মতো—এদের নিজ নিজ রঙ গাঢ় এবং সুস্পষ্ট, কিন্তু যে কোনও একটি রঙও বাদ দিলে যেমন পতাকা ম্লান হয়ে যায়, তার অর্থ ক্ষুণ্ণ হয়, ঠিক তেমনি সমাজবিজ্ঞানগুলির এই ত্রিধারা মানবিক বিজ্ঞানগুলির অন্যতম উল্লেখযোগ্য শাখারূপে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ।

৩.৬ জন-প্রশাসন ও ইতিহাস

জন-প্রশাসন গবেষণার এক বিষয় হিসেবে তুলনামূলকভাবে নবীন হ'লেও, প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ প্রাচীনকালেও পরিব্যাপ্ত ছিল। একথা কিন্তু জানা যায় ইতিহাসের থেকেই। ইতিহাসের জ্ঞান-ভাণ্ডারেই সঞ্চিত ছিল জন-প্রশাসনের

উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তনের কাহিনী। অতীতে প্রশাসনিক কাঠামো, তার সমস্যা, সাফল্য বা ব্যর্থতার ইতিহাস—আজকের জন-প্রশাসনকে অমূল্য তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে। ইতিহাস-প্রদত্ত এই সকল তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই জন-প্রশাসন বর্তমানে সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়, ভবিষ্যতের রূপরেখা ও কর্মসূচী পরিকল্পনা করতে সাহস পায়। তাই সংক্ষেপে এবং নির্দ্ধিধায় বলা যেতে পারে যে, ইতিহাস জন-প্রশাসনের পথে আলোকপাত করে, তার ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারণের অপরিহার্য উপাদান যোগায়। (History acts as an indispensible guide for future actions.)

তাই একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, ইতিহাসকে বাদ দিয়ে জন-প্রশাসনের পঠন, অধ্যয়ন ও চর্চা অসম্ভব। অতীতে কোন্ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত কি পরিপ্রেক্ষিতে কতটা ফলপ্রদ হয়েছে, কোনও প্রশাসনিক কর্মপ্রণালীর সাফল্যের পেছনে কি কি কারণ ছিল, অথবা কোনও প্রশাসনিক পন্থার ব্যর্থতার জন্য কি কি উপকরণ দায়ী—বর্তমানের ছাত্র ও গবেষকদের কাছে অনুশীলনের ও বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু। তাই জন-প্রশাসন ও ইতিহাসের সম্পর্ক সুগভীর ও ঘনিষ্ঠ।

৩.৭ জন-প্রশাসন ও আইন

মেলিনোস্কির মতে, আইন হ'ল সমাজ দ্বারা স্বীকৃত কতকগুলো নীতি। ঠিক একই আইনের সংজ্ঞা দিয়েছেন গুডহার্ট। তিনি মনে করেন, আইন হ'ল এমন কতকগুলো নীতি যা সমাজধারায় বাধ্যতামূলক বলে স্বীকৃত। তাই আইনের সাথে আইন ভঙ্গ করার জন্য শাস্তি দানের ব্যবস্থা থাকে। যেহেতু আইন বাধ্যতামূলক, আইন বলবৎ করার জন্য দক্ষ কর্মিবৃন্দের প্রয়োজন আছে। এই কর্মীরা প্রশাসনের মাধ্যমে আইন বলবৎ-এর কাজ করে থাকে। এরই মধ্যে নিহিত আছে আইন ও প্রশাসনের গভীর সম্পর্ক।

জন-প্রশাসনকে দেশের আইনগত কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, আইন প্রশাসনের কাজের সীমানা নির্দেশ করে থাকে। আইন ও প্রশাসনকে একসাথে বলা যায় প্রশাসনিক আইন। আইনসভা আইন তৈরি করে, প্রশাসন সেই আইন বলবৎ করে থাকে। তবে প্রশাসনের ভূমিকা শুধুমাত্র আইন বলবৎ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ—এ কথা বলা যায় না। প্রশাসনের আইন তৈরী করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা থাকে। আমলারাও দেশের খসড়া তৈরী, আইনসভায় পেশ করা এবং আইন প্রণয়ন করার সময় বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

বাস্তবিকই জন-প্রশাসনকে আইন বলবৎ করার যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কোনও কোনও দেশে আইন ও জন-প্রশাসনের আন্তঃসম্পর্ক এতই গভীর যে, এই দু'টিকে পরস্পর থেকে আলাদা করা যায় না। আইন ও জন-প্রশাসনের ছাত্র-ছাত্রীরা একই সঙ্গে অর্পিত ক্ষমতা, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে থাকে। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতে লোকপাল লোকায়ুক্ত ইত্যাদি বিষয়গুলো জন-প্রশাসন আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। ক্রমাগত এই দু'য়ের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছে।

৩.৮ সারাংশ

সকল সামাজিক ঘটনা পরস্পরে সংযুক্ত। কোন সামাজিক ঘটনাকে একক অবস্থান অনুধাবন করা যায় না। তাই

সমাজবিজ্ঞান তার শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে উদয় হ'ল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে, এ সকল শাখা-প্রশাখা মানবজীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের উপর আলোকপাত করে থাকে। তাদের বিভিন্ন কার্যধারা ও পদ্ধতি থাকলেও তাদের আন্তঃসম্পর্ককে উপেক্ষা করা যায় না। আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা বিষয়কে সমৃদ্ধ করে থাকে। জন-প্রশাসন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে নানাভাবে ঋণী ; কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জঠর থেকে জন-প্রশাসনের উৎপত্তি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণার মধ্যে দিয়ে এর কৈশোর প্রাপ্ত। তেমনি, সমাজবিদ্যা (sociology) জন-প্রশাসনকে স্বনির্ভরতা এনে দিয়েছে। ম্যক্স হেববারের আমলাতন্ত্র অলোচনা জন-প্রশাসনকে নানাভাবে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে। ইতিহাস জন-প্রশাসনকে অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্তমানকে বুঝতে সাহায্য করে থাকে। জন-প্রশাসন ও আইনের সম্পর্ক গভীর। প্রশাসনের প্রধান ভূমিকা হ'ল আইনের যথাযথ রূপায়ণ। আইন ও জন-প্রশাসন কতকগুলি একই বিষয় আলোচনা করে থাকে।

এই প্রসঙ্গে অতি যত্ন সহকারে জন-প্রশাসনের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা করে ছাত্র ছাত্রীদের সামাজিক ঘটনাগুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছে।

৩.৯ অনুশীলনী

(১) জন-প্রশাসন কি বিজ্ঞান ?

(২) জন-প্রশাসন-এর সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক কি ?

(৩) 'জন-প্রশাসন ও আইন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত'—ব্যাখ্যা করুন।

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

Dimock, Marshall Elward and Dimock, Glady Ogden : Public Administration ; Oxford and TBH Publising Co. ; New Delhi, 1975.

Sharma M.P. : Public Administration Theory and Practice Kitab Mahal, Allahabad 1960.

একক ৪ □ তুলনামূলক জন-প্রশাসন, উন্নয়ন-প্রশাসন ও আধুনিক জন-প্রশাসন

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ তুলনামূলক জন-প্রশাসন আলোচনার প্রকৃতি

৪.২.১ তুলনামূলক জন-প্রশাসন আলোচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

৪.৩ উন্নয়ন প্রশাসন ঃ প্রকৃতি ও সংজ্ঞা

৪.৩.১ উন্নয়ন প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য

৪.৩.২ উন্নয়ন প্রশাসন ও সনাতনী প্রশাসনের পার্থক্য

৪.৪ আধুনিক জন-প্রশাসনের প্রকৃতি

৪.৫ সারাংশ

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি পারবেন ?

- জন-প্রশাসনের তুলনামূলক আলোচনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে
- তুলনামূলক আলোচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করতে
- উন্নয়ন প্রশাসনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করতে
- জন-প্রশাসনের নতুন উদ্ভব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে

৪.১ প্রস্তাবনা

জন-প্রশাসনের তুলনামূলক আলোচনার ইতিহাস অতি প্রাচীন, কিন্তু এই তুলনামূলক আলোচনার উপর মাত্র চল্লিশ বছর আগে আলোকপাত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে জন-প্রশাসনের তুলনামূলক আলোচনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তুলনামূলক জন-প্রশাসনের খুব সহজভাবে সংজ্ঞা

দেওয়া যায়। তুলনামূলক জন-প্রশাসন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারের কার্যাবলী এবং প্রশাসনের তুলনামূলক আলোচনা করে থাকে। পণ্ডিতব্যক্তিরা নানাভাবে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত নিয়ে তুলনামূলক জন-প্রশাসনের আলোচনা ক্ষেত্র প্রসারিত করেছেন।

জন-প্রশাসনের তুলনামূলক আলোচনার গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন-প্রশাসনের আর একটি নতুন দিকের সূচনা হয়। সেটা হ'ল উন্নয়ন-প্রশাসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে উন্নয়নের জন্য নতুন ধ্যান-ধারণার চিন্তার প্রয়োজন হ'ল। এই উন্নয়ন-প্রশাসন ধারণাটির প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি জন-প্রশাসন সম্পর্কিত ভারতীয় পত্রিকায় একজন অজ্ঞাতনামা জনৈক গোস্বামীর লেখা থেকে। কিন্তু, সেই লেখা বিশেষ সাড়া জাগাতে পারে নি। ষাটের দশকে সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু প্রশাসনবিদ্‌দের প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক প্রশাসন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের 'নতুন ব্যবস্থা' বা New Deal নীতির পরিপ্রেক্ষিতে টিনেসী ভ্যালি অথরিটি নামক সংস্থা তৈরী করে। তার পরিচালনায় এই নতুন নীতিগুলি কাজে লাগানোর ফলে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করায় জন-প্রশসনের এই নতুন দিকটির প্রচার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তখনই এই উন্নয়নমূলক প্রশাসন বা Development Administraton নামকরণ হয়।

উন্নয়ন-প্রশাসন সাধারণত আলোচনা করে থাকে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রশাসন দক্ষতা, এই দেশগুলির আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলির যথাযথ নির্বাচন ও সমাধান, উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও তার সদ্ব্যবহার ইত্যাদি। এই বিষয়গুলো আলোচনার সময় আমাদের উন্নয়ন প্রশাসন এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য ভুললে চলবে না।

এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলির প্রশাসনের জন্য যখন উন্নয়নশীল প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমী দুনিয়ায় সনাতনী প্রশাসনের সংস্কার ও পুনর্গঠনের তোড়জোড় চলতে লাগল। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী গবেষকরা তাদের লেখার মাধ্যমে জন-প্রশাসনের সংস্কারের জন্য ননা প্রস্তাব দিতে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৭ সালে এফ. সি. মোয়ার সম্পাদিত "Government Reorganization : cases and Commentaries" বইটি। এই বইটি জন-প্রশাসনের পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করে এবং নানা প্রস্তাব দিয়ে থাকে। বইয়ে উল্লেখিত সব প্রস্তাবগুলি সকলের দ্বারা গৃহীত না হ'লেও বইখানি জন-প্রশাসনের নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় ১৯৬৮ সালে সিন্নোওব্রুক শহরে অনুষ্ঠিত কনফারেন্স-এ জন প্রশাসনের সংস্কার নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা হয়ে থাকে। এই দীর্ঘকালীন আলোচনার মধ্য থেকে জন-প্রশাসনের আধুনিক তত্ত্ব তৈরি হয়।

৪.২ তুলনামূলক জন-প্রশাসন আলোচনার প্রকৃতি

কিছু সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, যে কোন সামাজিক বিশ্লেষণে তুলনামূলক আলোচনা হ'ল অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। যখনই আমরা কোনও সামাজিক সমস্যা বা বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি তখনই আমরা কোনও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া তা আলোচনা করতে পারি না। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ডুরখের্ম এই তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রবক্তা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সমাজবিজ্ঞানীসহ অন্যান্য চিন্তাবিদ্‌রা তুলনামূলক রাজনীতি ও প্রশাসন নিয়ে নানারকম চর্চা করতেন ; কিন্তু সেই চর্চা প্রধানত ছিল বর্ণনামূলক এবং নীতিমানবাচক। তুলনামূলক প্রশাসনের প্রবক্তা ফ্রেডরিগস মনে করেন যে, তুলনামূলক জন-প্রশাসনের তিনটি প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় ঃ

(১) নীতিমান বাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ দৃষ্টিভঙ্গি (Normative to empirical)

(২) মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিয়ম কারণাবিস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Ideographic to Nomothelic)

(৩) অ-বাস্তুতন্ত্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাস্তুতন্ত্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Non-ecological to ecological)

৪.২.১ তুলনামূলক জন-প্রশাসন আলোচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

বিংশ শতাব্দীতে জন-প্রশাসনের পরিধি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রুশ বিপ্লব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা ও কার্যাবলী বৃদ্ধি, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আবির্ভাব ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি জন-প্রশাসনের গুরুত্ব অস্বাভাবিভাবেই বাড়িয়ে তোলে। আজকে জন-প্রশাসন সামাজিক জীবনের প্রায় প্রতি স্তরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এমন কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক দেশেও সরকারের কার্যাবলী অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, জন-প্রশাসনের, শিক্ষা-প্রশাসন, যানবাহন-প্রশাসন, স্বাস্থ্য-প্রশাসন ইত্যাদি। সুতরাং, এই ভিন্ন ভিন্ন প্রশাসনের মধ্যে তুলনামূলক প্রশাসনিক কৌশল বা পন্থা ব্যবহার করে আলোচনা করলে বিষয়টির মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই জন-প্রশাসনবিদ্‌রা মনে করেন যা-ই প্রশাসনিক তা-ই তুলনামূলক।

তুলনামূলক জন-প্রশাসনের আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে থাকি। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি প্রায় সবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের সামাজিক প্রশাসনিক পটভূমিকায় উদ্ভব। দৃষ্টিভঙ্গিগুলি হ'ল ঃ (১) আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী (Bureaucratic approach) ঃ এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান হোতা হ'লেন ম্যাক্স হেববার তিনি প্রশাসন পরিচালনার বিশ্লেষণে যৌক্তিকতা (ralionality) এবং দক্ষতার (efficiency)-র উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর এই আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈজ্ঞানিক মূল্য এত বেশী যে, পরর্বতীকালের জনপ্রশাসনবিদ্‌রা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে জন-প্রশাসনের শব্দরূপ (Paradigm) বলে থাকেন। (২) ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী (Behavioural approach) ঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক প্রথায় তথ্য-সংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সত্য যাচাই করা ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। তবে, এইসব পদ্ধতিগুলি প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে মানবিক ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়ে থাকে। (৩) সাধারণ ব্যবস্থা দৃষ্টিভঙ্গী (General system approach) ঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রশাসনকে সমাজব্যবস্থারই এক উপব্যবস্থা মনে করে। প্রশাসনের বিভিন্ন অঙ্গগুলির (ব্যক্তি, তাদের ভূমিকা ও সংস্থাসমূহ) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করে থাকে। তবে এই আলোচনার বিশ্লেষণ করা হয় বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে এই প্রশাসনিক অঙ্গগুলি স্বাভাবিক মিথস্ক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে। (৪) পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গী (Ecological approach) ঃ তুলনামূলক জন-প্রশাসন আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গী সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান প্রবক্তারা এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে থাকেন। পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গী প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাঠামো ব্যবহার, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি কিভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রভাব ফেলে থাকে তাতে

আলোকপাত করেছে। (৫) সংগঠন-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গী (Structural-functional approach) এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূল বিষয় নেওয়া হয়েছে নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান থেকে। সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো থেকে সেই ব্যবস্থার ব্যবহারিক দিক কি হ'তে পারে তা জানতে পারা যায়। উপরন্তু, সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গগুলোর কার্যাবলী তার কাঠামোর প্রকৃতি নির্ণয় করে। ফ্রেডরিগস্ ১৯৫৯ সালে এই সংগঠন কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্য নিয়েই উপস্থিত করেছিনে "Fused, prismatic and diffracted" অর্থাৎ দ্রবীভূত, বিচিত্রোজ্জ্বল ও বিচ্ছুরিত—এই তিন সমাজের মডেলটি। রিগসের ওই মডেলটির কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও গত তিরিশ বছর ধরে জন-প্রশাসন আলোচনায় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রিগস্ মনে করেন যে, একটা প্রিজম সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হ'ল সেই সমাজের কাঠামোগত বিভিন্নতা। তাঁর এই ধারণা ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি "সালা" (Sala) মডেলের সাহায্য নিয়েছেন। (৬) উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গী (Development approach) ঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গী পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন-প্রশাসন আলোচনার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গী পরবর্তী পর্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। তবে উন্নয়ন-প্রশাসন প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী, পরিবর্তনমুখী, প্রগতিশীল করে তুলতে আগ্রহী।

পরিশেষে, আমরা বলতে পারি যে, উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গীগুলি কোনটিই সর্বকালের এবং সর্বজন স্বীকৃত নয় এবং তুলনামূলক জন-প্রশাসন আলোচনা শেষ কথা নয়। প্রশাসন গবেষকদের কাছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভাবনের দরজা সব সময়ই খোলা থাকে।

৪.৩ উন্নয়ন প্রশাসন ঃ প্রকৃতি ও সংজ্ঞা

জন-প্রশাসনকে পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছে তুলনামূলক প্রশাসনের আলোচনা এবং তুলনামূলক প্রশাসনের ধারণা থেকেই উন্নতশীল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সমস্যা ও সংগঠনের প্রশ্নটি গুরুত্ব পেয়েছে। উন্নয়ন প্রশাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল উন্নত রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি তুলনামূলকভাবে উন্নতিশীল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সমস্যা ও সংগঠনের রূপ কি তা বিচার-বিশ্লেষণ করা।

উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণাটি আপেক্ষিক অর্থে নতুন বলা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ স্বাধীন হবার পর নানা প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রশাসনের কাজ শুধুমাত্র সাংগঠনিক রীতিনীতির দ্বারা সচল করে রাখা যায় না। এই সকল দেশ দীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিক শাসনে ছিল। ফলে, তাদের বৈষয়িক বিকাশ ব্যাহত হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বৈষয়িক বিকাশের জন্য কেবল মূলধন বা অর্থনৈতিক কৌশল যথেষ্ট নয়। এর জন্য দক্ষ ও কার্যোপযোগী প্রশাসন ব্যবস্থাও অপরিহার্য। সর্বোপরি, উন্নত দেশের প্রশাসনিক কাঠামোকে বিকাশশীল দেশে উপস্থাপন করে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। ষাটের দশকে তুলনামূলক প্রশাসনের ধারণা যখন জন-প্রশাসনের চিন্তা-ভাবনাকে নানাভাবে আলোড়িত করতে শুরু করে ঠিক সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রেডরিগস্-এর নেতৃত্বে 'তুলনামূলক প্রশাসন গোষ্ঠী' বা Comparative Administration Group (CAG) নামক সংস্থা 'উন্নয়ন প্রশাসন' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে থাকে। পরবর্তীকালে এ্যাওয়ার্ড উইওনারসহ বিভিন্ন প্রশাসনিকবিদ্‌রা উন্নয়ন প্রশাসনের নানাভাবে সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন।

৪.৩.১ উন্নয়ন প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন প্রশাসনবিদ্‌দের দেওয়া সংজ্ঞা থেকে উন্নয়ন প্রশাসনের নানারকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো কোন সীমিত বা নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উন্নয়ন প্রশাসন এক সার্বিক কর্মপন্থা নিয়ে থাকে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় প্রকার রূপান্তরের নির্দেশ দেয়। এক কথায় উন্নয়ন প্রশাসনের কাজ হ'ল জাতিগঠন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানো। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল ঃ—(১) পরিবর্তনমুখী (Change orientation) ঃ উন্নয়ন প্রশাসন সব সময় পরিবর্তনমুখী হয়। এই পরিবর্তন বলতে বোঝায় যে, কোনও একটি ব্যবস্থা বা কাঠামোয় থেকে অন্য ব্যবস্থায় উত্তরণ। তাই উন্নয়ন প্রশাসন সব সময় গতিশীল—স্থিতিশীল নয়। (২) উদ্দেশ্যমুখী (Goal-orientation) ঃ এডওয়ার্ড উইওনাম উন্নয়ন প্রশাসনকে উদ্দেশ্যমুখী প্রশাসন হিসেবে চিহ্নিত করেন। যেহেতু উন্নয়ন প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল প্রশাসনকে জনমুখী করে তোলা যেহেতু উন্নয়ন প্রশাসন জনকল্যাণার্থে নানা প্রগতিশীল বলতে বোঝান হয়েছে প্রশাসনিক কাজকর্মে জনগণের অংশ গ্রহণকে অধিকতর করা, সক্রিয় জনমত তৈরী করা এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। (৪) পরিকল্পনা (Planning) নির্ধারণ এবং সেইভাবে কার্যরূপায়ণের কাঠামো গড়ে তোলা উন্নয়ন প্রশাসনের একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ। ভারতীয় প্রশাসনবিদ্ পাইপানন্দিকর-এর মতে, উন্নয়ন প্রশাসনের মাধ্যমে সুপরিকল্পিত পরিবর্তন আনা যায়। (৫) প্রশাসনিক কৌশল উদ্ভাবন (Innovativeness) উন্নয়ন প্রশাসনেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রশাসনকে পরিবেশ ও প্রয়োজনের উপযোগী করে তোলাই উন্নয়ন প্রশাসনের লক্ষ্য। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নতুন পদ্ধতি অবলম্বন উন্নয়ন প্রশাসনের পবিত্র চিহ্ন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও উন্নয়ন প্রশাসন সংগঠন-এর পদ্ধতিতে সুপরিবর্তনশীলতা, সংহতি-সংযোজন, সমস্যা মোকাবিলা করার দক্ষতা, মক্কেল-সন্তুষ্টিকরণ ইত্যাদির উপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকে।

৪.৩.২ উন্নয়ন প্রশাসন ও সনাতনী প্রশাসনের পার্থক্য

উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য উন্নয়ন প্রশাসনকে সনাতনী প্রশাসনের সঙ্গে পার্থক্য করা যায়। সনাতনী প্রশাসন সরকারী প্রশাসনের জটিল ও বস্তুমুখী কার্যকলাপের পদ্ধতিকে বোঝায়। উন্নয়ন প্রশাসন কিন্তু প্রশাসনের কর্তৃত্বমুখী ধারা, পুলিশী রাষ্ট্রের সামরিক বা আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মে আগ্রহী নয়। উন্নয়ন প্রশাসন পরিবর্তিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন স্তরে প্রশাসনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই বিশ্বাস করে। সনাতনী প্রশাসন উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলোতে দেখা যায়। সেখানে সরকারের কার্যাবলী প্রশাসনের যাবতীয় বিষয়কে Posdcorb ধারণার মধ্যে ব্যক্ত করা যায়। কিন্তু, উন্নয়ন প্রশাসন কোনও রুটিন মাফিক কাজে গুরুত্ব দেয় না। সামাজিক, আর্থিক দ্রুত পরিবর্তন আনার জন্য এবং লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য উন্নয়ন প্রশাসন সর্বস্তরে সক্রিয় নীতি গ্রহণ করে থাকে।

অন্যদিকে, উন্নয়ন প্রশাসন ও প্রশাসনিক উন্নয়ন এই দু'টি শব্দ আপাতদৃষ্টিতে সমার্থক হ'লেও দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমটি সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে

থাকে ; দ্বিতীয়টি প্রশাসনিক স্তরের সার্বিক উন্নয়নের কথা বলে থাকে। তবে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই দু'টি পদ্ধতির প্রয়োজন আছে। উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে জানা দরকার, উন্নয়ন প্রশাসন উন্নয়নের জন্য কি কি সংস্থার সাহায্য নিয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রশাসন উদ্দেশ্যমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা। এই উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রধানত প্রশাসনিক ব্যবস্থা (আমলা, কারীগরী দক্ষ কর্মী), রাজনৈতিক সংগঠন (রাজনৈতিক দল), স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান এবং জনপ্রতিনিধিমূলক সংস্থা (পঞ্চায়েত) ইত্যাদির উপর নির্ভর করে থাকে। তবে, উন্নয়ন প্রশাসন যতই অন্যান্য প্রশসনের থেকে পৃথক হোক না কেন মূলত এই প্রশাসনকে জন-প্রশাসন থেকে আলাদা করা যায় না।

৪.৪ আধুনিক জন-প্রশাসনের প্রকৃতি

জন-প্রশাসনের তুলনামূলক আলোচনা এবং উন্নয়ন প্রশাসনের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় সনাতনী প্রশাসনের সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক জন-প্রশাসন বা New Public Administration-এর উৎপত্তি। আমরা আগেই জানতে পেরেছি এফ সি মোষার সম্পাদিত "Government Reorganization : Cases and Commentaries (1967)" বইটি থেকে আধুনিক জন-প্রশাসন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জানা যায়। পরবর্তীকালে, বিভিন্ন আলোচনাসভা, অধিবেশনে জন-প্রশাসনের আধুনিকীকরনের বিভিন্ন প্রস্তাব আসতে শুরু করে।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন দেখা যায়। অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব এবং নানা সামাজিক অসন্তোষ প্রশাসনিক ব্যক্তিদের ভাবিয়ে তোলে। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য নানারকমের প্রশাসনিক পরিবর্তনের ভাবনা-চিন্তা চলতে থাকে। এই ভাবনা-চিন্তাগুলি প্রতিফলিত হ'তে থাকে বিভিন্ন অধিবেশনের মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ফিলাডেলফিয়া অধিবেশন। রাষ্ট্রগুলি জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করার জন্য রাষ্ট্রের কার্যাবলী খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি স্থিতিশীল প্রক্রিয়া। প্রায় প্রতিদিন নানা সামাজিক সমস্যা (বেকারত্ব, দারিদ্র্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়, শ্রেণীগত বৈষম্য বৃদ্ধি ইত্যাদি) উদ্ভূত হয়ে প্রশাসনকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এই সমস্যাগুলি সমাধান করে দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশাসনকে প্রায় নতুন করে সাজানোর প্রয়োজন আছে বলে ফিলাডেলফিয়া অধিবেশনে উপস্থিত বিভিন্ন প্রশাসন গবেষক ও পণ্ডিতরা মনে করেছেন। ফিলাডেলফিয়া অধিবেশনের প্রায় একবছর পরে মিন্নাত্তব্রুক অধিবেশন ১৯৬৭-তে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনেও প্রায় একই চিন্তা-ভাবনা করা হয়। মিন্নাত্তব্রুক অধিবেশনে উপস্থিত তরুণ অংশগ্রহণকারীরা বিশেষভাবে জোর দেন সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনিক সংস্কারের উপর। তাঁরা মনে করেন যে, রাষ্ট্র তার নাগরিকদের বঞ্চনা, অভাব ও সামাজিক অক্ষমতার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলকে অবিরত পরিবর্তন করতে থাকবে। যদি প্রয়োজন হয় নাগরিকদের এই প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অংশগ্রহণে লিপ্ত করতে হবে। তবেই প্রশাসনে সক্রিয়াতা ও নমনীয়তা আসতে পারে।

জর্জ ফেওরিকসন মিন্নাত্তব্রুক অধিবেশনে আধুনিক জন-প্রশাসনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা হ'ল আধুনিক জন-প্রশাসনের মৌলিক গৎ। তিনি এই বিষয়ে তাঁর বই New Public

Administration-এ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাই নতুন জন-প্রশাসন চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্থান পেয়েছে সামাজিক পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক প্রতিবেদন (Administrative responsiveness), প্রশাসনিক গতিশীলতা, যুক্তিযুক্ততা, প্রশাসন-শ্রমিক সম্পর্ক, কাঠামোগত পরিবর্তন এবং সর্বশেষে প্রশাসনিক শিক্ষা বিস্তার।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও আধুনিক জন-প্রশাসনের কতকগুলি উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যগুলি আধুনিক জন-প্রশাসনকে যুগোপযোগী করে তুলেছে। উদ্দেশ্যগুলি হ'ল ঃ (১) প্রাসঙ্গিকতা ঃ জন-প্রশাসন সমকালীন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সমাধানের সূত্র খুঁজে থাকে। সুতরাং, প্রশাসনিক কাজকর্মে রাজনৈতিক, সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা থাকলে প্রশাসন প্রভুত পরিমাণে সজীব ও সক্রিয় হয় এবং প্রশাসনে গতিশীলতা আসে। (২) মূল্যবোধ ঃ আধুনিক জন-প্রশাসন স্পষ্টভাবে নৈতিক মূল্যবোধের উপর জোর দিয়ে থাকে। মিন্নাব্রুক অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীরা এই মত পোষণ করেন যে, নতুন জন-প্রশাসন কখনও মূল্য-নিরপেক্ষ (Value Neutral) প্রশাসন হ'তে পারে না। মূল্য-নিরপেক্ষ প্রশাসনে প্রশাসকরা দুর্নীতিপরায়ণ হয় এবং সমাজে অনুন্নত শ্রেণীর সুবিধার্থে কোনও কাজ করতে পারে না। (৩) সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা ঃ সনাতনী জন-প্রশাসন সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা বিরোধী বলে অনেকে আলোচনা করে থাকেন। সেই জন্য আধুনিক জন-প্রশাসনতত্ত্বের প্রবক্তারা সামাজিক ন্যায়পরায়ণতাকে আধুনিক জন-প্রশাসনের ভিত্তি বলে মনে করেন। সামাজিক ন্যায়কে প্রকৃত উদ্দেশ্য না করলে সেই প্রশাসন কখনও সমাজের সার্বিক উন্নতি আনতে পারে না। (৪) পরিবর্তন ঃ সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা যদি আধুনিক জন-প্রশাসনের ভিত্তি হয় তবে পরিবর্তন হবে সেই ন্যায়পরায়ণতা আনার চাবিকাঠি। জন-প্রশাসনকে আরও গণমুখী দুর্নীতিমুক্ত এবং চাপসৃষ্টিকারীসহ অন্যান্য অবাঞ্ছিত শ্রেণীর থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হ'লে পরিবর্তন অতি প্রয়োজনীয়। আধুনিক জন-প্রশাসকরা পরিবর্তনকে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অতি বাস্তব ঘটনা বলে মনে করেন।

সর্বশেষে, আধুনিক জন-প্রশাসন আন্দোলন প্রশাসকের ভূমিকার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রশাসকের দায়বদ্ধতা শ্রেণীগত নয়, বরং জনগণকেন্দ্রীক। প্রশাসন পরিচালিত হবে আমলা-প্রভাবমুক্ত, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে। এই নীতিগুলি জানা হ'লে আধুনিক জন-প্রশাসন বৈজ্ঞানিক মর্যাদা পাবে।

৪.৫ সারাংশ

এই এককে জন-প্রশাসনের নতুন ধ্যান-ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। জন-প্রশাসনে গতিশীল সামাজিক বিজ্ঞানে তা প্রমাণ করা হয়েছে জন-প্রশাসনের আধুনিক তত্ত্বগুলি আলোচনা করে। জন-প্রশাসন এক জায়গায় স্থিতিশীল নয়। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জন-প্রশাসনের যে পরিবর্তন হয়েছে অনুন্নতশীল দেশের জন্য উন্নয়ন প্রশাসন এবং আধুনিক জন-প্রশাসনের বিভিন্ন ধারণা ও প্রভাবও এই এককে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৬ অনুশীলনী

১। আধুনিক জন-প্রশাসনের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

২। আধুনিক জন-প্রশাসনের উদ্দেশ্যগুলি কি কি ?

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

Bhattacharjya Mohit, 1987. Public Administration (2nd Edition). Chapter 1. The World Press Private Ltd. : Calcutta.

Nigro, Felix A and Nigro, Lloyd G, 1980. Modern Public Administration ; Harper and Row. New York.

Waldo, Dwight. Public Administration in International Encyclopaedia of Social Sciences Dimock, Marshall Edward and Dimock, Gladys Ogden 1975.

Public Administration ; Oxford and IBH Publishing Co ; New Delhi.

Sharama, M. P. 1960 Public Administration Theory and Practice, Kitab Mahal, Allahabad.

Arora, Ramesh K. 1985. Comparative Public Administration ; Associated Publishing House, New Delhi.

Riggs Fred. 1964. Administration in Develping Countries ; The Theory of Prismatic Society, Houghton Mifflin, Boston.

Varma, S. P. and Sharma, S. K. 1983. Comparative Administration. HPA, New Delhi.

Marini Frank, 1971 Towards a New Public Administration, the Minnowbrook Prescriptive, Scranton, Pa, Chandler.

একক ৫ ❑ প্রশাসনে সংগঠনের ভূমিকা, স্তরবিন্যাস, আদেশের ঐক্য এবং নিয়ন্ত্রণের পরিধি

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য
৫.১ প্রস্তাবনা
৫.২ প্রশাসনে সংগঠনের ভূমিকা
৫.৩ প্রশাসন আলোচনায় দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী
৫.৪ সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলি
৫.৫ সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস
৫.৫.১ সংগঠনে স্তরবিন্যাসের তাৎপর্য
৫.৫.২ সংগঠনে স্তরবিন্যাসের সুবিধা
৫.৫.৩ সংগঠনে স্তরবিন্যাসের অসুবিধা
৫.৬ আদেশের ঐক্য (Unity of Command)
৫.৬.১ আদেশে ঐক্য ঃ সুবিধা
৫.৬.২ আদেশে ঐক্য ঃ সমস্যা
৫.৭ নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের এলাকা
৫.৭.১ নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি ও অর্থ
৫.৭.২ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
৫.৭.৩ আচরণবাদী দৃষ্টি ও সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ
৫.৭.৪ নিয়ন্ত্রণের এলাকা (Span of Control)
৫.৮ সর্বশেষ অনুশীলনী

৫.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- প্রশাসনে সংগঠনের ভূমিকা
- উচ্চাভিমুখী সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস বা Hierarchy

- সংগঠনে স্তরবিন্যাসের তাৎপর্য
- সংগঠনে স্তরবিন্যাসের সুবিধা
- সংগঠনে স্তরবিন্যাসের অসুবিধা
- আদেশের ঐক্য বা Unity of Cmmand—সমস্যা ও সংশোধন পদ্ধতি
- নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের এলাকা।

৫.১ প্রস্তাবনা

কোনও শাস্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে তার তত্ত্ব ও প্রয়োগের সাজুয্যের ওপর। জনপ্রশাসন শাস্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা বিশেষভাবে প্রায়োগিক হয়ে দেখা দেয়। প্রয়োগিক কারণেই প্রশাসনের প্রধান অংগ হিসেবে দেখা দেয় সংগঠন। প্রশাসনের সাফল্য ও দক্ষতা শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সঠিক সংগঠনের ওপর। দুর্বল সংগঠন কাজের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি ঘটায়, সংহতির অভাব সৃষ্টি করে, শ্লথ পর্যবেক্ষণ ও দক্ষতাহীন প্রত্যর্পণ (delegation) ঘটায়। কিন্তু একটি সুষ্ঠু সংগঠন উল্লিখিত সমস্ত ত্রুটি দূর করে একটি কার্যকরী দক্ষ প্রশাসনিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ সমস্ত কারণে জনপ্রশাসন শাস্ত্রে সংগঠনের সুস্পষ্ট ধারনার প্রয়োজন।

৫.২ প্রশাসনে সংগঠনের ভূমিকা

ব্যক্তি ও গোষ্ঠী যখন কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সপ্রচেষ্ট ও সম্মিলিত হয়ে এগিয়ে যায় তাকেই সংগঠন বলা হয়। এই প্রচেষ্টায় আবশ্যই সংঘর্ষ থাকবে না। যাদের উদ্দেশ্যে কাজ করা হবে এবং যারা কাজ করবে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে।

সংগঠন বলতে দু'টি অর্থ বোঝায় ঃ এক, প্রশাসনিক কাঠামোর রূপাদন করা ; দুই, কাঠামোর সৃষ্টি ও রূপায়ন ও সর্বশেষে একটি প্রশাসনিক আদল সৃষ্টি করা। অধ্যাপক আরউইক (Urwick) একটি মেটির গাড়ির কাঠামোর সঙ্গে সংঠনের তুলনা করেছেন। অন্যান্য চিন্তাবিদ্‌রা ব্যাপক অর্থে কিন্তু সংগঠন সম্পর্কে আরউইক-এর এই তুলনা ও অর্থ গ্রহণ করতে নারাজ। আরউইক-এর এই ব্যাখ্যায় সংগঠনের মানবিক দিকটি অনুপস্থিত। অর্থাৎ সংগঠনে মানবিক উপাদানের গুরুত্ব এখানে সমালোচিত।

হার্বার্ট সাইমন (Simon) সংগঠন বলতে বোঝান "কোন মানবিক গোষ্ঠীর জটিল যোগাযোগের ধরন ও অন্যান্য সম্পর্কের কথা।" ("a complex pattern of communications and other relations in a group of human beings.") জে. ডি. মুনি আরেকটু সহজ করে বলেছেন, "কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন মানবিক

সংঘের আকারকেই সংগঠন বলে।" ("Organisation is the form of every human association for the attainment of a common purpose.")

৫.৩ প্রশাসন আলোচনায় দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী

সংগঠনের আলোচনায় দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাবে দেখা যায় ঃ এক, যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দুই, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী। অধ্যাপক আরউইকই প্রথম যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত করেন। মোটর গাড়ির সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে তিনি সংগঠন তৈরীর ধাঁচের কথা বলেন। যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে দুটি পূর্ব-ধারণা ধরে নেওয়া হয় ঃ এক, সংগঠনের মূল নীতি ও আকার পূর্বেই সকলের কাছে এমন স্পষ্ট যার সাহায্যে যে কেউ কোন উদ্দেশ্য ও কার্যসাধন সহজেই করতে পারে। দুই, সংগঠনপরিকল্পনা, ব্যক্তি বিশেষের নিয়োগের আগেই জানা থাকবে। যাই হোক, নানা কারণে এই যান্ত্রিক পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করা হয়ে থাকে। ১. এই পদ্ধতি সংগঠনে মানবিক উপাদানকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। ২. সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বিশেষের নৈতিক ও মানসিক ধরনকে অস্বীকার করে সুষ্ঠু কোন কাজ হয় না। ৩. সংগঠনের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে হলে কর্মিদের ব্যবহারিক ধাঁচ এবং প্রতিক্রিয়া অবশ্যই জানতে হবে।

সংগঠনে মানবিক উপাদানের উপর জোর দিয়ে হেনরী ফেয়ল (Henry Fayol) সর্বপ্রথম বলেন, "আমরা যদি মানবিক উপাদানকে বাদ দিই তাহলে খুব সহজেই সংগঠন তৈরী করা যায়। যে কেউ একাজ করতে পারে যদি তার প্রচলিত আচরণ ও প্রয়োজনীয় মূলধন সম্পর্কে ধারণা থাকে।" ("If we could eliminate these human factors. it would be easy enough to build up an organization ; any one could do it if they had some ideas of current practice and the necessary capital.") ফেয়ল স্পষ্ট করে বলেন, "শুধুমাত্র ব্যক্তিদের কতগুলি গোষ্ঠীতে ভাগ করে ও কাজ দিয়েই আমরা কার্যকরী প্রশাসনিক সংগঠন গড়ে তুলতে পারি না। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, বিভিন্ন কাজের ব্যাপারে সংগঠনকে কেমন করে লাগাতে হবে। কি করে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্টভাবে কাজে লাগাতে হবে তা দেখতে হয়।" ("But we cannot build up an effective organization simply by dividing men into groups and giving them functions ; we must know how to adopt the organization to the requirement of the case and how to find the necessary men and put each one in the place where he can be of most service.") অধ্যাপক ডিমক (Dimock) এই প্রসঙ্গে বলেন, "সংগঠন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরস্পর নির্ভরশীল অংশগুলিকে সংহত করে। সংগঠন কর্তৃত্ব, সংহতি এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়।" ("Organization is the systematic bringing together of interdependent parts to form a unified whole through which authority, co-ordination and control may be exercised to achieve a given purpose.") অবশ্য ডিমক এ কথাও বলেছেন যে, পরস্পর নির্ভরশীল ব্যক্তিবিশেষকে নিয়েই সংগঠন গঠিত হয়। আর সংস্থার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এই ব্যক্তিদের কার্যকলাপ পরিচালিত ও প্রভাবিত করে সংহত করা সংগঠনের কাজ।

মানবিক দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় সংগঠন পরস্পর সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি গোষ্ঠীর সাথে জড়িত। এই সমস্ত ব্যক্তির

পারস্পরিক প্রচেষ্টাই সাধারণের উদ্দেশ্যকেই রূপদান করে। কোন সংগঠক ফরমায়েসিভাবে মানবিক উপাদান জোগার করতে পারে না বা কাজের উপযোগী করে মানুষের সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতেও পারে না। কাজের ক্ষেত্রে মানবিক সমস্যা তাই একটি সীমিত উপাদান (limiting factor) হিসেবে দেখা যায়। হেনরী ফেয়ল তাই প্রশাসনে মানবিক উপাদানের অবহেলার ক্ষেত্রে বিশেষ আপত্তি করে থাকে। অন্যদিকে অধ্যাপক আরউইক প্রশাসনে যান্ত্রিক পদ্ধতির সমর্থন করেন। তবে এমনও বলা বোধ হয় ঠিক নয় যে, তিনি মানবিক সমস্যার এই সীমিত ক্ষমতা বিশেষ জোর দিয়ে দেখতে চাননি। ব্যক্তিকে স্বীকার করেও আরউইক বলেন যে, প্রশাসনে সংগঠক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি সুস্পষ্ট আদর্শ পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবেন।

৫.৪ সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলি

সংগঠনের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—১. ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমবায় হ'ল সংগঠন আর উভয়ের প্রচেষ্টা ও সামর্থ্যে সংগঠন গড়ে ওঠে। ২. প্রশাসনিক সংগঠনে কর্মবিভাজন, দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবেই, আর সুপরিকল্পিতভাবে দায়িত্ব ও কর্মবিভাজনের নীতি কার্যকরী করতে হবে। ৩. প্রশাসনিক সংগঠনে নির্দিষ্ট কর্মধারা প্রচলিত থাকে, আর এই কর্মধারা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিচালকবৃন্দ (Line Service) এবং এদের সাহায্য ও পরামর্শ দান করার জন্য থাকে একদল কর্মিগোষ্ঠী (Staff servicc)। ৪. সংগঠনে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিভিন্ন সম্পর্ক দেখা যায়। পারস্পরিক সহযোগিতা, সংঘাত ও প্রতিযোগিতার মধ্যেই এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়। ৫. কয়েকটি সাধারণ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করেই সংগঠন গড়ে ওঠে। উদ্দেশ্যগুলি বিচার করেই সংগঠনের চরিত্র নির্ধারণ করা হয়। সংগঠন স্থানু না গতিশীল, রীতি-সর্বস্ব না রীতি-বর্হির্ভূত, মানবিক না যান্ত্রিক উদ্দেশ্যের নিরিখেই তার বিচার করা হয়। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করেই প্রশাসনিক সংগঠন সম্পর্কে সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা হয়।

অনুশীলনী ঃ

১। জনপ্রশাসন শাস্ত্রে সংগঠন বলতে কি বোঝান হয়?

২। সংগঠন কি ভাবে দক্ষ পরিবেশ গড়ে তোলে?

৩। প্রশাসনে সংগঠনের ভূমিকা কি?

৪। সংগঠন বলতে যে দুইটি অর্থের কথা বলা হয়েছে সেগুলি কি?

৫। সংগঠনের আলোচনায় যান্ত্রিক এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করুন।

৬। সংগঠনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৫.৫ সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস

প্রশাসনে সংগঠনের স্তরবিন্যাসের কতগুলি বিশেষ ধরণ দেখতে পাওয়া যায়, এদের মধ্যে বিশেষ ধরণ দু'টি ঃ ১. উচ্চাভিমুখী (Hierarchy) ও ২. অনুভূমিক (Horizontal) স্তরবিন্যাস। সংগঠনের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্পর্কের নানা ধরনের পরিমাপ করতে গিয়ে এই ধরনের স্তরবিন্যাস সৃষ্টি হয়। সাংগঠনিক কাঠামোর এই স্তরবিন্যাসের পদ্ধতিকে "মাপনী-পদ্ধতি" (Scalar Process)—ও বলা হয়। অধ্যাপক মুনি (Mooney) সাংগঠনিক গঠনের এই নীতির মধ্যে বিশেষ জোর দেন উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাসের নীতিকে এবং সংগঠনের এই নীতিকে উনি সার্ব্বজনীন বলে মনে করেন। 'উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাস' বলতে নিম্নপদাধিকারীর উপর উচ্চপদাধিকারী শাসন বা নিয়ন্ত্রণ বোঝায়। প্রশাসনিক পরিভাষায় এর অর্থে বিভিন্ন স্তরবিন্যস্ত সংগঠন বোঝায় যাতে একটি স্তর তার ওপরের স্তরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে হ'তে একেবারে শীর্ষ-স্তরের নির্দেশের দ্বারা সমাযোজিত (communicated) হয়। উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় উচ্চতর ও নিম্নস্তরের সম্পর্কের বিস্তারের মধ্যে দিয়ে নিম্নপদাধিকারীর ওপর ওপরের কর্তাব্যক্তি দায়িত্ব আরোপ করে থাকে। এই ধরনের দায়িত্ব আরোপের মাধ্যমে উচ্চতম শ্রেণীর কর্তাব্যক্তিদের থেকে নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে একধরণের কার্য-কারণ সম্পর্ক ও দায়িত্বের বিন্যাস ঘটতে থাকে যা সংগঠনের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই কর্মবিন্যাসে নিম্নতম শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ কর্তাদের মাঝে মধ্যবর্তী কোন শ্রেণীর ভূমিকাই অগ্রাহ্য নয়। এই অর্থেই সংগঠনের কর্মক্ষেত্রে "নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে" ("through the proper channel") কথাটি ব্যবহৃত হয়।

উচ্চাভিমুখী কাঠামোর সংগঠনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক ডিমক ও ডিমক বলেছেন, "উচ্চাভিমুখী কাঠামো উল্লম্বী বিস্তার, বিশেষীকরণ ও আকারের ওপর নির্ভর করে। দুটি বিষয়ই এই কাঠামোর সার্ব্বজনীন পরিবর্ত।" ("Hierarchy applies to vertical dimensions and develops from specialization and size, both of which are universal variable.") । প্রশাসনিক স্তরবিন্যাসের এই ধারা সম্পর্কে অধ্যাপক সি. পি. ভামব্রি বলেছেন, "উচ্চাভিমুখী বিন্যাস উচ্চতম কর্তৃত্ব থেকে অধস্তন কর্মীদের সম্পর্কের উচ্চনীচের একটি অন্তর্বন্ধনী।" ("Hierarchy is a system of interlocking Superior-Sub-ordinate relationship from top to bottom".)। আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব ও আনুগত্য প্রভৃতির সংযোগে উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাস গড়ে ওঠে। প্রশাসনের জন্য অর্থ ও ক্ষমতাকে সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য সংগঠনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর থেকে নিচে বিভিন্ন স্তরে বিবেচনা করে কাজ দেওয়া হয়। এইভাবে সমস্ত স্তরের কাজকর্ম যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তর জন্য তদারকি ব্যবস্থা থাকে। পরিচালনায় নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত এই সামগ্রিক বিভাজনকে উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাস বলা হয়। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ও নিম্নতম কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের লেনদেনে ও বোঝাপড়ায় সংগঠনের এই স্তরবিন্যাস মজবুত হয়ে ওঠে, আর এভাবেই পরিচালন ব্যবস্থার একত্রীকরণের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক জেমস্ মুনির মতে 'মাপনী পদ্ধতি' সাংগঠনিক কাঠামোয় উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাসের সম্যক ব্যাখ্যা করে। উচ্চাভিমুখী কাঠামোর সংজ্ঞাতে যতই এদিক-ওদিক করা যাক না কেন উপর থেকে নীচে দায়িত্ব ও

নিয়ন্ত্রণের একটি স্পষ্ট পরিমাপ এই কাঠামোয় দেখা যায়, আর এ জন্যই এক্ষেত্রে 'মাপনী পদ্ধতি'র ব্যবহারের কথা জেমস্ মুনি বিশেষ করে বলেছেন। প্রতিটি স্তর ও ওপর থেকে নীচের সমস্ত স্তরের দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিয়ন্ত্রণের চলাচল এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যখন কোন দু'জন ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা সংগঠনকে দেখতে পাই যাদের মধ্যে একজন উচ্চপদাধিকারী ও অপরজন তার অধীনস্থ তখনও আমরা এই 'মাপনী পদ্ধতির' উপস্থিতি দেখতে পাই।

এইভাবে সাংগঠনিক কাঠামোয় উচ্চতম পরিচালক থেকে কর্তৃত্ব নিচের দিকে নামতে থাকে, অবশ্যই স্তরে স্তরে সাংগঠনিক বিন্যাসে পরিমাপের এই পদ্ধতির সারকথা 'আদেশের ঐক্য' (Unity of Command)। কাঠামোর এই বিন্যাসে এক উচ্চতম স্তর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সংহত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে প্রশাসনিক সংগঠনের কাঠামো পিরামিডের মত। একটি লেখচিত্রের সাহায্যে এই ধারনা নিচে ব্যাখ্যা করা হল ঃ

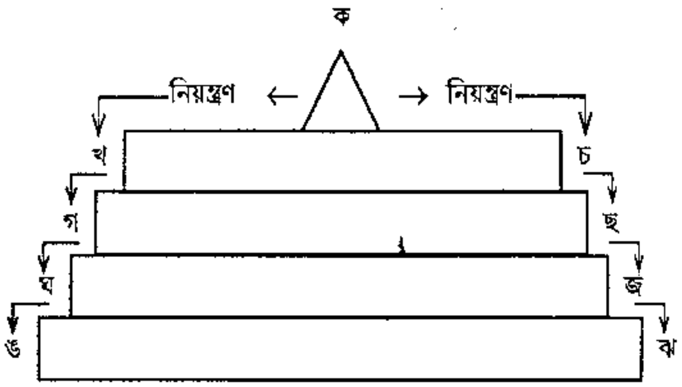

উপরের লেখচিত্র থেকে দেখা যায় যে **খ ক**-এর অধীন, **গ খ**-এর অধীন, **ঘ গ**-এর অধীন, **ঙ ঘ**-এর অধীন এবং এমনভাবেই কাঠামোর আরও নিম্নস্তর পর্যন্ত বিন্যস্ত হবে। এখানে দেখা যায় যে **ক** যদি কোন আদেশ করে তা অবশ্যই **খ**-এর মাধ্যমে প্রসারিত হবে এবং **গ** যদি কোন কিছু ক-কে জানাতে চায় তা অবশ্যই **খ**-এর মাধ্যমে যাবে। **ঙ** কখনই সরাসরি ক-এর কাছে যেতে পারে না, তাকে অবশ্যই **ঘ, গ খ**-এর মাধ্যমে যেতে হবে। এইভাবে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের আদেশ নিয়ন্ত্রণ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হতে হতে নিম্নতম পর্যায় পৌঁছায় যেখানে কর্তব্য পালন ছাড়া আদেশ ও নিয়ন্ত্রণের কোন কাজ থাকে না। উচ্চাভিমুখী কাঠামোর স্তরবিন্যাসে এইভাবে বিভিন্ন স্তরের সমাযোজন ঘটে থাকে।

উচ্চাভিমুখী স্তর বিন্যাস পুলিশ বা সামরিক প্রশাসনের সংগঠনে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সরকারী প্রশাসনেও আমলাতন্ত্র বা সচিবালয়ে উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাসের প্রয়োগ দেখা যায়। পুলিশ সংগঠনের নিদর্শন থেকেই ঐ সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ

রাজ্যস্তরে	ঃ	ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (I.G.P.)
	ঃ	ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (Dy. I.G.P.)

জেলাস্তরে	ঃ	জেলা সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ (D.S.P.)
	ঃ	ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ (Dy. S.P.)
বিভাগ স্তরে	ঃ	সহকারী সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ (A.S.P.)
থানা স্তরে	ঃ	পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর

(অফিসার ইন চার্য)

↓

অর্ধস্তন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর

↓

কনস্টেবল

সরকারি প্রশাসনিক সচিবালয়েও উল্লিখিতভাবে শ্রেণীবিভাজন করা হয় ; যেমন, সবার উপরে সচিব (Secretary) তারপর থাকে উপ-সচিব (Deputy Secretary). পরে সহকারী সচিব (Assistant Secretary), তারপরে অধস্তন সচিব (Under-Secretary)। আদেশ ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতেই এমনিভাবে সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস করা হয়।

অনুশীলনী ঃ

১। সংগঠনে স্তরবিন্যাসের ধরন কি ?

২। মাপনী পদ্ধতি (Scalar Process) বলতে কি বোঝায় ?

৩। সংগঠনে স্তরবিন্যাসের গুরুত্ব কতটা ?

৪। আদেশের ঐক্য বা Unity of Command বলতে কি বোঝায় ? চিত্রের মাধ্যমে দেখান।

৫.৫.১ সংগঠনে স্তরবিন্যাসের তাৎপর্য

জন-প্রশাসনের ক্ল্যাসিকাল বা সাবেকি তত্ত্বের সময় থেকে সংগঠনে স্তরবিন্যাসের আলোচনার সূত্রপাত। ফ্রেডেরিক টেলর প্রশাসনে শৃঙ্খলার কথা স্মরণ করেই সংগঠনে স্তরবিন্যাসের উল্লেখ করেছেন। এই ব্যবস্থায় কর্তব্য ও আদেশ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার মাধ্যমে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সুষ্ঠু কর্ম পরিচালনার কথা স্মরণ করেই টেলর উচ্চাভিমুখী বিন্যাসের সূত্রপাত করেছেন। হেনরী ফয়েল, লুথার গালিক প্রভৃতি ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ববিদ্‌রাও জনপ্রশাসনে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের মাঝে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) জনপ্রশাসনে আমলাতন্ত্রের ভূমিকার আলোচনা করতে গিয়েও স্তরবিন্যাসে কর্তৃত্ব, দায়িত্বশীলতা ও পর্যবেক্ষণ প্রভৃতিকে প্রশাসনে শৃঙ্খলার প্রধান উপাদান বলে মনে করেছেন। এমনিভাবে বিভিন্ন তত্ত্ববিদদের আলোচনা থেকে স্তরবিন্যাসের কয়েকটি তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যেমন ঃ ১. এই ব্যবস্থায়

প্রশাসনের প্রতিটি ব্যবস্থায় আদেশ ও দায়িত্বের সুষম বণ্টন দেখা যায়, একমাত্র সবচেয়ে নিচের স্তরে আদেশের উপস্থিতি নেই। এমনি করে প্রতিটি উপরের স্তর থেকে ঠিক নিচের স্তরে আদেশের প্রেরণ ও সেই হিসেবে কর্মপ্রক্রিয়াকেই 'নির্দেশের ধারা' (Chain of Command) বলা হয়। ২. স্তরবিন্যস্ত প্রশাসনে সংগঠনের একের সঙ্গে অপর কর্মীর সম্পর্কের কাঠামো গড়ে ওঠে। নিচের স্তরের কর্মীরা ওপরের স্তরের কর্মীদের কাছ থেকে কিভাবে ও কতটা আদেশ গ্রহণ করবেন তা ঠিক করে নিজেদের কাজের রূপরেখা তৈরী করেন। ৩. সাংগঠনিক এই কাঠামো কর্মীদের মাঝে সংহতির সূত্রপাত করে। উপর থেকে নিচের প্রতিটি স্তরের আদেশ ও নির্দেশের যাতায়াত প্রতিটি কর্মিগোষ্ঠীকে পরস্পরের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংগঠনের ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের সংহত করে। এইভাবে সংগঠন একীভূত সুষ্ঠুভাবে উদ্দেশ্যের দিকে কাজ করে এগোতে থাকে কাজের ক্ষেত্র নিয়ে এখানে কোন বিরোধের অবকাশ প্রায় থাকে না। ৪. স্তরবিন্যস্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থা ক্ষমতা প্রর্ত্যাপণের (delegation of authority) ধারাকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সর্বস্তরের কর্মীরা সংহত হলে প্রশাসনের কোন কোন এলাকায় (Space-এ) কোন কোন সময়ে (time) কর্তৃত্বের প্রত্যর্পণ প্রয়োজন তা নির্দ্দিষ্ট করতে পারে। প্রত্যর্পণের এলাকা বিস্তৃত হতে থাকলে বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation)-এর নীতি কার্যকরী হয় আর এর সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপ কমতে থাকে ও কাজ সহজ হতে থাকে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও স্তরবিন্যস্ত সংগঠনের সমস্ত কাজে বিশেষ কতকগুলি সুবিধা পাওয়া যায়। প্রতিটি দপ্তর তার প্রয়োজনীয় অর্থ, সাজসরঞ্জামকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে। উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত শাসকপ্রধান সংগঠনের কাজের নির্দিষ্ট ধারা ও মান বজায় রাখতে পারে। প্রশাসনের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজের যেমন—পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মচারিদের দায়িত্ব বণ্টন, পরিচালনা, সংহতি, রিপোর্ট ও বাজেটের মাধ্যমে আয়-ব্যয়ের হিসেব (POSDCORB) স্তরবিন্যস্ত প্রশাসনিক সংগঠনের কাজে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়। স্তরবিন্যস্ত প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেও এই ধাঁচের কাজের কতকগুলি সুবিধা ও অসুবিধার আলোচনা অবশ্যই করনীয়।

অনুশীলনী :

১। টেলর, ফেয়ল, ওয়েবার প্রমুখ তাত্ত্বিকগণের আলোচনা থেকে স্তরবিন্যাসের কয়েকটি উল্লেখ করুন।

২। ক্ষমতার প্রত্যর্পণ বলতে কি বোঝায় ; সাংগঠনিক ব্যবস্থা ক্ষমতা প্রত্যর্পণের গুরুত্ব কি ?

৫.৫.২ সংগঠনে স্তরবিন্যাসের সুবিধা

অধ্যাপক মুনির মতে প্রশাসনে মাপনী পদ্ধতিতে গঠিত স্তরবিন্যস্ত সংগঠন একটি সর্বজনীন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ সুযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

১। স্তরবিন্যস্ত সংগঠনে বিভিন্ন অংশগুলি ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত হয়ে কাজ করাই সংগঠনের সাধারণ উদ্দেশ্য। এই ধরনের সংহতি ও ঐক্যছাড়া কোন সংগঠনই ফলপ্রসূভাবে কাজ করতে পারে না। মুনি তাই বলেন মাপনী পদ্ধতিই সাংগঠনিক সংহতির উপাদান।

২। স্তরে স্তরে এই পদ্ধতি ঊর্ধ্বতম ও নিম্নতমের সমাযোজন (Communication)-এ সাহায্য করে। সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকেই জানে যে কার সঙ্গে সে যোগাযোগ সাধন করবে এবং কার মাধ্যমে তার সংযোগ উচ্চতম পদাধিকারীর কাছে পৌঁছাবে।

৩। উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাস ক্ষমতা প্রত্যপর্ণের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে সিদ্ধান্ত নেবার বিভিন্ন কেন্দ্র আছে। এ কারণে কোন কেন্দ্রেই কাজের জটিলতা বা ভিড় দেখতে পাওয়া যায় না। পরিচালক প্রধান এভাবেই নিজের সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে মুক্ত থাকেন।

৪। স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় সংগঠনের প্রত্যেকের তুলনামূলক অবস্থান ও দায়িত্ব স্পষ্ট করে দেয়।

৫। যখন সংগঠন অনেক বড় হয় এবং এর কর্মক্ষেত্র অনেক দূর পরিব্যাপ্ত থাকে তখন দূরবর্তী অংশগুলির সাথে কেন্দ্রের যোগাযোগ সাধন হয় স্তরবিন্যাসের উচ্চ-নীচ স্তরের মধ্যে অদেশ ও নিয়ন্ত্রণ দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে।

জনপ্রশাসনের তত্ত্ববিদ ডঃ হোয়াইট (White) উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাসের সুবিধাগুলি সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "এই পদ্ধতি অদেশের একটি প্রবাহ। এই ব্যবস্থা উচ্চতম ও নিম্নতম পদাধিকারীদের মাঝে সমাযোজনের প্রধান মাধ্যম যার সাহায্যে সংবাদ, উপদেশ, নির্দিষ্ট নির্দেশ, সাবধানবাণী এবং সংযোগ সাধন সহজ হয়। এই ব্যবস্থা ক্ষমতা প্রত্যর্পণের মাধ্যম।" ("It is the channel of command. It is the principal channel of communication downword and upward along which flow information, advice, specific instrution, warnings and communication. It is the channel for the delegation of authority.")

৫.৫.৩ সংগঠনে স্তরবিন্যাসের অসুবিধা

প্রশাসনে নিয়মানুবর্তিতা ও সুষ্ঠু পরিবেশে স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থার সুবিধাগুলি আমাদের কাছে বিশেষভাবে স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু অনেক সময়ই এর ব্যতিক্রম দেখা দেয়, আর এর ফলে স্তরবিন্যস্ত প্রশাসনিক সংগঠনে অনেক অসুবিধা আমাদের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে, যেমন ঃ

১। এই স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এটি প্রায়ই কর্মসম্পাদনে অনাবশ্যক দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি করে। যেহেতু প্রতিটি কাজই 'নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে ("Through proper channel") এবং উচ্চাভিমুখী স্তর-বিন্যাসের প্রতিটি স্তরের মাধ্যমেই কাজটি করতে হবে তাই অপরিহার্য দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। কোন স্তরের কর্মীরাই কোন একটি স্তর বা একাধিক স্তরের কর্মীকে অতিক্রম করে উচ্চতম পরিচালকের কাছে পৌঁছাতে পারে না। সংগঠনের এই ব্যবস্থায় দ্রুত ও গতিশীল কাজ ব্যাহত হয়। এই পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম ও কাগজে লেখালেখিই বেশি বেড়ে যায়।

২। সংগঠনের স্তরবিন্যাসে ঊর্দ্ধতন ও অধস্তনের সম্পর্কের ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেসরকারি কর্ম-সংস্থায় বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মাঝে আদেশ ও দায়িত্বের যে স্পষ্ট রীতি প্রচলিত থাকে, সরকারী

প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের মাঝে এ ধরনের স্পষ্ট সীমারেখা সব সময় টানা যায় না। গণতান্ত্রিক চেতনায় পরিপুষ্ট আধুনিক রাষ্ট্রের চৌহদ্দিতে যে সমস্ত সংগঠন বর্তমান তাদের সর্বোচ্চ পরিচালকের আদেশ বা নির্দেশ সংগঠনের নিম্নস্তরের কর্মীরা বিনা প্রতিবাদে সমস্ত নির্দেশ অনুসরণ করবে কিনা এবিষয়ে দ্বিধা থেকেই যায়। সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি বা পরিচালকদের দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্দেশের প্রতিবাদে অসন্তোষ দেখা দেবে না বা প্রশাসনিক কাজকর্মে বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক বাধা বা সংকট সৃষ্টি হবে না ; এব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

৩। প্রশাসনিক কর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে বা সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার প্রশ্নে প্রায়ই প্রশাসন ও রাজনীতিতে বিরোধ দেখা যায়। সাংগঠনিক কাজকর্মে রাজনীতির হস্তক্ষেপ নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করে ও প্রশাসনে লাল-ফিতার নীতি (Red-tapism) অনুপ্রবেশ করে। আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ও কাগুজে নিয়মকানুনের ওপরে জোর দিয়ে এক ধরনের যান্ত্রিকতার সৃষ্টি করে। ফলে সাংগঠনিক কাজকর্মে কার্যকারিতায় সন্দেহ দেখা যায়।

জন-প্রশাসনে সাংগঠনিক ত্রুটি সম্পর্কে ডিমক ও ডিমক বলেছেন, 'যখন উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাস অনেকদূর পরিব্যাপ্ত হয়, যোগাযোগের ধারা এতদূর বিস্তৃত হয় যে কর্মপ্রবাহ সেখানে হারিয়ে যায়। মানবিক সম্পর্ক অবহেলিত হয়। অভিপ্রায় ও নীতি ব্যাহত হয়। স্বাভাবিক কারণেই কর্মদক্ষতার ঐশ্বর্য ও সমন্বয় অর্জন করা খুব দুরূহ হয়ে ওঠে। ক্ষমতা ও আমলাতান্ত্রিকতা এমন সমস্যা সৃষ্টি করে যা সর্বোচ্চ পরিচালকদের চূড়ান্ত জটিলতার সম্মুখীন করে' (When hierarchy becomes overextended, the lines of communication stretch to the point where the current is lost, human relations are neglected, motivation and morale suffer, pride of craftsmanship and co-operation are harder to secure naturally, and power and bureaucracy create problems that test top manager to the limit.")

স্তরবিন্যাসের সুবিধা ও ত্রুটি বিচ্যুতি আলোচনা করে আধুনিক প্রশাসনবিদ্‌রা মনে করেন শুধুমাত্র একই আনুষ্ঠানিক ধারার ওপরে সংগঠন সবসময় কার্যকরী হতে পারে না। যান্ত্রিকতার উদ্ভব এখানে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। পরিচালক ও কর্মচারী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। সামাজিক ও মানবিক চিন্তাবিদ্‌রা তাই মনে করেন পরিচালক ও কর্মীরা শুধু কৃত্রিম সম্পর্কেই বদ্ধ থাকবেন না। কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করে সহজ সম্পর্কে তারা আবদ্ধ থাকবেন। আর এরই ভিত্তিতে প্রশাসনিক সংগঠনের কাজকর্মের সার্থকতা সম্ভবপর হয়ে উঠবে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা স্মরণ করে পিটার সেলফ (Peter Self) বলেছেন, "এই নয়া পদ্ধতিতে প্রধান প্রশাসক তার সংগঠনের সাধারণ অবস্থা ও দক্ষতা বিচার করে নিজেকে ক্রমশ একজন 'নতুন পরিকল্পনাকারী'তে পরিবর্তন করবেন। সংগঠনকে পরিবেশের সঙ্গে সমন্বিত করবেন।" (Corresponding to this new approach, chief executive is increasingly seen as a 'chief planner, concerned primaryily with the general health and effectiveness of his organisation and particularly with its adaptation to environmental pressure.")। পরিচালক প্রধান সব সময়েই অন্যান্য গোষ্ঠী বা সংস্থার সঙ্গে তার সংগঠনের সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। এইভাবেই আজকের সংগঠন সমবায়িক ধরনের প্রশাসনের মধ্য দিয়ে সার্থকতায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

অনুশীলনী :

১। সংগঠন ও স্তরবিন্যাসের সম্পর্ক কি?

২। সংগঠনে স্তরবিন্যাসের উদ্দেশ্য কি?

৩। স্তরবিন্যাসের সুবিধাগুলি কি?

৪। স্তরবিন্যাসে কি ধরনের ত্রুটি দেখা দিতে পারে।

৫। স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে পিটার সেলফ্-এর বক্তব্য কি?

৫.৬ আদেশের ঐক্য (Unity of Command)

আদেশের ঐক্য বলতে বোঝায় একমাত্র আদেশ (mono-command)। আদেশের বা নির্দেশের উৎস ঠিক কোথায়—এই প্রশ্নের সঠিক জবাবের মধ্যে জনপ্রশাসনের এই বিশেষ ধারণাটির স্থিতি। কোন একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র (ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কার্যকরী সংস্থা যাই হোক না কেন) থেকে যদি নির্দেশ নিম্নস্তরগুলির মধ্যে প্রবাহিত হয় তবে তাকে আদেশ বা নির্দেশের ঐক্য বলা যেতে পারে। নির্দেশ বা আদেশের কেন্দ্র বিভিন্ন স্তরেও থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ এই ধারণাটি স্পষ্ট করলে বোঝায় একজন কর্মী সংগঠনে যখন তার ঠিক উপরের কর্তাব্যক্তির যে নির্দেশ পায় সেই সব। যদি একই ব্যক্তি এক সঙ্গে উপরস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির নির্দেশে একইসঙ্গে কাজ করতে যায় তাহলে তার কর্মপদ্ধতির মাঝে সংকট উপস্থিত হয়, কাজের উৎকর্ষ ব্যাহত হয়। স্তরবিন্যাস্ত প্রশাসনে, বিশেষ করে উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাসের সংগঠনে সুষম কর্মব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নীতি অর্থাৎ 'আদেশের ঐক্যে'র নীতিকে জনপ্রশাসন তত্ত্বের ধ্রুপদী বা সাবেকী তত্ত্ববিদগণ গ্রহণ করেছেন। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক-এফ ডিমক, ডিমক ও কোয়িং (Kocing) উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্র সম্পর্কে বলেছেন "আদেশের ঐক্য বলতে বোঝায় যখন কোন প্রশাসনিক পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ একসাথে ও সমভাবে অগ্রসর হতে যায় তখন এই ঐক্যকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য সবচেয়ে ওপরে একজনমাত্র নির্দেশক থাকবে যাতে ঐ ঐক্য কার্যকরী হয়।" ("Unity of command stresses the fact that if all component parts of an administrative program are to move forward in a unified and synchronized fashion, there must be a single directing official at the top to see that this integration takes place.")

জনপ্রশাসন তত্ত্বের গোড়ার দিকের লেখকগণ সকলেই আদেশের ঐক্য বা প্রধানের প্রতি একক আনুগত্যের কথা বলে এসেছেন। হেনরি ফেয়ল বলেছেন, "একজন কর্মী তার ওপরের একজনের কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ করবেন।" ("An employee should receive orders from one superior only.")। ফেয়লের মতে আদেশের ঐকান্তরী বিন্যস্ত প্রশাসনের একত্রীকরণের বিশেষ উপাদান। প্রশাসনিক সংগঠনের এই ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে পিফনার ও প্রেস্থস (Piffner and Presthus) বলেছেন, "আদেশের ঐক্যের ধারণা বলতে বোঝায় যে সংগঠনের একজন সদস্য শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির কাছেই বা 'একজন নেতার কাছেই সব কথা জানাবে'।" ("The concept

of unity of command requires that every member of an organization should report to one, and only one learder.")। ফেয়ল স্পষ্ট করেই বলেছেন সরকারী বা যে কোন সাংগঠনিক দুর্বলতার কারন দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার অভাব। ঐক্যবদ্ধ সংগঠনই দক্ষ প্রশাসনের মূল ভিত্তি আর এই কারণেই তিনি আদেশের ঐক্যের কথা বলেন। ফেয়ল তার সময়ে ফরাসীদেশের সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন নীতির মধ্যে আদেশের ঐক্যের নীতির কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ অবশ্যই বলা যায় যে আদেশের ঐক্য খুব স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হয় সমারিক বাহিনীতে যেখানে দ্বিতীয় লেফ্‌টানেন্ট, লেফ্‌টানেন্টের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় লেফ্‌টানেন্ট ক্যাপটেনের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করে এবং এইভাবেই আদেশের ধারা বয়ে চলে। আদেশের ঐক্যের ক্ষেত্রে এই সুবিধা যে স্তরবিন্যাসের কোন স্তরেই নির্দেশে কোন অস্পষ্টতা থাকে না। সামরিক বাহিনীতে আদেশের ঐক্যের আলোচনার সাথে ফেয়ল দুটি প্রচলিত ধারনার উত্থাপন করেছেন, যেমন—কর্তৃত্ব ও আনুগত্য। নিম্নের লেখচিত্রে ফেয়লের ধারনার উত্থাপন করা যায় ঃ

আদেশের ঐক্য

আদেশের প্রদানকারী (কর্তৃপক্ষ) ↓ আদেশ →

আদেশ পালনকারী (কর্মচারী) ↓ ←আনুগত্য

আদেশ দেবার অধিকার ও আনুগত্য আদায়ের ক্ষমতাকে ফেয়ল ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বলে মনে করেন। সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তির নির্দেশকে অধস্তন কর্মচারীদের নিঃশর্ত পালনই আদেশের ঐক্যের নিদর্শন। আদেশের ঐক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লুথার গালিক (Luther Gulick) বলেছেন, "আদেশের ঐক্য বলতে বোঝায় যারা আদেশ প্রাপ্ত তাদেরই, যারা আদেশ দিয়ে থাকে তারা নয়।" ("Unity of Command thus refers to those who are Commanded, not to those who issue the commands.")

৫.৬.১ আদেশে ঐক্য ঃ সুবিধা

প্রশাসনে আদেশের ঐক্যের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেখতে পাওয়া যায়। ১। স্তরবিন্যস্ত সংগঠনে আদেশের ঐক্য দায়িত্বের সুষম বন্টন করে থাকে। এক্ষেত্রে উচ্চতর কর্তৃত্ব ও অধস্তন কর্মীদের মধ্যে সুস্পষ্ট বোঝাপড়া ও দায়িত্ব কর্তব্যের লেনদেন থাকে। ২। প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযুক্ত হলে সংঘর্ষ এড়ানো যায় এবং বিভিন্ন স্তরে কাজের সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ও বিরোধ দূরীভূত হয়। ৩। একক কর্তত্বের অধীনস্থ হলে কর্মীদের ওপর পর্যবেক্ষণও তদারকি খুব সহজ হয়। ফলে সংগঠনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। একজন কর্মী যদি বিভিন্ন প্রশ্নে বিভিন্ন জনের কাছে দায়িত্ব বদ্ধ থাকেন তবে তাদের কাজে বহুজটিলতার সৃষ্টি হয়।

৫.৬.২ আদেশে ঐক্য ঃ সমস্যা

আধুনিক জনপ্রশাসনের তাত্ত্বিকেরা আদেশের ঐক্য সম্পর্কে নানা ধরনের সমস্যার কথা বলেছেন ঃ

১। আদেশের ঐক্যনীতির সার্বজনীন প্রয়োগ সম্বন্ধে জনপ্রশাসনের সমকালীন প্রবক্তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। একথা অবশ্যই ঠিক যে খুব ছোট সংগঠনে এক কর্তৃপক্ষের ধারনাটি কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে বৃহৎ সংগঠনের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকরী নাও হতে পারে। বর্তমানে বড় সংগঠনের কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এত ব্যবহৃত হয় যে, পরিচালনার ক্ষেত্রে এদের মাঝে সীমারেখা টানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একই ব্যক্তি প্রযুক্তি পরিচালনা, অর্থনৈতিক ব্যবহার পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য নানা ধরনের কাজের মধ্যে সমন্বয় আনতে পারে না। ডিমক ও ডিমক বলেছেন, "আধুনিক সংগঠনে মালিক বা কর্তৃপক্ষ কে জানলেও, বিভিন্ন স্তরে বিশেষভাবে নিযুক্ত প্রশাসকগণ নিয়তই সমগোত্রীয় প্রশাসকগণ বা উর্দ্ধতনদের সাথে আলাপ আলোচনায় রত থাকে"। ("Although generally speaking an employee should know who his boss is nevertheless in modern organisation strategically placed executives constantly deal with several equals or superiors.")। এইভাবে বিভিন্ন জনের মাঝে বোঝাপড়ার মাধ্যমে আধুনিক বৃহদায়তন সংগঠন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এগিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ সরকারী সংগঠনের উল্লেখ করেও বলা যায় যে, গ্রামীণ উন্নয়নে পঞ্চায়েত, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, জেলা আধিকারিক ও জেলার উন্নয়ন দপ্তরের কারিগরি বিশেষজ্ঞ সম্মিলিত ভাবেই উন্নয়নের কাজ সফল করতে পারে; শুধু জেলা সভাধিপতির সাহায্যে এই কাজ সফল হতে পারে না।

২। আদেশের ঐক্যের নীতি প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক বলে সাইমন (Simon) ও অন্যান্য আচরণবাদী তত্ত্ববিদরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। সাইমন বলেন যে, যদিও একথা ঠিক যে, একজন কর্মীর পক্ষে একাধিক বিরোধী আদেশ গ্রহণ সহজ নয় কিন্তু "যদি সংগঠন বিশেষীকরনের ধারনাকে প্রাধান্য দেয় তবে আদেশের ঐক্যনীতি সংগঠনের বিরোধী হয়ে দেখা দিতে বাধ্য।" ("The real fault that must be found with this principle is that it is incompatible with the principle of specialization")। সাংগঠনিক কাজে দক্ষতার জন্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ যেমন নিতে হয় তেমনি সাধারণ পরিচালকের পরামর্শও। কিন্তু উভয়ের পরামর্শ পরস্পর বিরোধী হবে না একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সময়কে অস্বীকার করে আদেশের ঐক্যনীতি প্রয়োগ করতে গেলে এই নীতির মধ্যে দ্বৈধতার সৃষ্টি হতে পারে। লুথার গালিফের মত ধ্রুপদী তত্ত্ববিদ্‌রা যখন জোর দিয়ে বলেন আদেশের ঐক্য নীতিকে অনুসরণ না করলে সংগঠনে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী, সাইমন তখন কাল (time)-এর কথা স্মরণ করে বলেন প্রযুক্তিগত দক্ষতার বিরুদ্ধে এটি বিশেষ বাধা হয়ে দেখা দেবে। সাইমন সব সময়ই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, প্রশাসনের সাধরণ পরিচালক ও বিশেষজ্ঞের মাঝে সমঝোতা তৈরী হবে কিনা;

৩। লুথার গালিফ আদেশের ঐক্য নীতির পক্ষ সমর্থন করে তিনি অবশ্য বলেছেন যে, খুব জোড়ালো ভাবে এই নীতির প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক জনপ্রশাসন তত্ত্বের প্রবক্তা টেলর "কার্যকরী কর্মনায়ক" ("Function Foremanship")-এর তত্ত্বে স্বীকার করেছেন যে, সংগঠনে একই ব্যক্তি একাধিক কর্তৃত্বের অধীন। একজন কর্মী কিভাবে যন্ত্র-পরিচালনা করবে, কিভাবে যন্ত্রের সংরক্ষণ করবে বা কেমন করে সার্বিক উদ্দেশ্য সফল

করবে তার জন্য একাধিক কর্তৃত্বের অধীন থাকবে। সাইমন মনে করেন অধস্তনের আনুগত্য যখন পরিমাপ যোগ্য নয় তখন আদেশের ঐক্যনীতি ব্যবহৃত হতে পারে। বিভিন্ন কাল (time)-এ বিস্তৃত এলাকা (space) তে আদেশের ঐক্যনীতি তদারকি, কর্মবিভাজন প্রভৃতি নানাসমস্যার সমাধানে অপারগ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভারতের মত বিশাল দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আদেশের ঐক্যনীতির প্রয়োগ প্রায়ই ব্যাহত হয়। এই নীতি সম্পর্কে এত সন্দেহ থাকলেও একথা অবশ্যই বলা যায় যে সংগঠন গড়ে ওঠার সময়ে এই নীতি অবশ্যই প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে।

অনুশীলনী ঃ

১। আদেশের ঐক্য ধারনাটির ব্যাখ্যা করুন।

২। আদেশ নীতি সংক্রান্ত ফেয়লের মতবাদ কি?

৩। আদেশের ঐক্যের বিশেষ সুবিধাগুলি আলোচনা করুন।

৪। আদেশের ঐক্যে প্রয়োগগত সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করুন।

৫.৭ নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের এলাকা

সংগঠনে ব্যক্তিগত কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। জনপ্রশাসন শাস্ত্রে নিয়ন্ত্রণ একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সেগুলি যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যকরী করতে হলেই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন এবং সংগঠনে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রয়োজন। সংগঠনে বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের সমস্যার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের সমস্যাও জড়িত। সাধারণ অর্থে নিয়ন্ত্রণ বলতে নেতিবাচক ও সংযমী আচরণ বোঝায়। উৎপাদন অনুসারে সাংগঠনিক লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছাবার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ একটি বিশেষ মাধ্যম। এই সমস্ত কারণে নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আলোচনায় তিনটি বিশেষ আলোচ্য ঃ ক. নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি ও অর্থ; খ. সমকালে উদ্ভূত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ ও গ. আচরণবাদী দৃষ্টিতে সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ।

৫.৭.১ নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি ও অর্থ

সম্ভাব্য বিচ্যুতি পরিহার করে কর্ম-প্রগতির জন্যই নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। ঠিক সময়মত নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সাংগঠনিক কাজকর্মের খবরাখবর প্রয়োজন। সমস্ত কাজকর্মকে নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী করানই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির তিনটি প্রাথমিক উপাদান আছে। ১. নিরূপণ ঃ প্রশাসনে উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কোন্ বিধি অনুযায়ী কাজ করতে হবে তা নিরূপণ করে সংগঠনে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীকে সচেতন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামীণ উন্নয়নে নিযুক্ত কর্মীদের গ্রামে কোথায় কোথায় কতক্ষণ ধরে প্রদর্শনী করতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়। ২. বিধি অনুযায়ী বাস্তব কাজকর্মের তুলনা ঃ বিভিন্ন সময়ে সংগঠনে কাজের প্রগতি লক্ষ্য করে

বিধি অনুযায়ী ঠিকমত কাজ হচ্ছে কিনা তার বিচার করা প্রয়োজন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কি করা প্রয়োজন তার জন্য সতর্ক নির্দেশ দান করা দরকার। এইভাবে বাস্তব কাজকর্মের তুলনার সাথে কাজের মূল্যায়ন ও সতর্কীকরণের প্রয়োজন থাকে। ৩. সংশোধন পদ্ধতি গ্রহণ ঃ সংগঠনে কাজকর্মের রিপোর্ট অনুসরণ করে কোন ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কিনা তার বিচার করতে হয় ও তার সংশোধনের পদ্ধতিও গ্রহণ করতে হয়। সাধারণ সংস্থার বাস্তব উৎপাদন বিচারেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সংস্থার সেবা বা উৎপদন যাই হোক না কেন প্রতিক্ষেত্রেই গুণগত ও পরিমাণগত মান বিচার করতে হয়। সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজকর্মের বিচার করতে হলেও উৎপাদন ও উপায় বিষয়গুলির বৈশিষ্ট্য সতর্কভাবে বিচার করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় যে, কোন কোন পরিকল্পনায় পরিমাণগত উৎপাদন সামান্যই দেখা যায়। কৃষিক্ষেত্রে কূপ-খনন পরিকল্পনা খুব সামান্যই পরিমাণগত উৎপাদন দেখায়। কূপ-খনন উৎপাদনের একটি সামান্য নিদর্শন। কৃষি উৎপাদন ও কৃষকের আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে কূপ-খনন একটি মধ্যবর্তী ক্রিয়া-মাত্র। সরকারী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আইনানুবর্তীতা ও নৈতিকতা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। নৈতিকতা একটি ব্যাপক বিষয়। নৈতিকতার সাথে পরোক্ষভাবে চারিত্রিক ঋজুতা ও সততার কথাও বোঝায়।

৫.৭.২ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

বিভিন্ন সময় (time) ও এলাকা (spacc)-য় নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। সংগঠনের কাজের গোড়ার দিকে প্রচার ও কর্মীদের আনুগত্যের মাধ্যমে একধরনের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আরোপ করা হয় আবার কর্ম-পদ্ধতির শেষে উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে আরেক ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ক্ষুদ্র সংস্থা ও বৃহত্তর সংস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ভারতে জীবন বীমা কর্পোরেশন (LICI)-এর মত ব্যাপক সংগঠনের ক্ষেত্রে আনুগত্য ও কর্মদক্ষতার জন্য কর্মীদের মাঝে যে ধরনের বিস্তৃত প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আরোপ করা প্রয়োজন হয়, একটি এলাকার ক্ষুদ্র কারবার সংগঠনের ক্ষেত্রে সামান্য পর্যবেক্ষণ ও পরিচালন পদ্ধতিই নিয়ন্ত্রণের পক্ষে যথেষ্ট। নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে এটজিয়নি তিনটি সাধারণ পন্থার কথা বলেছেন ঃ ১. দমনমূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শাস্তির সাহায্যে ব্যক্তির আনুগত্য আদায় করা যায় কিন্তু অনেক সময় এর ব্যতিক্রমও হতে পারে—ব্যক্তি সংগঠনের প্রতি নিস্পৃহ হয়ে যেতে পারে। ২. পুরস্কারের পদ্ধতি। ব্যক্তির কাজের পরিমাণ ও গুণগত মান দেখে ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করে তার কাজে আনুগত্য সম্মতি নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি অসুবিধাও দেখা দেয়। কাজের প্রতি কর্মীর আনুগত্য ও সম্মতির অনুপাত অনেক সময় পুরস্কারের অনুপাতেই সীমিত হয়ে পড়ে ; স্বতস্ফূর্ততার অভাব দেখা দেয়। ৩. নীতিগত পদ্ধতি। নীতিগত এই পদ্ধতিটি মূলত প্রচার মূলক। প্রচারের মাধ্যমে সংগঠনের কর্মিদের কাছে সংস্থার আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি কর্মিদের আনুগত্য ও উৎসাহকে বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে কর্মিদের স্বতঃস্ফূর্ততাকে ভিত্তি করে এই নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সমকালীন প্রশাসনে এই পদ্ধতিকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়।

নিয়ন্ত্রণের আরও অন্যান্য পদ্ধতি প্রচলিত আছ। সরকারী বা বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই আইনগত পদ্ধতি কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সংসদের বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের

সংগঠনের কর্মীরা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারী সংগঠনে অর্থ-মন্ত্রক ও তার বাজেট এই সংগঠনের কাজকর্মকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বেসরকারী ক্ষেত্রেও সংগঠন পরিচালকদের স্বীকৃত আর্থিক হিসাব ও বার্ষিক অনুদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিচার-মূলক পদ্ধতিও নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রশাসনিক আদালত সরকারী সংগঠনের কাজের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বেসরকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে এই ধরনের আদালত, মানবিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থার কর্মী ও পরিচালকদের উপর নানান বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে। এ ধরনের যত রকমের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিই পরিচালিত থাকুক না কেন সব সময়ই এটি বিচারযোগ্য যে নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিতের মধ্যে যেন কোন বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি না হয়। প্রত্যেকেই যেন সংগঠনের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দিকে অগ্রসর হয়। মোট কথা সর্বস্তরের পরিচালক ও কর্মীদের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য।

৫.৭.৩ আচরণবাদী দৃষ্টি ও সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ

নিয়ন্ত্রণ একটি পদ্ধতি। সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে কোন কর্মী বা গোষ্ঠী অপর কর্মী বা গোষ্ঠীর আচরণকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। সংগঠনের লক্ষ্যের প্রতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সকল কর্মীকে সংহত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য। তানেনবাম (Tannenbaum)-এর মতে, "সংগঠনের কর্মিদের বিভিন্ন স্বার্থের মাঝে ও বিচ্ছিন্ন আচরণের সংহতি ও শৃঙ্খলা আনাই নিয়ন্ত্রণের কাজ"। "The Coordination and order created out of the diverse interests and potentially diffuse behaviours of members is largely a function of control." যেহেতু নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে একই সম্পর্কে উপস্থিত করে, তাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আচরণ ও অধস্তন কর্মিদের আচরণ সমানভাবে লক্ষণীয়। ম্যাকগ্রেগর (McGregor) এখানে বলেছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মানুষের চরিত্র সম্পর্কে দুই ধরনের মতবাদ পোষণ করে—"মতবাদ ক" ও "মতবাদ খ"।

"মতবাদ ক" অনুসারে ধরা যায় যে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মনে করে অধিকাংশ কর্মীরা মূলতঃ কাজ করতে চায় না ও আয়াসী। গড়পড়তা কর্মীরা এই মতবাদ অনুসারে নির্দেশ পেতে চায়। নিজে কোন দায়িত্ব নিতে চায়না। এদের উচ্চাকাঙ্খা কম, এরা নিরাপত্তা পেতে চায় এই সমস্ত কারণে এদের নির্দেশ দিতে হয়। ভয় দেখাতে হয় বা দরকার হলে শাস্তি দিয়েও সংগঠনের লক্ষ্যপূরণের চেষ্টা করা দরকার। "মতবাদ খ" অনুসারে ঊর্ধ্বতন বিশ্রামের মতই সহজ। শাস্তি দেওয়াই লক্ষ্যপূরণের একমাত্র হাতিয়ার নয়। কর্মী নিজেই নিজেকে পরিচালনা করে এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পুরস্কারের মাধ্যমেও অনেক সময় লক্ষ্যপূরণ হতে পারে। কাজে অনীহা বা দায়িত্বহীনতা অনেক সময় অভিজ্ঞতা প্রসূত, এগুলি মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি নয়। এইভাবে দেখা যায় যে, "মতবাদ-ক" "মতবাদ-খ"-এর ঠিক বিপরীত। ম্যাকগ্রেগরের মতে ঊর্ধ্বতম কর্তৃত্বের দায়িত্বজ্ঞান অনেক সময় "মতবাদ-ক" কে আশ্রয় করে আবার ঊর্ধ্বতম কর্তৃত্বের উৎসাহ "মতবাদ-খ" কে আশ্রয় করে কর্মিদের উন্নতির পক্ষে নিয়ে যায়। এই কারণেই সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের যেমন কর্মিদেরও তেমনি দায় থাকে।

উপযুক্ত তিনটি বিশেষ আলোচ্য পদ্ধতি ছাড়াও আরও অনেকভাবেই নিয়ন্ত্রণের বিশ্লেষণ হয়ে থাকে। এই সমস্ত বিশেষ পদ্ধতির মধ্যে অভিপ্রায়ানুগ (motivational) নিয়ন্ত্রণ উচ্চাভিমুখী। স্তর-বিন্যাসে অনেক সময় বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম অবস্থায় কতকগুলি প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এইগুলি পূর্ণ করবার জন্য একধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, এই প্রয়োজনগুলি ঃ ১. শারীরিক প্রয়োজন — যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ভোগ ইত্যাদি ; ২. সুরক্ষার প্রয়োজন—যেমন বিপদ, ভয় ইত্যাদি থেকে রক্ষা ; ৩. সামাজিক প্রয়োজন—যেমন গোষ্ঠী, সমিতি ও বন্ধুত্ব ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত হওয়া ; ৪. সন্তুষ্টির প্রয়োজন— যেমন আত্ম-সম্মান, আত্ম-সন্তুষ্টি ইত্যাদি ; ৫. স্বয়ংক্রিয়তার প্রয়োজন—যেমন সর্বোচ্চ আত্মোন্নতি, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি। সংগঠনের নিম্নতম স্তর হতে ক্রমশ উচ্চতর স্তর অনুযায়ী উল্লিখিত প্রয়োজনের স্তরগুলিকে সাজানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষের তরফে এই সমস্ত প্রয়োজন পূরণের প্রচেষ্টাকে এব্রাহাম মাস্‌লো (Abraham Masolow) মানুষের আচরণের প্রয়োজনিক উচ্চাভিমুখী (med-hierarchy) ব্যাখ্যার ধরন বলেই বলেছেন। উল্লিখিত প্রয়োজনগুলি মূলতঃ প্রত্যেক স্তরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা বলে ধরা হয়। এছাড়াও সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে কতকগুলি অন্তর্নিহিত অপ্রত্যক্ষজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণাও আছে। এ সমস্ত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে কোন সময় শাস্তি বা কোন সময় পুরস্কারের প্রয়োজনে কোন সময় শাস্তি বা কোন সময় পুরস্কারের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। নিয়ন্ত্রণের সম্পর্কে এরূপভাবে বিভিন্ন ধারনা প্রয়োগ করতে হয়। সাংগঠনিক স্তরে কর্তৃপক্ষ যখন যা চিন্তা করে নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন তাকেই প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো বলা হয়। নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এমনিভাবেই বিভিন্ন ধারণা ও তার বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়।

৫.৭.৪ নিয়ন্ত্রণের এলাকা (Span of Control)

নিয়ন্ত্রণের এলাকা আজকের জনপ্রশাসন শাস্ত্রে একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়। সামরিক বাহিনী, পুলিশ, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি সরকারী প্রশাসনের সর্বস্তরেই নিয়ন্ত্রণের মাত্রা বা সীমারেখা বর্তমান। এই সীমারেখা অতিক্রম করলে সুনিয়ন্ত্রণ ও সুশাসন কখনই সম্ভব নয়। এই সমস্যার কথা স্মরণ করেই কোন স্তরে কোন ব্যক্তির অধীনে কতজন করে কাজ করবেন তার নির্ধারণ করাই বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পরে। ক্ষেত্র বিশেষের কাজের লোভের সংখ্যার তামতম্য অবশ্যই থাকে। এই অর্থে নিয়ন্ত্রণের এলাকা বলতে বোঝায় অধস্তন কর্মিদের সংখ্যা থাকে একজন উর্ধ্বতন কর্তৃত্ব পরিচালনা করতে পারে। এলাকা (span) বলতে এখানে কাজের পরিধি ও কর্মিদের সংখ্যা বোঝায়। এই নির্দিষ্ট পরিধির কর্মীরা তাদের কাজের জন্য একজন উর্ধ্বতন পরিচালকের কাছে দায়িত্ববান থাকে। নিয়ন্ত্রণের এলাকা বলা যায় কাজকর্মের তদারকির পরিধি। জন-প্রশাসনে ধ্রুপদী তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন এলাকা প্রসারেরও যেমন একটা সীমা আছে তেমনি কর্মীর উপর কর্তাদের নিয়ন্ত্রণের একটি সীমা আছে। লুথার গালিফ বলেন, "Just as the hand of man can-span only a limited number of notes on the piano, so the mind and will of man can span but a limited number of managerial contacts." অর্থাৎ ব্যক্তির হাত যেমন পিয়ানোর কতকগুলি মাত্র স্বর চিহ্নের উপর পড়তে পারে তেমনি কর্তব্যক্তির মন এবং ইচ্ছা পরিচালনার নির্দিষ্ট কয়টি এলাকা স্পর্শ করতে পারে।

নিয়ন্ত্রণের এলাকার এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সকলেই প্রায় একমত। আমরাও কেউই একই সময়ে বহু ব্যাপারে মনোনিবেশ করতে পারি না। ফলত প্রশাসনিক তাত্ত্বিকদের একজন কখনও অন্যজনের সাথে নিয়ন্ত্রণের এলাকা নির্ধারণে একমত নন। তাত্ত্বিক ভি. এ. গ্রাইকুনাস (V. A. Graicunas) তাঁর গ্রন্থ 'Relationship in Organisation'-এ নিয়ন্ত্রণের এলাকা নির্ধারণের এক গাণিতিক সূত্র বের করেন। এই সূত্রের সাহায্যে তিনি বলেন একজন পরিচালক মাত্র পাঁচ (৫) বা খুব বেশী হলে ছয় (৬) জন কর্মীর কাজ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। বৈজ্ঞানিক ধাঁচের গ্রাইকুনাসের এই সিদ্ধান্তের পরেও উল্লেখ করা যায় লর্ড হ্যালডেন (Lord Haldane) ও গ্রাহাম ওয়ালেসের (Graham Wallas)-এর কথা। প্রশাসনিক কমিটির আলোচনায় দুইজনেই সিদ্ধান্ত নেন যে, একজন কর্তাব্যক্তির পক্ষে ১০ থেকে ১২ জন অধস্তন কর্মীর কাজের তদারক করা স্বাভাবিক। অন্যথায় পরিচালকের ওপর খুব বেশি চাপ পড়ে। স্যার জন হ্যামিলটন (Sir John Hamilton) সৈন্যবিভাগ সম্পর্কে বলেন যে, 'মানুষের গড় মস্তিষ্ক মাত্র তিন (৩) থেকে ছয় (৬) জন মানুষের বুদ্ধির ওপর খবরদারী করতে পারে।' আরউইক বলেন উচ্চতম কর্তৃত্বের পক্ষে পরিচালন করবার আদর্শ সংখ্যা চার (৪); কোন সময়ে নিচের স্তরের আট (৮) বা বার (১২) জনের ওপর মোটামুটি তদারকি চলে। হেনরী ফেয়লও মনে করেন একটি বড় সংস্থার পরিচালকের অধীনে পাঁচজন (৫) থেকে ছ'জনের (৬) বেশি কর্মচারী থাকা উচিত নয়।

জনপ্রশাসনের তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ-এলাকা নির্দ্ধারণে নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কখনই একমত হতে পারে নি। নিয়ন্ত্রণের এলাকায় আদর্শ কর্মীর সংখ্যা নির্ণয় করা বৃথা শ্রম মাত্র। নিয়ন্ত্রণের পরিধি বহু উপাদানের উপর নির্ভর করে, যেমন ঃ কাজের ধরন, সময়, এলাকা এবং ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। প্রথমতঃ কাজের ধরনের কথা বলতে বোঝা যায় যে, যদি একই ধরনের কাজে নিযুক্ত কর্মিদের ওপর তদারকি করা যায়, তবে কিছু বেশী সংখ্যক কর্মীর উপর পর্যবেক্ষণ করা যায়। ডাক্তার যদি ডাক্তারদের ওপর বা ইঞ্জিনীয়ার যদি ইঞ্জিনীয়ারদের ওপর তদারকি করে তবে কিছু বেশি সংখ্যক লোকের ওপর পরিচালনা করা যায়। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন সংগঠন বহু দিনের পুরোনো ও স্থায়ী হয় তবে অল্প সময়ে চালু নতুন কোন সংগঠনের চেয়ে পুরোনো সংগঠনে কিছু বেশি কর্মীকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসা যায়। তৃতীয়তঃ যদি কোন পরিচালকের অধীন কর্মী কার্যক্ষেত্র এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকে তবে নিয়ন্ত্রণের এলাকায় কর্মীর সংখ্যা খুব কমই থাকে। চতুর্থতঃ কোন শক্ত-ব্যক্তিত্বের পরিচালক দুর্বল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তির চেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মিদের ওপর তদারকি করতে পারে। এমনিভাবে নিয়ন্ত্রণের এলাকা, কাজের ধরন, সময়, পরিধি ও ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি প্রধান চারটি উপাদানের সাথে জড়িয়ে থাকে।

এছাড়াও এ ডিমক ও ডিমকের ভাষায় বোঝা যায় যে, জনপ্রশাসন শাস্ত্রের ধ্রুপদী তাত্ত্বিকরা নিয়ন্ত্রণের এলাকাকে সীমিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের পক্ষে যুক্তি হল নিয়ন্ত্রণের এলাকা ক্ষুদ্র হলে পর্যবেক্ষণ গভীরতম হয়, প্রতিটি কর্মীর কর্তৃপক্ষের কছে দায়িত্ব স্পষ্ট, পরিমাপযোগ্য হয়। আরও বলা যয় যে, নিয়ন্ত্রণ এলাকা ছোট হলে বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও কাজের মধ্যে সংযোগ সাধন খুব সহজ হয়। ছোট এলাকায় নির্দিষ্ট প্রয়োজনের বেশি কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি না করলে প্রশাসনে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় নতুবা যদি কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলা যায় তবে অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান বিধির মত কাজের দক্ষতা হ্রাস পেতে থাকে।

উল্লিখিত তত্ত্ববিদ্‌দের আলোচনার প্রতিবাদ করেছেন আচরণবাদী প্রশাসনবিদ্‌ হারবার্ট সাইমন। প্রশাসনে

প্রচলিত বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের মত নিয়ন্ত্রণ এলাকা সীমানা নির্দ্ধারণও একটি নীতি মাত্র। সংগঠন হাসপাতালের মত বৃহদায়তন হলে নিয়ন্ত্রণ এলাকায় সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। সংগঠনের স্তরবিন্যাসে স্তরের আধিক্য ঘটলে সমন্বয় সাধনে সংকট সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তবুও বলা যায় যে, নিয়ন্ত্রণ এলাকার সীমারেখা নির্ধারণে ধ্রুপদী তত্ত্ববিদ্রা ঐক্যমতে পৌছাতে পারেন নি। আর তাই নিয়ন্ত্রণ এলাকার সীমারেখা-সমস্যা একটি আনুষ্ঠানিক সমস্যা হয়েই রয়েছে। সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন সমস্যারও পরিবর্তন হয় এই পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ এলাকার সমস্যা বহুমুখঈ হয়ে পড়ে। মানবিক সম্পর্কের তত্ত্ববিদেরা তাই কর্তৃপক্ষ ও কর্মিগোষ্ঠী-এর মত দুই তরফের সম্পর্ক ও আচরণবিধি আলোচনর কথা বিশেষ করে বলে থাকেন। প্রশাসনে স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কম্পিউটার প্রভৃতির ব্যবহারের যুগে তথাকথিত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের ধারনা পরিবর্তিত হতে চলেছে, সমকালে প্রযুক্তিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা তথাকথিত উচ্চাভিমুখী স্তরন্যািসে ঊর্ধ্বতনের দ্বারা অধস্তনের নিয়ন্ত্রণের সমস্যাকে সমস্যা বলেই মনে করেন না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রব্যবস্থা এ-ধারনা মানে না ; আর তাই এই পরিবর্তিত সময়ে প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণের সমস্যা সহযোগিতা ও সমাযোজনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক রাজনীতির টালবাহানা লক্ষ্য করে আধুনিক জনপ্রশাসনবিদ পিটার সেলফ বলেন আজ ধরন-ধারনের পরিবর্তন হয়েছে। পুরোনো দিনের তত্ত্ববিদ্দের ঘনিষ্ঠ তদারকির বদলে নব্য তাত্ত্বিকেরা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও দায়িত্ববোধকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আজ এরা মনে করেন সামাজিক আচরণের পূর্ণ উপলব্ধিতেই সংগঠন সফল ভাবে কাজ করতে পারে যখন সাংগঠনিক কাঠামো ঢিলেঢালাভাবে তৈরী হয়। এই সমস্ত চিন্তা করে পিটার সেলফ বলেছেন ঈপ্সিত নিয়ন্ত্রণ এলাকা কতকগুলি বিশেষ উপাদানের উপর নির্ভর করে ঃ

ক. পরিচালক তার অন্যান্য কাজের বাইরে অধীনস্থ কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে কতটা সময় ও মনোযোগ দিতে পারেন।

খ. পরিচালক কতটা প্রযুক্তিগত ও ব্যক্তিগত সহযোগিতা পেতে পারেন।

গ. সমস্ত স্তরের কর্মিগোষ্ঠীর গুণগত ও বৌদ্ধিক মানের গুরুত্ব।

ঘ. পর্যবেক্ষণ করা হবে যে কাজ, তার ধরণ-ধারণাটিই বিশেষ প্রয়োজন।

ঙ. ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ বা তার প্রয়োজনের জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সমর্থন প্রয়োজন।

৫.৮ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। জনপ্রশাসনে নিয়ন্ত্রণ বলতে ঠিক কি বোঝায়।

অথবা,

নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা নিরূপণ করুন।

২। নিয়ন্ত্রণের অর্থ ও প্রকৃতি আলোচনা করুন।

৩। "নির্দিষ্ট সময় এবং এলাকায় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির তারতম্য ঘটে"—উদাহরণসহ বাক্যটির তাৎপর্য আলোচনা করুন।

৪। আচরণবাদী প্রশাসন তাত্ত্বিকরা সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণের কোন্ কোন্ উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন ?

৫। কয়েকজন আচরণবাদী প্রশাসন তাত্ত্বিকের মতামত সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

৬। অভিপ্রায়ানুগ (motivational) নিয়ন্ত্রণ আব্রাহাম মাসলোর অভিমতটির উল্লেখ করুন।

৭। নিয়ন্ত্রণের এলাকা (span of control) বলতে কি বোঝায় ?

৮। জনপ্রশাসনে নিয়ন্ত্রণের এলাকা নির্ধারণের গুরুত্ব উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৯। লুথার গালিফ নিয়ন্ত্রণ এলাকার সীমারেখা সম্পর্কে কি বলেন ?

১০। জনপ্রশাসনে তাত্ত্বিকগণ নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণে কখনই একমত হতে পারে না কেন ?

১১। নিয়ন্ত্রণ এলাকা নির্ধারণে পিটার সেলফ্ কোন্ কোন্ উপাদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন ?

একক ৬ ❑ সংগঠনে কর্তৃপক্ষ ও কর্মিদের ভূমিকা

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ প্রস্তাবনা

৬.২ কর্মধারা ও কর্মিবর্গের ধারণা

৬.২.১ কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের কার্যকলাপ

৬.২.২ কর্মিবর্গের কার্যাবলী

৬.৩ কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের কার্যাবলী ও কর্মিবর্গের কাজের তুলনামূলক আলোচনা

৬.৪ কর্মধারার কার্যাবলী (Line Services) ও কর্মিগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ (Staff Services) সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা।

৬.৫ কর্মধারা ও কর্মিবর্গের বিরোধ

৬.৫.১ ভারতে কর্মধারার কার্যাবলী ও কর্মিবর্গের আলোচনা

৬.৬ সর্বশেষ অনুশীলনী

৬.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- কর্মধারা ও কর্মিবর্গের ধারণা
- কর্মিবর্গের কার্যাবলী
- কর্মধারার কার্যাবলী (Line Services) ও কর্মিগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ (Staff Services)
- ভারতে কর্মধারার কার্যাবলী ও কর্মিবর্গের কার্যাবলী

৬.১ প্রস্তাবনা

সংগঠন তা সে সরকারীই হোক বা বেসরকারীই হোক তার সামগ্রিক সাফল্যে, কর্তৃপক্ষ ও কর্মিবৃন্দের যৌথ ভূমিকার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রশাসনে পরিচালকগণ কর্মধারা নির্দ্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন ও সামগ্রিক উদ্দেশ্য

সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখেন। সংগঠনে নিযুক্ত কর্মিবৃন্দ কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে সাহায্য করে থাকে। কর্মধারার নির্ধারণ, গতি নির্ণয়, কর্মসূচী তৈরি ও সংগঠনের স্তরে স্তরে এর বিন্যাস এবং এ সমস্ত পদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কর্মী নির্দ্ধারণ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কর্মিবর্গের কার্যকলাপকে কখনই হেয় করে দেখলে চলবে না। কর্মধারা সংক্রান্ত কার্যাবলীকে (Line Service এবং কর্মিবর্গকে Staff Services বলা হয়। ক্ল্যাসিকাল বা সাবেকী জনপ্রশাসন শাস্ত্রের তাত্ত্বিকগণ কর্মধারা সংক্রান্ত কার্যাবলীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কর্মিবর্গকে বিশেষ মূল্য দেননি। এঁরা মনে করতেন পরিচালকগণ কর্মধারা সংক্রান্ত কার্যাবলীর নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংগঠনের মূল কাজগুলি করে থাকেন আর উপযুক্ত নীতিগুলিকে কার্যকরী করার জন্য সহায়তা করেন মাত্র। এইভাবে সংগঠনের ক্ল্যাসিকাল বা সাবেকী তত্ত্বে কর্মধারার কাজকর্মকেই মৌল কর্তৃত্বের প্রধান উৎস বলে মনে করতেন।

৬.২ কর্মধারা ও কর্মিবর্গের ধারণা

কর্মধারার ক্রিয়াকলাপ (Line services) ও কর্মিবর্গ (Staff services) এই উভয় ধারণাটিই সৈন্যবাহিনীর ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার থেকে গৃহীত হয়েছে। সৈন্যবাহিনীতে এই দুইধরনের কাজের স্পষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। কর্মধারা সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত অফিসারগণ সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে আদেশ দান করেন। এই সৈন্যরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করে থাকেন। কিন্তু সৈন্যদলের যুদ্ধক্ষেত্রে খাদ্য, ওষুধ, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। কর্মিবর্গ (Staff Services) সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে এই সমস্ত রসদের যোগান দিয়ে থাকেন। কর্মিবর্গ যুদ্ধ করেন না কিন্তু যুদ্ধকারীদের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু ইদানীং বৃহদায়তন সংগঠনের বাড়তি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ও প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য কর্মধারা সংযুক্ত অফিসারগণ ও কর্মিবর্গের এই সহজ বিন্যাস সব সময় কার্যকরী হয় না। অবশ্য ক্লাসিকাল বা সাবেকী প্রশাসনবিদগণ এই অর্থেই এই দুই বর্গের কাজকর্মকে আলোচনা করেছেন।

৬.২.১ কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের কার্যকলাপ

কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের কার্যকলাপ বলতে বোঝায় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কার্যাবলীর নীতিনির্ধারণ এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের কাজের নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ। সংগঠনের প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী উদ্দেশ্য সাধনই এদের প্রধান কাজ। যে সমস্ত প্রাথমিক উদ্দেশ্যের জন্য সরকার প্রচেষ্টা করে থাকে কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের কার্যাবলী তাদেরই প্রতিফলন। উচ্চাভিমুখী স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে উচ্চতম পর্যায় থেকে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত্য কর্তৃত্বের একটি নির্দিষ্ট ধারা প্রবাহিত হয়, তাদেরই কর্মধারা (Line) বলা হয়। কর্মধারার কার্যাবলী যে সব পরিচালক নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তারা সংস্থার মৌলিক উদ্দেশ্যের দিকেই নজর রাখেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে সচিবের প্রধান কাজ দেশে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নীতি নির্দ্ধারণ কার্যক্ষেত্রে তার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ। সামরিক বাহিনীর নীতি ও কর্মপ্রণালী কর্মধারা সংক্রান্ত ধারণা কর্তৃপক্ষই সামরিক বাহিনীতে কাজের গতি ও ধারা নিয়ন্ত্রণ করেন। এই সমস্ত কারণে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়। দেশে নগর প্রশাসনে পুলিশ বিভাগ, পূর্ত দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর ও দমকল বাহিনীর বিশেষ ভূমিকা আছে। এই সমস্ত কর্ম-বিভাজনকে কর্মধারা কার্যাবলী বা Line Service-এর পর্যায়ে ফেলা যায়।

নগর প্রশাসনের সাফল্য তাই নির্ভর করে এই সমস্ত দপ্তর নির্ধারিত কার্যাবলীর উপর। সাধারণত, সরকারের প্রশাসন বিভাগের প্রধানকেই এই সমস্ত কার্যাবলী নির্দেশদান করতে হয় এই জন্য তাকে কর্মধারা সংক্রান্ত কার্যাবলী প্রধান কর্তৃত্ব বা Chief Line officer বলা হয়। যে সময় এই প্রধান কর্তৃত্বের কার্য পরিচালনার সময় বা যোগ্যতা থাকে না তখন তিনি এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি গোষ্ঠী নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে তাদের ওপর প্রশাসনে কর্মধারা বা মূল-নীতি নির্ধারণে ভার দিয়ে থাকেন।

কর্মধারা সংক্রান্ত কার্যাবলী সাধারণত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আর এগুলি চূড়ান্ত হওয়ায় সংস্থার সমস্ত কাজের উৎপাদনই এর ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কোন প্রশ্ন অবান্তর। দ্বিতীয়ত, কর্মধারা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃত্বের দক্ষতা ও সাফল্য নির্ভর করে তার সাহায্যকারী বিভিন্ন সংস্থার ওপর। সহায়ক সংস্থাগুলি যদি সাফল্য ও দ্রুততার সঙ্গে কাজ না করে তাহলে কর্মধারা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাজে শ্লথতা ও দক্ষতার অভাব দেখা যায়। তৃতীয়ত, কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের পরিচালক সংস্থা প্রাথমিক নীতি নির্ধারণের জন্য ভারপ্রাপ্ত এবং সে কারণে তারা এর বাইরে বিশেষ কোন কাজ করে না। চতুর্থত, বলা যায় যে কর্মধারার সাফল্যের জন্য উচ্চতম কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সন্ধান রাখে। দ্রুততম কাজ ও সাফল্যের জন্য এই ধরনের বিশেষজ্ঞ কমিটিকে তারা নিয়োগ করে থাকেন। কর্মধারা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এইভাবেই স্তর-বিন্যস্ত প্রশাসনিক সংগঠনে তাদের আধিপত্য কায়েম করে থাকেন।

৬.২.২ কর্মিবর্গের কার্যাবলী

জনপ্রশাসনে প্রধান পরিচালক বা পরিচালক গোষ্ঠীকে অনেক ধরনের অনেক কাজে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই সমস্ত কাজে সাফল্য লাভ করতে হলে কর্তৃপক্ষকে বহুবিস্তৃত কর্মক্ষেত্র ও তাদের জটিলতা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এই সমস্ত কাজে সংবাদ প্রেরক ও বিশেষজ্ঞ অফিসারদের বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়ে এবং সংগঠনের প্রধানগণ এই সব পদে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করে থাকেন। অধ্যাপক মুনির ভাষায়, 'সংগঠনের এই বিশেষ এককদেরই কর্মিবর্গের কার্যাবলী বা Staff Services বলা হয়।' ("These special organization units are generally designated as staff agencies.") জন প্রশাসন তত্ত্ববিদ ফেয়লও বলেছেন যে, বৃহদায়তন সংস্থার প্রধানদের ক্ষমতা যতই হোক না কেন কিছু উচ্চতর কর্মী বা অফিসারদের দক্ষতা ও সাহায্য ছাড়া প্রশাসনে তারা সাফল্য আনতে পারেন না। কর্মিবর্গ উচ্চতম কর্তৃত্বকে সাহায্য করে ও তাদের কর্মপরিচালনাকে জোরদার করে। সংগঠন পরিচালনায় কর্মিবর্গ কর্তৃপক্ষের বিস্তৃতি প্রসার বা extension বলা যায়। ফেয়লের ভাষায়, কর্মিবর্গ বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে একটি আলাদা অংশমাত্র কিন্তু সংস্থার প্রাধান্য বিস্তারের সাথে সাথে এদেরও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়।' ("The Staff appears as a separate body only in large undertaking and its importance increases with the importance of the undertaking.") এতসব সত্ত্বেও বলতে হয়, কর্মিবর্গ সংগঠনের প্রধানতম কর্তৃত্ব নয়।

কর্মিবর্গের মুখ্যকর্তৃত্বের প্রতি সহযোগিতামূলক কার্যাবলী বা Staff Services এর প্রয়োজন সর্বপ্রধান না হলেও

সাংগঠনিক সাফল্যের জন্য এদের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। সংগঠনের বিভিন্ন স্তর ও দপ্তরে বিভিন্ন অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিযুক্তিকরণ প্রধান কর্তৃত্বের বিশেষ দায়িত্ব অথবা এক অর্থে প্রয়োজনও বলা চলে। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যই সরকার একটি রাষ্ট্রকৃত্যক বা Ser পরিষদ বা Service Commission সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমেই বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী নিয়োগই প্রধান কর্তৃত্বের বিশেষ কাজ। রাষ্ট্র কৃত্যক পরিষদের কর্মিরাই প্রধান প্রশাসককে উপযুক্ত গুণাবলী সম্পন্ন কর্মী নিয়োগে সহায়তা বা সুপারি করেন এবং এদের প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির শর্ত নির্ধারণ করে দেন। রাষ্ট্র-কৃত্যকের এই সদস্যগণও কর্মিবর্গ বা Staff Service-এর আওতায় পড়ে। এইভাবে অর্থদপ্তর সংগঠনের বাজেট প্রণয়ন করে তার প্রশাসনিক আয়-ব্যয়ের সীমারেখা নির্ধারণ করে। অনুরূপভাবে সরকারী বা বেসরকারী বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কর্মিবর্গের উপস্থিতির সবিশেষ, গুরুত্ব রয়েছে। এরা সর্বপ্রধান ক্ষমতা সম্পন্ন নয় কিন্তু প্রতিনিয়তই প্রধানের কাছে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয়। আসলে কর্মিবর্গ সংগঠনে লাঠির মত যাতে হেলান দিয়ে চলতে ফিরতে সাহায্য পাওয়া যায় কিন্তু কারও চলাফেরা এই লাঠি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না।

কর্মিবর্গের কার্যাবলী আলোচনা করতে প্রথমেই অধ্যাপক মুনির কথা মনে করতে হয়। মুনি কার্যাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। ১. কর্মিবর্গের কাজ সংবাদ সংগ্রাহকের কাজ। প্রধান কর্তৃত্বের প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা, অনুধাবন ও অনুসন্ধান শেষে সংগৃহীত সংবাদ কর্মিবর্গ প্রধান পরিচালককে জানান। ২. প্রধান পরিচালককে উপদেশদানের কাজও করে থাকে কর্মিবর্গ। প্রধানের পক্ষে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত তা কর্মিবর্গ বলে থাকে। তবে প্রধান পরিচালক তাদের উপদেশ গ্রহণ করতে বাধ্য নাও থাকতে পারেন। ৩. পর্যবক্ষেণমূলক কাজে কর্মিবর্গের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। স্তরবিন্যস্ত সংগঠনের উচ্চতম স্তর হতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত প্রধান পরিচালক কর্মধারা নিয়ন্ত্রকদের মাধ্যমে ঠিক মত কার্যকরী হচ্ছে কি না বা প্রবাহে কো বাধা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা তা অবশ্যই লক্ষ্য করার কথা কর্মিবর্গের। প্রশাসন তত্ত্ববিদ ফিফনার (Pfiffner) একটি ধারায় কর্মিবর্গের কার্যাবলীর উল্লেখ করেছেন ঃ (ক) উপদেশ, প্রশিক্ষণ ও আলোচনা ; (খ) সমন্বয়সাধন ও গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধীদের বোঝান ; (গ) তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা ; (ঘ) পরিকল্পনা করণ ; (ঙ) অন্যান্য সংগঠনের সাথে সংযোগ সাধন, যোগাযোগ এবং কি অবস্থা তা ব্যক্তিবিশেষকে জানানো ; (চ) কর্মধারা (Line) নিয়ন্ত্রকদের কর্তৃত্বে আঘাত না করে তাদের সাহায্য করা ও (ছ) কোন কোন সময় প্রধান কর্তৃত্বের কাছ থেকে প্রত্যর্পিত ক্ষমতা ব্যবহার করা। অধ্যাপক হোয়াইট (White) মনে করেন যে কর্মিবর্গ প্রধানকে যথাযথ ও সঠিকভাবে তথ্য প্রেরণ করে এবং ভবিষ্যতে তাঁকে পরিকল্পনা ও সমস্যা সম্বন্ধে পূর্ব হতেই সচেতন করে দেন। কর্মিবর্গ সব সময়ই প্রধান কর্তাব্যক্তি যাতে সিদ্ধান্ত নেবার আগে দ্রুত সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন তার চেষ্টা করবে এবং যে সমস্ত সমস্যার, সংগঠনের বাইরে সমাধান হতে পারবে সেগুলি বাদ দিয়ে রাখবে। প্রধান কর্তৃত্বের কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয় ও সংগঠনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রত্যেকের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পচেষ্টাও কর্মিবর্গের একটি বিশেষ কাজ। যাই হোক, কর্মিবর্গ কখনই উপদেশ ও সহযোগিতার মাত্রা অতিক্রম করবে না। এরা প্রশাসনিক কাজগুলি নিজের হাতে নিয়ে প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করবে না। কর্মিবর্গ উচ্চাভিমুখী প্রশাসনিক ধারার বাইরে অবস্থান করে। এদের প্রধানকাজ নির্দেশ দেওয়া নয়। কার্য রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ দানের জন্যই এদের গুরুত্ব স্বীকৃত।

অনুশীলনী

১। কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের কার্যকলাপ বলতে কি বোঝায় ?

২। কর্মধারা (Line Services) বলতে কি বোঝায় ?

৩। কর্মিবর্গের কার্যাবলী (Staff Services) বলতে কি বোঝায় ? কর্মিবর্গের কর্মের পরিধি কতটা বিস্তৃত ?

৪। কর্মিবর্গের কাজের পরিধি সম্বন্ধে অধ্যাপক মুনির বক্তব্য কি ?

৫। প্রশাসনিক তত্ত্ববিদ ফিফ্‌নার এর মত উল্লেখ করে কর্মিবর্গের কাজের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৬। মুখ্যপ্রশাসকের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৬.৩ কর্মধারা নিয়ন্ত্রণের কার্যাবলী ও কর্মিবর্গের কাজের তুলনামূলক আলোচনা

পিটার সেলফ্ বলেছেন, প্রশাসনিক তত্ত্বে কর্মধারা নিয়ন্ত্রক কার্যাবলী (Line Services) ও কর্মিবর্গের কার্যাবলী (Staff Services) —এ দুটি ধারণা আবিলতার একটি বিশেষ স্তরে উপনীত। অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় যে পরিচালন শাস্ত্রে 'স্টাফ এবং লাইন' সংক্রান্ত অর্থাৎ কর্মধারা ও কর্মিবর্গ ধারণাটি যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। পিটার সেলফের ভাষায়—"Staff and Line concepts furnish one of the most confusing branches of management theory." এই আবিলতা বা অস্বচ্ছতা ও সংশয় দূর করার জন্য কর্মধারা (Line) ও কর্মিবর্গ (Staff)-এর কাজের স্পষ্ট তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন। নিচে দুই সংস্থার কার্যাবলীর তুলনা করা হ'ল ঃ

কর্মধারার কার্যাবলী	কর্মিবর্গের কার্যাবলী
১. কর্মধারার কার্যাবলী মূলতঃ প্রাথমিক কার্যাবলী যা সংগঠনের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়।	১. কর্মিবর্গের কার্যাবলী কখনই প্রধান কাজ নয় এগুলি শুধুমাত্র কর্মধারার কার্যাবলীর সহায়ক মাত্র।
২. কর্মধারার কার্যাবলীতে কর্তৃত্ব নির্দেশ দান করা হয়।	২. কর্মিবর্গের কার্যাবলী শুধু নিয়ন্ত্রণ ও সহায়তা করে।
৩. কর্মধারা কার্যাবলী সংগঠনের সর্বস্তরে কর্মকে প্রবাহিত করে।	৩. কর্মিবর্গ শুধুমাত্র কর্মধারা নিয়ন্ত্রকদের সাহায্য ও উপদেশ দিয়ে থাকে।
৪. কর্মধারা কার্যাবলী জনগণের প্রত্যক্ষ সংযোগে উপনীত হয়।	৪. কর্মিবর্গের কার্যাবলী সব সময় আড়ালেই থাকে।
৫. কর্মধারা নিয়ন্ত্রক উচ্চতম স্তর থেকে স্তরে স্তরে নিম্নতম স্তরে নির্দেশ দান করে।	৫. কর্মিবর্গের এধরণের কোন আদেশ দানের অধিকার নেই।

উল্লিখিত পার্থক্য অনুসরণ করে মনে হয় কর্মিবর্গ ও কর্মধারার কার্যাবলীর পার্থক্য উপদেশ দেওয়া-নেওয়ার পার্থক্য। যে ভাবেই দেখা হোক না কেন কর্মধারা (Line) ও কর্মিবর্গ (Staff)-এর পার্থক্য আপেক্ষিক, কখনই চূড়ান্ত নয়। যখন আমরা কোন সংস্থাকে কর্মিসংস্থা বা কর্মধারা নিয়ন্ত্রক সংস্থা বলে থাকি তখন আমরা এদের দু'ভাগেরই কাজ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মনে করি। কর্মিবর্গের দপ্তরের প্রধান তাদের নিজস্ব সংগঠনে কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদিকে কর্মধারার নিয়ন্ত্রকদের যখন উচ্চতম পরিচালকের সঙ্গে তুলনা করা হয় তখন এই নিয়ন্ত্রকবর্গ কর্মিবর্গে পর্যবসিত হয়। কর্মিবর্গ বা কর্মধারা নিয়ন্ত্রকদের এক এক পরিস্থিতিতে এক এক ভাবে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য দপ্তর যখন সরকারকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিশেষভাবে উপদেশ দেয় তখন তারা সরকারের কাছে কর্মীদপ্তর বা Staff হিসাবে পরিগণিত হয়। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য দপ্তরের নিজ নিজ প্রশাসনে এই সব দপ্তরের প্রধানরা কর্মধারা নিয়ন্ত্রক (Line Services) হিসাবে কাজ করে। একথা কখনই ঠিক নয় যে কর্মিবর্গ কখনই কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। অনেক সময় উচ্চতম কর্তৃত্ব কর্তৃক কর্মিবর্গের উপর কর্তৃত্ব প্রত্যর্পিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতে পরিকল্পনা কমিশন মূলতঃ একটি কর্মী দপ্তর, কিন্তু ক্রমশঃ এই কর্মিবর্গের আধিপত্য অনেক সময় মন্ত্রী পরিষদের কর্তৃত্বকেও ছাপিয়ে যায় এবং তখন তারা কর্মধারা নিয়ন্ত্রক কর্তৃত্বে উপনীত হয়।

কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যাবলী ও কর্মিবর্গের কার্যাবলীর মাঝে পার্থক্য নিম্নলিখিত লেখচিত্রের দ্বারা স্পষ্ট করে বলা যায় ঃ

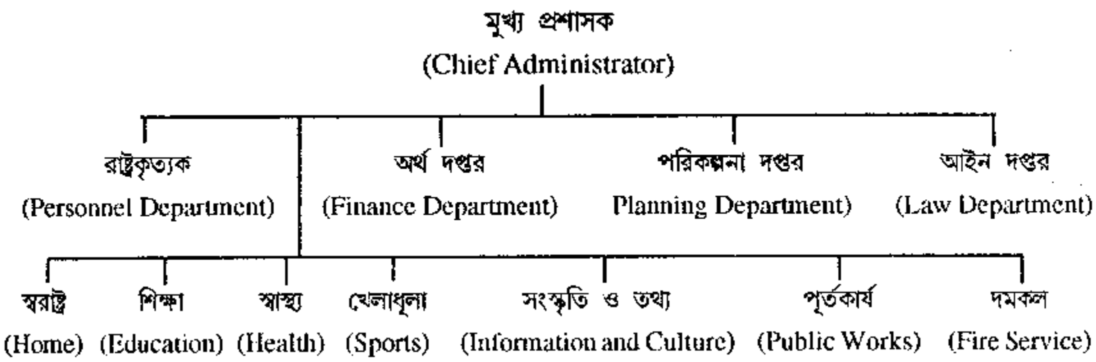

উপরের স্তরের কার্যাবলীকে কর্মিবর্গের কাজের দপ্তর ও নিচের বিভাগগুলি কর্মধারা সংক্রান্ত কার্যাবলীর নিদর্শন। উপরের স্তরের দপ্তরগুলি সব সময়ই নিচের কর্মধারাকে সাহায্য করে থাকে এবং উপরের কর্মিবর্গের দপ্তরগুলির এলাকা বহু বিস্তৃত। সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত কর্মবিভাজন উভয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে।

অনুশীলনী

১। কর্মধারা ও কর্মিবর্গের কাজের প্রকৃতি ও পরিধি সংক্রান্ত একটি তুলনামূলক আলেখ্য দিন।

২। কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ ও কর্মিবর্গের কার্যাবলীর পার্থক্য নির্দেশ করতে একটি লেখচিত্র দেখান।

৬.৪ কর্মধারার কার্যাবলী (Line Services) ও কর্মিগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ (Staff Services) সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা

পূর্বাংশেই বলা হয়েছে প্রশাসনের আলোচনায় কর্মধারার (Line) কার্যাবলী ও কর্মিবর্গের (Staff) ক্রিয়াকলাপ বিশেষ সংশয়ের সৃষ্টি করে। উদ্ধৃত ধারণা দুটি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কে না গিয়েও প্রশাসনিক সংগঠনে এগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যায়। আমেরিকায় এগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী দেখা যায় ও আমেরিকার সরকারে এগুলির ব্যবহারকে 'ত্রুটিপূর্ণ উচ্চাভিমুখী ক্রমবিন্যাস' (defective hierarchy) বলে মেয়ার (Meyer) উল্লেখ করেছেন। উচ্চতম প্রশাসক থেকে ক্রমশঃ নিচের দিকে নিয়ন্ত্রণের ধারার গতিতে যথেষ্ট ত্রুটি ও দুর্বলতা দেখা যায়। গোড়ার দিকে আমেরিকার প্রশাসনতাত্ত্বিকগণ কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব থেকে মুক্তির জন্য এই 'ত্রুটিপূর্ণ উচ্চাভিমুখী ক্রমবিন্যাস'-কে মেনে নিয়েছিলেন। আগের দিনে আইনগত কর্তৃত্ব জোরদার ছিল কিন্তু আজ যখন বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত। উদ্ভূত এই অবস্থা তারা কল্পনা করতে পারেন নি। সমকালের প্রশাসন ব্যবস্থায় 'ত্রুটিপূর্ণ উচ্চাভিমুখী ক্রমবিন্যাস' ব্যবস্থা একটি অভিসম্পাত বিশেষ, কারণ এই বিন্যাস, 'নিয়ন্ত্রণের ঐক্যের ধারনা, 'নিয়ন্ত্রণের ধারা' ও দায়িত্বকে শিথিল করে দেয়। ধ্রুপদী বা সাবেকী তাত্ত্বিকগণ কর্মধারাকেই বিশেষ প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসনিক কাঠামোকে জোরদার করতে সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণের উপাদানকে কার্যকরী করতে কর্মিবর্গের ধারণার বিশেষ প্রাধান্য ও ব্যাপ্তি দরকার।

আধুনিক প্রশাসনিক তত্ত্ববিদ পিটার সেলফ মনে করেন কর্মি বা 'Staff' সংক্রান্ত ধারনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সর্বপ্রধান প্রশাসক (Chief Executive Officer)-এর কার্যকলাপের আলোচনার প্রয়োজন। হেনরী ফেয়ল মনে করেন প্রধান প্রশাসকের কাজ পরিকল্পনা (Plan), সংগঠন (Organise), নির্দেশ (Command), সমন্বয় (Coordinate) এবং নিয়ন্ত্রণ (Control) করা। লুথার গালিক বিস্তৃত ভাবে এই কাজগুলির প্রকাশ করেন POSDCORB কথাটির মাধ্যমে যেমন ঃ Planning (পরিকল্পনা) Organising (সংগঠন), Staffing (কর্মী নিয়োগ), Directing (পরিচালনা), Co-ordinating (সমন্বয়), Reporting (তথ্য পেশ) ও Budgeting (আয়-ব্যয়) প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে। দুই-এর যে কোন ধরণের ব্যাখ্যাতেই নির্দিষ্ট কার্যাবলী একটি নির্দিষ্ট ধারাতে প্রবাহিত। সহজ আলোচনায় ফেয়ল এই কাজগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন ঃ ১. কর্মধারা নির্দিষ্টকরণ (Preparing operations) ; ২. কর্মধারা কার্যকরী করা (Seeing that they are carried out) এবং ৩. ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা (Watching the results)। উচ্চতম কর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ বিভিন্ন উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতিটির ওপরই জোর দেন এবং এর ফলে তারা কর্মীনিয়োগ, পরিচালন ও সমন্বয় প্রভৃতির ওপরই জোর দেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রটিকে তারা অবহেলা করেন এবং এর ফলে বিশেষ করে সরকারী ক্ষেত্রে প্রশাসকগণ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজে বিশেষ ঘাটতি রেখে দেন। এই সমস্ত কারণে কাজে সাফল্য ঠিকমত পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে কর্মিবর্গের ভূমিকা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তথ্য সরবরাহ করা, মতামত প্রকাশ ও আলোচনা করা এবং মূল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা কর্মের গতি রূপায়নে বিশেষ সাহায্য করে। পিটার সেলফ বলেন, "The Staff's function is to assist the chief executive by providing information,

formulating possible courses of action, co-ordinating decisions, and reporting on relsults." আদেশের ঐক্যসূত্র রক্ষার প্রয়োজনে কর্মিবর্গের প্রয়োজন। কর্মধারার কাজগুলি ও শাসন কর্তৃপক্ষ যদিও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে, তবুও কর্মিবর্গের কাজগুলির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে স্বীকার করা উচিত। অধ্যাপক আরউইক সর্বপ্রথম প্রশাসন শাস্ত্রকে এই ধরনের অস্পষ্টতা থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন কর্মিবর্গের কর্তৃত্ব তাদের কাজের ওপর তাদের স্তরের ওপর নয়। কর্মধারার কাজগুলি প্রতিষ্ঠানিক কর্তব্য ও প্রত্যর্পিত কর্তৃত্বের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু কর্মিবর্গের কাজগুলি প্রধান কর্তৃত্বের ব্যক্তিগত কাজের প্রসারণ মাত্র।

পিটার সেল্‌ফ, গালিক ও আরউইকের ধারনার অনুবর্তী হয়ে বলেন প্রধান প্রশাসক ও কর্মিবর্গের কাজের মাঝে সংযোগ সাধন বিশেষ সংকট সৃষ্টি করতে পারে যদি কর্মিবর্গের কাজের কোন প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য না দেওয়া হয়। কিন্তু এই সংকট অতিক্রম করতে প্রধান প্রশাসক কর্মধারার কাজ ও কর্মিবর্গের কাজের বাইরে একধরণের সহায়ক (Auxiliary) কাজের সৃষ্টি করেন যাদের মূল্য যথেষ্ট বেশি। পিটার সেল্‌ফ প্রশাসনিক কাজে এই ধরনের সহায়ক গোষ্ঠী (Auxiliary Group)-র গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতি কাজগুলি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হলেও কর্মধারা ও কর্মিবর্গের কাজের সাথে এদের যথেষ্ট সম্পর্ক থাকে। প্রতিষ্ঠানের অসুবিধার সময় এদের সমন্বয় সাধন যথেষ্ট ও কর্মিবর্গের কাজের সাথে এদের যথেষ্ট সম্পর্ক থাকে। প্রতিষ্ঠানের অসুবিধার সময় এদের সমন্বয়-সাধন যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। প্রশাসনের মূল্যমান বৃদ্ধি করতে হলে এইসব সহায়কগোষ্ঠীকে অস্বীকার করা যায় না। অবশ্যই বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়। প্রশাসনের মূল্যমান বৃদ্ধি করতে হলে এইসব সহায়কগোষ্ঠীকে অস্বীকার করা যায় না। অবশ্যই বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রেক্ষিতে কর্মধারার কার্যাবলী ও সহায়ক গোষ্ঠীর কার্যাবলী এবং কর্মিবর্গ ও সহায়ক গোষ্ঠীর কর্মপরিধির আলোচনার প্রেক্ষিতে কর্মধারার কার্যাবলী ও সহায়ক গোষ্ঠীর কার্যাবলী এবং কর্মিবর্গ ও সহায়ক গোষ্ঠীর কর্মপরিধির সুস্পষ্ট পার্থক্য মনে রাখা দরকার। কর্মধারার কার্যাবলী ও সহায়কগোষ্ঠীর কার্যাবলীর কতকগুলি পার্থক্য দেখা যায় ঃ

১. কর্মধারার কার্যাবলী নিজের উদ্দেশ্যের মাঝে সীমাবদ্ধ, সহায়ক গোষ্ঠীর কাজ তাদের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যায় মাত্র।

২. কর্মধারার নিয়ন্ত্রকদের স্থির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কাজ থাকায় তাদের সাফল্য নির্ভর করে তাদের কাজের পরিসমাপ্তিতে এবং এতে কোন আয়-ব্যয়ের কথা ওঠে না। কিন্তু সহায়ক গোষ্ঠীর কাজের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমস্যা অবশ্যই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

৩. সহায়ক গোষ্ঠী কখনই জনসাধারণের জন্য কাজ করে না, কিন্তু জন-প্রশাসনের বিভিন্ন প্রাথমিক দপ্তরের অনুসারী হয়েই এরা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে।

৪. কর্মধারার সাফল্য ও দক্ষতা নির্ভর করে এই সব সহায়ক গোষ্ঠী কিভাবে দ্রুত ও দক্ষতার সাথে কাজ করে তার ওপর। অন্যথায় কর্মধারার কাজে শ্লথতা ও দক্ষতার অভাব দেখা দেয়।

কর্মিবর্গ ও সহায়ক গোষ্ঠীর কাজের মধ্যেও অনেক সময় পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পার্থক্যগুলি ঃ

১. কর্মিবর্গের চরিত্র স্বভাবতই পরামর্শদানকারী কিন্তু সহায়ক গোষ্ঠী বাজেট নির্ধারণ, নিযুক্তিকরণ, পরিকল্পনা ইত্যাদিতে সাহায্য করে থাকে।

২. কর্মিগর্ব চিন্তন, পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শদান ইত্যাদি করে থাকে। কিন্তু সহায়ক গোষ্ঠী কাজের ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে, যেমন—দ্রব্যাদি ক্রয়, কর্মী নিয়োগ, দ্রব্যাদির যোগান ও মজুত করা ইত্যাদি। এখানে সহায়কগোষ্ঠী কখনই কর্মিবর্গের মত পরামর্শ দানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়।

৩. সহায়ক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হ'ল স্থায়ী দপ্তরগুলি ও তাদের কার্যাবলী চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। অন্যদিকে কর্মিবর্গ সংগঠন ও তাদের কর্মপদ্ধতি সংস্কার ও পরিবর্তন বিষয়ে চিন্তা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ (Central Advisory Board of Education) ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারে শিক্ষা ব্যাপারে উপদেশ দিতে পারে কিন্তু সহায়কগোষ্ঠী কোন ব্যাপারেই এধরনের উপদেশ দান করতে পারে না।

অনেক প্রশাসনবিদ্ মনে করেন কর্মিবর্গ ও সহায়কগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য খুব বেশীদূর টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না। কারণ উভয়েরই প্রধান শাসকের কাছাকাছি অবস্থান করে। এই উদ্দেশ্যে অনেকেই এদের একসাথে "সহায়ক কর্মিগোষ্ঠী" (Auxiliary Staff) বলে অভিহিত করে। অধ্যাপক উইলেবি এদেরকে আবার 'গার্হস্থ্য কর্মগোষ্ঠী' (House-Keeping) বলেছেন। যাই হোক প্রশাসনে ঐক্য ও সমন্বয় সাধনে এই সমস্ত আনুভূমিক (Horizontal) গোষ্ঠীর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। অধ্যাপক হোয়াইট বলেছেন, 'বিশেষ প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে এই ধরণের সহায়ক গোষ্ঠীর স্থাপনা করা যায়। এটা অবশ্যই ভুললে চলবে না যে, সহায়কগোষ্ঠীর প্রকৃতি মূলত সাহায্যকারী তাই কখনই নিয়ন্ত্রণকারী বা অযথা হস্তক্ষেপ করা নয়। তাঁর নিজের কথায়, "The case for establishing an auxiliary agency is primarily facilitating rather than controlling or unduly interfering."

৬.৫ কর্মধারা ও কর্মিবর্গের বিরোধ

ধ্রুপদী বা সাবেকী প্রশাসনতত্ত্বে কর্মধারার কার্যাবলীর প্রাধান্য স্বীকার করা হয়ে থাকে এবং কর্মধারা ও কর্মিবর্গের মধ্যে কোন কোন বিরোধের সূচনা দেখা যায় না বললেই চলে। কিন্তু আধুনিক প্রশাসন তত্ত্বে এদের মধ্যে একধরণের তাত্ত্বিক বিরোধের অস্তিত্ব প্রায়ই প্রকট হয়ে ওঠে। নানাভাবে এই দুই কর্মিসংস্থার দ্বন্দ্বকে ব্যাখ্যা করা যায় : ক. কর্মধারার নিয়ন্ত্রকগণ কর্মিবর্গকে আইনী ক্ষমতার অন্যায় দখলদার হিসাবে সমালোচনা করেন। প্রধান প্রশাসকের খুব কাছের বলে কর্মিবর্গ এই সমালোচনা অনেক সময়ই ভ্রূক্ষেপ করে না। খ. কর্মধারার নিয়ন্ত্রকগণ প্রায়ই কর্মিবর্গের কার্যাবলীকে অবাস্তব পরিকল্পনা ও ধারনা বলে অভিযোগ করেন। কর্মিবর্গ বাস্তব থেকে দূরে থাকে আর কর্মধারা নিয়ন্ত্রকগণ বাস্তবের কাছাকাছি থাকে এটাই উভয়ের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করে। কর্মিবর্গের নিরপেক্ষতা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে কর্মধারার নিয়ন্ত্রকগণ সন্দেহ প্রকাশ করে। এই করণে প্রশাসনে কোন সংকট সৃষ্টি হয়ে কর্মীবর্গকেই অভিযুক্ত করা হয়। গ. অন্যদিকে কর্মিবর্গ অভিযোগ করেন যে, কর্মধারার পরিচালকগণ একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলে এবং কর্মিবর্গ যে সমস্ত পরামর্শ দিয়ে থাকে সে সমপর্কে এই পরিচালকগণ কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। অন্যদিকে প্রশাসন কোন জটিলতার সৃষ্টি হলে কর্মধারার পরিচালকগণ কর্মিবর্গকে দোষারোপ করতে থাকেন এবং প্রায়ই নিজেরা দায়িত্ব অস্বীকার করে। প্রশাসনের ক্রিয়াকর্মে কর্মধারার পরিচালকরা মোটামুটি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর অংশীদার। এইজন্য কর্মিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন চিন্তা এবং মতামতকে এরা অবিশ্বাস করে।

সরকারী ক্ষেত্রে উল্লিখিত দোষারোপ প্রায়শই দেখা যায় এবং এজন্যেই কর্মধারা ও কর্মিবর্গের বিরোধে সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়। কার্যক্ষেত্রে দোদুল্যমান অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রায়শই ভুলবোঝাবুঝি হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ একথা প্রায়ই শোনা যায় যে, কর্মধারার অন্তর্গত ইঞ্জিনীয়াররা মানুষের উপকারের জন্য যখন একটা সুষ্ঠু প্রকল্পের খসড়া করে তখন এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থযোগানে কর্মিবর্গের অন্তর্গত অর্থদপ্তর দিনের পর দিন কালক্ষেপণ করে। বোঝাপড়ায় যত অসুবিধেই থাকুক না কেন কর্মধারা ও কর্মিবর্গের ধারনা আধুনিক-শাস্ত্রে বহুল প্রচলিত। প্রশাসন শাস্ত্রে এই দুই ধরনের ধারনার ভূমিকার সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ণয় ও এদের ঐক্য প্রশাসনের দক্ষতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। যখন থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রশাসনে বিশেষ ভূমিকা নিতে শুরু করেছে তখন থেকেই কর্মধারা ও কর্মিবর্গের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ চিন্তার সূত্রপাত। নতুন ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো বা বহুধরনের সংগঠনের ধাঁচ পুরোনো কর্মধারা ও কর্মিবর্গের বিরোধ সমকালীন প্রযুক্তিযুগের জটিলতাকে দূরীভূত করার চেষ্টা করে চলেছে। এছাড়াও আজ অনেক প্রশাসনতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, এই দু-ধরনের প্রশাসনিক কার্যাবলীর বিরোধ ক্ষমতার বিরোধ না হয়ে যদি উন্নত প্রশাসনের দিক্‌নির্দেশ করে তবে এই দ্বন্দ্ব সংগঠনের সমস্যা সমাধানে অভিপ্রেত অবশ্যই এ বিষয়ে প্রধান পরিচালকের দূরদৃষ্টি ও বিবেচনাবোধ প্রশাসনিক সাফল্যের প্রধান শক্তি।

৬.৫.১ ভারতে কর্মধারার কার্যাবলী ও কর্মিবর্গের কার্যাবলীর আলোচনা

প্রায় প্রত্যেক দেশেই প্রশাসনিক সংগঠনে দায়িত্ব অনুসারে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর কাজের ভার দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যেই সাধারণত কর্মধারা নিয়ন্ত্রক (Line Services) ও কর্মিবর্গ (Staff Services) নামে দায়িত্বানুসারে প্রশাসনিক কাজে দুটি গোষ্ঠীর প্রচলন আজও আছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যদিও এদের ধরন পরিবর্তিত হয়ে থাকে। ভারতীয় প্রশাসন কাঠামো তা সরকারী বা বেসরকারী যা হোক না কেন তাতে এই দুই ধরনের সংস্থার প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য কর্মধারার কার্যাবলীর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের কাজের নিয়ন্ত্রকরা জনসাধারণের সঙ্গে মুখোমুখি ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে চলে। সরকারী প্রশাসনে এই ধরনের গোষ্ঠী সরকারী কাজের সুযোগ সুবিধা বণ্টন করে এবং বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প রূপায়ণ করে। ভারতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম, যানবাহন, রেলপথ, যোগাযোগ ব্যবস্থা সমাজ উন্নয়ন ও শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহকে কর্মধারা-সংস্থা বলে ধরে নেওয়া হয়।

এটা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে ভারতে কর্মিবর্গ প্রধান পরিচালককে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। প্রশাসনের কাজে প্রধান কর্তৃত্বের আদেশ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের কাজ যথেষ্ট পরিমানে নির্ভর করে কর্মিবর্গ বা Staff Services-এর উপর। কর্মিবর্গের এই ভূমিকার ফলে প্রধান পরিচালক তার দায়িত্ব থেকে অনেকটাই রেহাই পান। শুধু তাই নয় তিনি অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সময় ও উৎসাহ সহকারে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন। ভারতে প্রধান মন্ত্রী দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় এবং দু'একটি বিশেষ কাজ ছাড়া অধিকাংশ কাজই কর্মিবর্গের উপর ন্যস্ত করেন। মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেটে বিভিন্ন দপ্তর কিভাবে পরিচালিত হয় সে ব্যাপারে সংবাদ সরবরাহ করা, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপায় নির্ধারণে প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য করতে এই কর্মিবর্গই অগ্রণীভূমিকা নিয়ে থাকে। কর্মিবর্গ বা (Staff Services কখনই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, তারা প্রধান প্রশাসককে সাফল্যের সাথে ও দ্রুতগতিতে কিভাবে কাজ করা যাবে তারই উপায় নির্দেশ ও সহযোগিতা করে

থাকে। ভারতে পরিকল্পনা কমিশন এমন একটি সহযোগী কর্মী সংস্থার নিদের্শন। বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনা গ্রহণে সময়মত পরামর্শ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান সরবরাহ ও বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে প্রশাসনকে সাহায্য এই পরিকল্পনা কমিশন বা Planning Commission এর বিশেষ কাজ। এছাড়াও উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যায় যে মন্ত্রীপরিষদে সচিব স্তরে মিটিং-এর ব্যবস্থা করা, রিপোর্ট লেখা ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ক্রিয়াকলাপের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা কর্মিবর্গের বিশেষ কাজ। এ সমস্ত ছাড়াও কর্মিগর্বের কাজ বলতেও বোঝায় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কাজ, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক সতর্কতা রক্ষা বিষয়ক বিভাগ, অর্থদপ্তরের অধীন বাজেট প্রনয়ণ ও অন্যান্য অর্থনীতি বিষয়ক কার্যাদি।

উপযুক্ত নিদর্শনগুলি অনুধাবন করলে দেখা যায় অধ্যাপক আরউইক এর কথামতের প্রতিফলন। এই মত অনুসারে ভারতের কেন্দ্রীয় স্তরে কর্মিবর্গ, প্রধান প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ব্যক্তির বিস্তৃতি। অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হয় যে সময় (time) ও এলাকা (space)-এর পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারতেও কর্মধারা ও কর্মিবর্গের ভূমিকা ও এদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পর্কে অনুভূতি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো ধ্রুপদী বা সাবেকী জন-প্রশাসনবিদ্‌দের মত কর্মধারা নিয়ন্ত্রকগণ কর্মিবর্গের উপরে বেশী কর্তৃত্ব করতে পারে না। ভারতে কেন্দ্র-রাষ্ট্র সম্পর্কের ব্যাপারে সারকারিয়া কমিশন (Sarkaria Commission) অনুসারে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিন্যাস বাড়লে কমিবর্গের সংখ্যাও বাড়বে এবং সময়ের তাগিদে শিল্প ও প্রযুক্তিতে ক্রমশঃ বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন কর্মিগোষ্ঠী বৃদ্ধি পাবে। সাইমনের ভাষায় বলা যায় সময় ও কর্মক্ষেত্রের এই সব পরিবর্তনের ফলে "কর্মধারার নিয়ন্ত্রণের জোর কার্যকরী সংস্থার মাধ্যমে কমতে থাকে।" ("The strength of line controls through the operating agencies has necessarily been reduced.")। এই সমস্ত কারণেই ভারতে আজ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রধান সমস্যা কর্মধারা-কর্মিবর্গ বিরোধের সংকট (Line-Staff conflicts) কমিয়ে সমন্বয়ের ভাবধারা প্রতিষ্ঠা করা।

৬.৬ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। জনপ্রশাসন তত্ত্বে POSDCORB শব্দটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়?

২। পিটার সেলফ তাঁর তত্ত্বে কিভাবে মুখ্যপ্রশাসকের ভূমিকার আলোচনা করেছেন?

৩। প্রশাসনিক তত্ত্বে কর্মধারা (Line) এবং কর্মিবর্গ (Staff) ধারনার উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪। কর্মধারা ও সহায়ক গোষ্ঠীর কার্যাবলী এবং কর্মিবর্গের ও সহায়ক কর্মপরিধি পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৫। কর্মধারা ও কর্মিবর্গের বিরোধের মূল কারণগুলি আলোচনা করুন।

৬। ভারতবর্ষে কর্মধারা ও কর্মিবর্গের বিরোধের ক্ষেত্রগুলিকে কিভাবে চিহ্নিত করা যায়।

একক ৭ ❑ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ প্রস্তাবনা

৭.২ কেন্দ্রীকরণের অর্থ

৭.২.১ কেন্দ্রীকরণের সুবিধা

৭.২.২ কেন্দ্রীকরণের অসুবিধা

৭.৩ বিকেন্দ্রীকরণ ঃ অর্থ ও সংজ্ঞা

৭.৩.১ বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা

৭.৩.২ বিকেন্দ্রীকরণের অসুবিধা

৭.৩.৩ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের তুলনামূলক আলোচনা

৭.৪ সর্বশেষ অনুশীলনী

৭.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- কেন্দ্রীকরণের অর্থ, প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা
- বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা ও অসুবিধা
- কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের তুলনামূলক ব্যাখ্যা

৭.১ প্রস্তাবনা

সংগঠনের বিন্যাসে ক্ষমতার অবস্থিতি ও পরিমিতি একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়। সংগঠনে ক্ষমতা কতটা কেন্দ্রস্থ বা কেন্দ্রাভিমুখ ও কতটা কেন্দ্রাতিগ বা কেন্দ্রবর্হিমুখ থাকবে, এই নিয়েই সমস্যার সৃষ্টি। অবশ্য কোন সংগঠনেই ক্ষমতা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত বা সম্পূর্ণ কেন্দ্রতিগ থাকবে তা সম্ভব নয়। যে সংগঠনে কেন্দ্র যখন আধিপত্য ও ক্ষমতার বেশী ঝোঁক দেখা যায় তাকে কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা ও যে সংগঠনে যখন প্রতিযোগিতা ও স্বাতন্ত্র্যের

মাধ্যমে ক্ষমতার বিচ্ছুরণের ঝোঁক দেখা যায় তখন তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়ে থাকে। বিকেন্দ্রীকরণে কাজের এলাকা বা Space একটি বিশেষ উপাদান হিসাবে লক্ষিত হয়। একারণেই দেখা যায় সংগঠন যখন ছোট থাকে তখন কেন্দ্রস্থ আধিপত্যই কার্যকরী হয়ে থাকে। ধ্রুপদী বা সাবেকী জনপ্রশাসন তাত্ত্বিকদের অধিকাংশ স্বল্পাকারের সংগঠনের ভিত্তিতে কেন্দ্রিক আধিপত্য ও সেই সূত্রে প্রধান কর্তৃপক্ষ ও কর্মধারা (Line)-র বিশেষ প্রভাব কর্মিবর্গের (Staff)-র ওপর ন্যস্ত করেছেন। যাই হোক, আধুনিক জনপ্রশাসন তত্ত্বে এটি স্পষ্ট যে সংগঠনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যা অতি প্রকট।

রাজনৈতিক কাঠামোর সাথেও সাংগঠনিক কাঠামোর উল্লিখিত রূপায়ণ ও পরিবর্তন সম্পৃক্ত। এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা যে দেশে সফল, সংগঠনের কাজে কেন্দ্রীয় আধিপত্যের প্রাধান্য সেখানে কার্যকরী। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা যে দেশে কার্যকরী সংগঠনের কাজে বিকেন্দ্রীকরণ সেখানে বিশেষভাবে সফল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ব্রিটেনে এককেন্দ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা জনপ্রশাসনে কেন্দ্রীকরণ ও সমন্বয়কে প্রতিফলিত করে। অন্যদিকে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুসারে সেখানে প্রশাসনে বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য এবং বিকেন্দ্রীকরণ স্পষ্ট। সবশেষে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এর অর্থ এই নয় যে, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার দেশে বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের অভাব (ব্রিটেনে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনব্যবস্থার ফলে যথেষ্ট বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে), আর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দেশে প্রশাসনে সমন্বয় ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অবহেলিত। অধ্যাপক গালিফের মত কাজের এলাকা-ভিত্তিক প্রশাসনের উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ সত্ত্বেও কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনমত ভারসাম্যরক্ষা প্রশাসনিক কাজের সফল পদ্ধতি বলেই ধরে নিতে হবে।

৭.২ কেন্দ্রীকরণের অর্থ

প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ বলতে বোঝায় যখন সংগঠনে ঊর্দ্ধতম ও অধঃস্তনদের মধ্যে বা নিয়ন্ত্রক বা নিয়ন্ত্রিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। অন্য অর্থে বলা যায় যে, প্রধান কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত খুব সহজেই নিম্নস্থ কর্মীবর্গ অনুসরণ করে চলে। অধ্যাপক হোয়াইট বলেন, 'সংগঠনের নিম্নস্তর থেকে সরকারের উচ্চস্তর পর্যন্ত প্রশাসনিক আধিপত্যের গতায়াতই' ('the process of transfer of administrative authority from a lower to a higher level of government') কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের লক্ষ্য। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সুশৃঙ্খল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও জাতীয় সংহতির তাগিদে কেন্দ্রীভূত পরিচালন ব্যবস্থা প্রশাসনের প্রয়োজন। ধ্রুপদী বা সাবেকী জন-প্রশাসন শাস্ত্রে কেন্দ্রীকরণ একটি আনুষ্ঠানিক নীতি। এছাড়াও স্তরবিন্যস্ত প্রশাসন ব্যস্থা, আদেশের ঐক্য ও নিয়ন্ত্রণের এলাকা প্রভৃতি প্রশাসনিক পদ্ধতির সুরক্ষায় কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন। সংগঠনের কর্মীদের নিয়োগ, নীতি এবং আয়-ব্যয় ও পরিকল্পনার জন্যও প্রশাসনে এই ধরনের চাপের প্রয়োজন। জে. ডি. মিলেট (J. D. Millett) সুসংহত সংগঠনের স্বার্থে কেন্দ্রীকরণকে অপরিহার্য মনে করেন। মিলেটের মতে প্রশাসনে শৃঙ্খলা, প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ ও সংগঠনের প্রশাসনকে নীতির স্থায়িত্বের স্বার্থে কেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য। পিটার সেলফ (Peter Self)-এর মতে প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণে চাপ সর্বাত্মক। বিশেষত তিনটি কারণে এই দাবিকে অবহেলা করা যায় না ঃ ক. যতটা মাত্রায় প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে ঠিক ততটা পরিমাণে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ থেকে অব্যাহতি

পাবার জন্য কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। খ. সংগঠনের ক্ষেত্রে অর্থ বন্টনে সমতার জন্য কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ ভারতের মত যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আর্থিক ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ দেখা যায়। গ. পিটার সেলফ (Peter Self) মনে করেন সমকালে প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতিকে কাজে লাগানো জরুরী। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে উদ্ভূত প্রযুক্তি বন্টনের প্রয়োজন আবশ্যিক। এবং এই সমুদয় বিষয়ের তথ্য ও পরিসংখ্যানগত আলাপ-আলোচনাও বিশেষ প্রয়োজন। এই সব উপাদানগুলিই কেন্দ্রীকরণ প্রশাসনের সাফল্যের চাবিকাঠি।

সংগঠনের সামগ্রিক স্বার্থের জন্য কেন্দ্রীকরণের নীতিকে একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করলেও এবং আদেশের ঐক্য, নিয়ন্ত্রণ এলাকার সংহতি প্রভৃতির জন্য এর প্রয়োজন স্বীকার করলেও কেন্দ্রীকরণই যে প্রশাসনের একমাত্র নীতি একথা অনেকেই স্বীকার করেন না। একারণেই কেন্দ্রীকরণের সুবিধা অসুবিধাগুলি আলোচনার প্রয়োজন।

৭.২.১ কেন্দ্রীকরণের সুবিধা

সমকালে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্নতা দেখা গেলেও প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা হল ঃ ১. প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের সংগঠনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সমর্থ। প্রশাসনে দক্ষতার অভাব বিনষ্টি ও অযথা অনুগ্রহ প্রদর্শনের সংশোধক কেন্দ্রীকরণের নীতি। ২. কেন্দ্রীকরণের একটি বিশেষ সুফল প্রশাসনে সমরূপতা একই পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের সর্বত্র প্রশাসন চলতে থাকে। ৩. কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় ক্রয় পদ্ধতি ও ব্যক্তির নিয়োগের ব্যাপারে কোন অপব্যবহার ঘটতে দেখা যায় না। ৪. মাথাপিছু খরচ কম হয় বলেই প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণে অর্থনৈতিক সুবিধা দেখা যায়।

৭.২.২ কেন্দ্রীকরণের অসুবিধা

১. কেন্দ্রীভূত প্রশাসন দূরের স্থানিক অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত থাকে না অথচ সমরূপতার ওপর জোড় দেয় ফলে প্রশাসনে দক্ষতার অভাব ও নানাধরনের অসুবিধা ঘটে থাকে। ২. কেন্দ্রীকরণ সংগঠনের বিভিন্ন ধরনের জটিলতা ও সংকটের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকারিতায় বিলম্ব ঘটায়। ৩. প্রশাসনের কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত পরিমানে কাজের চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকেন। এইভাবে কাজের দায়িত্ব এক এক সময় এমন বাড়তে থাকে যে, অতিরিক্ত চাপের মুখে সংগঠন ভেঙ্গে পড়ার অবস্থায় পৌছায়। ৪. কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা প্রধান কার্যালয় অনেক সময়ে স্থানিক অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত থাকে না, ফলে সিদ্ধান্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে অযথা বিলম্ব ঘটতে থাকে। ৫. কেন্দ্রীকরণে প্রশাসনে নমনীয়তার অভাব দেখা যায়।

উপযুক্ত সুবিধা ও অসুবিধাগুলির বিচারেই প্রশাসনের অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়। প্রয়োজন, সময় ও ক্ষেত্রে এই

সুবিধা ও অসুবিধার বিচার বিশেষ কার্যকরী। অন্যথায় কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার ফলে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ যান্ত্রিকতায় পরিগণিত হয়। অনুষ্ঠান সর্বস্বতাই বিশেষ রূপ হিসাবে দেখা দেয়। এধরনের প্রশাসনের আমলাতান্ত্রিকতার প্রকট প্রকাশ দেখা দিতে পারে। একথা স্পষ্ট হয় যে, এই প্রশাসনিক ধাঁচে পরিবেশের উপর প্রয়োজনীয় নজর রাখা হয় না। সবশেষে বলা যায় যে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণ বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই প্রশাসনিক নীতি বেশী ব্যবহৃত হলে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বিঘ্নিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় সামগ্রিক কাঠামো সংকটের মুখে পড়ে। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। এই ধরনের সংকটের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে লিখিত কতকগুলি অনুশাসন প্রশাসনকে সংহত রাখে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যে প্রশাসনিক পদ্ধতির বিভাজনে অনেক সময় বিরোধ দেখা দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত সংবিধানের নির্দেশই বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটাবার রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহৃত। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতেও কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা আজও দেখা যায়। যুদ্ধ, প্রতিরক্ষা, আর্থিক-সংকট, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য নবউদ্ভূত উন্নত প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি হতে সংহতি রক্ষার উপায় হ'ল প্রশাসনে কেন্দ্রীকরণের নীতির প্রয়োগ। উপরোক্ত কারণগুলির জন্যেই আমেরিকার মত আদর্শ যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও এই শতাব্দির ত্রিশ-এর্ দশক থেকেই এই কেন্দ্রপ্রবণতা অতিমাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৭.৩ বিকেন্দ্রীকরণ ঃ অর্থ ও সংজ্ঞা

বিকেন্দ্রীকরণ কেন্দ্রীকরণের বিকল্প প্রশাসন পদ্ধতি। আবার, বিকেন্দ্রীকরণ কেন্দ্রের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এটি সহায়ক উপায়ও বটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি প্রশাসন বিজ্ঞানে বিশেষভাবে প্রচলিত নীতি হিসাবে প্রচলিত। সুইডিশ অর্থনীতিবিদ্ গুনার মিরডাল (Myrdal) বলেছেন পৃথিবীতে ভবিষ্যতে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মধ্যে কোন ব্যবস্থা কায়েম হবে তারই ওপর নির্ভর করবে কোন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের পদ্ধতি সফলভাবে কার্যকরী হবে। ডিমক ও ডিমক (Dimock and Dimock) তাই মনে করেন, "বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন সবজায়গাতেই সৃষ্টিশীল উদ্যোগী প্রশাসন" (ডিমক ও ডিমকের কথায় "Creative, spirited administration is everywhere decentralised administration.) জন-প্রশাসনের তাত্ত্বিকরা অধিকাংশই মনে করেন বিকেন্দ্রীকরণ একটি জটিল অবস্থা। সঠিক মাত্রায় প্রশাসনিক কর্তৃত্বকে কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অর্পণ করাই হল বিকেন্দ্রীকরণ। ক্ষমতার এই বিন্যাস কখনই বিশৃঙ্খল হবে না। কেন্দ্র ও অঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই এই বিভাজন ঘটবে। প্রশাসন-তত্ত্ববিদ্‌দের মতে বিকেন্দ্রীকরণ সংগঠনের অভ্যন্তরে আন্তঃসাংগঠনিক বিভাজনের (an intra-organisational differentiation) এক প্রক্রিয়া। এইভাবে সমকালে গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ থেকে সম্প্রসারণের সাথে সাথে বিকেন্দ্রীকরণের ধারনা সৃষ্টি হয়। সংগঠনে বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায় যেমন ঃ (১) যখন সংগঠনের নিম্নস্তরে অধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় ; (২) এই নিম্নস্তরের সিদ্ধান্তগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ; (৩) নিম্নস্তরের সিদ্ধান্তগুলি দ্বারা সংগঠনের বেশির ভাগ কাজই প্রভাবিত হয় ও (৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিয়ন্ত্রণের আধিক্য থাকে না। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত-করণের দিক থেকে উপর্যুক্ত মাত্রাগুলির মধ্যেই বিকেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

সাংগঠনিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে ভৌগোলিক এলাকায় সংগঠনের বিভিন্ন দপ্তরের বিন্যাস ও তাদের ওপর কর্তৃত্ব অর্পণ বোঝায়। এলাকা (Space) ও শাসনের বিভিন্ন দপ্তর বা একক (unit)-এর মধ্যে আনুপাতিক হারে সাফল্যের জন্য ক্ষমতার বন্টনকে বিকেন্দ্রীকরণে মূল ধারণা বলা যায়। এলাকা মাফিক বিন্যাসের দিক থেকে রাজ্য-প্রশাসনের অংশ হিসাবে জেলা-প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন বা ব্লক-প্রশাসনের বিভাজনকে বিকেন্দ্রীকরণের নিদর্শন বলে ধরা যায়। কেন্দ্রীয় কার্যালয় দূরে অবস্থিত মানুষের সাহায্য করার জন্য এই এলাকা ও এককের সরকারী বিভাজন ও ক্ষমতা প্রত্যর্পণ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা প্রত্যর্পণের মাঝে বিশেষ পার্থক্য বর্তমান। ক্ষমতা প্রত্যর্পণের ফলে আঞ্চলিক সরকারের কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বের অধীন কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের ফলে আঞ্চলিক সরকারের কর্তৃত্ব স্বাধীনভাবে অর্পিত ক্ষমতার ফল।

অনেক সময় স্বীকৃত না হলেও জেমস ফেসলার (James Fesler) মনে করেন যে, বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্ব বা ধারনা এবং তার প্রয়োগ যথেষ্ট জটিল। ফেসলারের নিজের কথায়, "The issues of decentralisation is more complex in concept and practice than is generally acknowledged." ফেসলার (Fesler) আরও মনে করেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জনপ্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণকে সরকারের বিভিন্ন বিভাজন পদ্ধতি হিসাবে মনে করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জনপ্রশাসনের এই সমান্তরাল বিভাজনের ধারাকে ফেসলার চার ভাগে ভাগ করেছেন ঃ এক, তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী (doctrinal approach)—এই দৃষ্টিভঙ্গীতে 'রোমান্টিক আদর্শবাদের' ('romantic idealisation') দৃষ্টিতে বিকেন্দ্রীকরণকেই চূড়ান্ত পরিণতি বলে মনে করা হয়। 'অন্তর্কেন্দ্রীক বৃত্তের' (concentric) সাহায্যে ক্ষমতা বণ্টনের সাহায্যে বিকেন্দ্রীভূত পঞ্চায়েতীরাজের সৃষ্টির ফলে গান্ধীজীর গ্রাম-সমাজ একটি আদর্শ সমাজ ও বিকেন্দ্রীকরণ একটি আদর্শ তাত্ত্বিক মতবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী (Political approach)—এই পদ্ধতি বিকন্দ্রেকীরণের রাজনৈতিক চরিত্র উদঘাটন করে। বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ এবং বিকেন্দ্রীভূত এককগুলিকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ করে স্ব-শাসিত কাঠামোয় কাজ করতে দেওয়া রাজনৈতিক ভাবে নির্দ্ধারণ করা হয়। কেন্দ্র থেকে দূরে আঞ্চলিক সরকারের ইউনিট গঠন বিকেন্দ্রীকরণের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এলাকাভিত্তিক এককগুলিকে এই ধরনের স্বশাসনের প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতি না দিলে ফেসলারের বিকেন্দ্রীকরণের ধারনা একটি 'অলীক বিকেন্দ্রীকরণে' ('illusory decentralisation') পর্যবসিত হবে। তিন, প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গী (administrative approach)—এই দৃষ্টিভঙ্গী বিকেন্দ্রীকরণের দক্ষতার দিকে আলোকপাত করে। প্রশাসনিক যৌক্তিকতার কথা মনে করে আঞ্চলিক সংগঠনগুলিকে সৃষ্টি করা হয় স্থানীয় স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য। সময়ের পরিবর্তনে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রশাসন এলাকায় বিশেষীকৃত কার্যাবলী ও সাধারণ কাজের সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধারণ কাজ ও বিশেষ কাজের মধ্যে মেরুকরণ ঘটতে থাকে। সমকালে ভারতেও এই ধরনের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনে সুস্পষ্ট কর্তৃত্বের ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কাজের মাঝে কোন পার্থক্য নির্ণয় নিশ্চিত নয়। এজন্য সময় থেকে সমান্তরে বিভিন্ন ধাঁচের কাজের মাঝে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় প্রশাসন এলাকায় তার সমাধান করা একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়। চার, দ্বৈত-ভূমিকা পদ্ধতি—এই পদ্ধতি, ফেসলার (Fesler) মনে করেন, পরিবর্তিত পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের কর্মগোষ্ঠীর কাজে সমন্বয়-সাধন প্রচেষ্টা। স্থিতাবস্থার পরিবর্তে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের এক ব্যাপক পটভূমিকায় বিকেন্দ্রীকরণের

আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দ্বৈধতার এই পদ্ধতি প্রশাসনের ভাষায় ঐতিহ্য ও পরিবর্তনের দ্বন্দ্বকেই বোঝায়। স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, রাজস্ব আদায় করা ও অবস্থার অবনমন রোধ করাই ছিল আগের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল কথা। কিন্তু ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে যে সমস্ত দেশ উন্নয়নের পথে যেতে চায় তারা খুব দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন চায় এবং এর ফলে বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক প্রশাসনে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তন অবশ্যই স্থিতাবস্থার বিরোধী। এই ধরনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশাসনের দুই ধরনের ধাঁচের মাঝে সংকটের সমন্বয় সাধন বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিশেষ করণীয় কর্তব্য। ভারতে প্রশাসনের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে জেলা-প্রশাসনে এই প্রবণতা আজ প্রায়ই দেখা যায়।

সমকালে বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান চিন্তা ক্ষমতার সমীকরণ ও অংশ গ্রহণের প্রশ্নে। গোড়ার দিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংগঠন-তত্ত্ব খুব কমই মুখোমুখি হত কিন্তু আজ গণতান্ত্রিক চেতনায় পুষ্ট এই উভয় জ্ঞানতত্ত্বই বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে প্রায়ই দেওয়া-নেওয়া করে থাকে। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে ছাড়িয়ে আজকের রাষ্ট্রকাঠামোয় অংশীদারী গণতন্ত্রের (Participatory democracy) চাহিদা বেশী ঠিক তেমনি আজকের বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনে অংশীদারী পরিচালনও বিশেষ কাম্য। এখানে বলা যায় বর্তমানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকের যেমন মঙ্গল সাধন হয় তেমনি বিকেন্দ্রীভূত সাংগঠনিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি-কর্মীর উপকার সাধিত হয়। আধুনিক সময়ের রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে জন-প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা এমনি করেই তাল রেখে চলেছে। এই সমস্ত চিন্তা করে সবশেষে বলা যায় যে সমকালীন চিন্তাধারায় বিকেন্দ্রীকরণের তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ১. কর্মী ও নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হিসাবে সাংগঠনিক কর্মে বিকেন্দ্রীকরণকে বিশেষ হাতিয়ার বলে আজ গণ্য করা হয়। ২. বিকেন্দ্রীকরণ সাংগঠনিক কাজকর্মের উন্নতির সহায়ক। জনপ্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ আঞ্চলিক সংবাদ ও তথ্য গ্রহণ সহজেই করতে পারে। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে পৌঁছায়। সংগঠনের বিভিন্ন একক বা শাখা জনগণের সমর্থনে সাংগঠনিক কাজকর্মে বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করে। ৩. সমকালীন চিন্তাধারা জনপ্রশাসনের ধারায় এক কাঠামোগত পরিবর্তন সূচনা করে। পুরোনো আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় এবং ধ্যানধারণার দ্বারা বর্তমানের রাজনীতি-প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রশাসন তত্ত্ববিদ টমশন (Thompson) বলেন ওয়েবারের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় মক্কেলের কোন সবিশেষ অবস্থিতি নেই। আসলে, বিকেন্দ্রীকরণ ও অংশীদারীত্বের বিতর্কই আজকের জনপ্রশাসনে নুতন ধারা গড়ে তুলতে ও পুনর্গঠনে সাহায্য করে। সবশেষে বলা যায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের জন্যে উন্নয়নের দাবি মেনে নেবার চেষ্টার মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ আজ একটি সৃষ্টিশীল প্রশাসনিক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। উপযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বিকেন্দ্রীকরণের কতকগুলি সুবিধা ও অসুবিধা দেখা যায়।

৭.৩.১ বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা

যেমন ১. বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থায় জনগণের নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ সম্ভব। ২. প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সংগঠন বিভিন্ন আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ৩. প্রশাসনে

বিকেন্দ্রীকরণ অবস্থায় বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রশাসনে নতুন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভব। ৪. বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও নিয়মের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রয়োগ করতে পারে ও কাজে সাফল্য আনতে সক্ষম। ৫. বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় খুব ভালভাবে যে কোন সংকটের মোকাবিলা করা সম্ভব কারণ এই অবস্থায় আঞ্চলিক সংগঠনে কর্তৃত্ব খুব দ্রুত প্রয়োজন অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই ব্যবস্থায় উচ্চতম কর্তৃপক্ষ কাজের চাপ থেকে অব্যাহতি পায় এবং তারা তাদের সময়কে সংগঠনের প্রধান সমস্যা ও প্রকল্পের জন্য চিন্তায় নিয়োগ করতে পারে। ৮. বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা আঞ্চলিক কর্মকতাদের নীতিবোধ ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব তাদের কার্যকারিতা ও দক্ষতায় আস্থা রাখে। এই বোধ তাদের কর্তব্যপরায়ণ ও অনুগত করে তোলে এবং আঞ্চলিক কর্মকর্তারা তাদের কার্যকারিতা ও মূল্য প্রমাণ করবার সুযোগ পায়।

৭.৩.২ বিকেন্দ্রীকরণের অসুবিধা

উল্লিখিত বিভিন্ন সুবিধার বাইরেও বিকেন্দ্রীকরণের কিছু অসুবিধারও নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন ঃ ১. বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও তার প্রয়োগ খুব কঠিন। বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্মকেন্দ্র বিভিন্ন ধরনের কর্মধারা অনুসৃত হতে দেখা যেতে পারে। ২. আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ প্রায়শই জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত থাকেন না। অধিকাংশ সময়ই তারা স্থানীয় সমস্যা নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত থাকেন যে কাজের ক্ষেত্রে তারা সঙ্কীর্ণমনা হয় দূরদৃষ্টির অভাব দেখিয়ে থাকেন। ৩. কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেই বিভিন্ন অভিযোগের উদ্ভব দেখা যায়। কর্মচারী নিয়োগ, আয়-ব্যয় নির্ধারণ, রাজস্ব আদায়, হিসাব-নিকেশ প্রভৃতির বেলায় কতটা পরিমাণ বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব বা উচিত তা স্থির করা যায় না। মাত্রার বাইরে স্বাধিকার প্রয়োগ করলেই এখানে কার্যগত অনুকল্পের (functional duplication) সৃষ্টি হতে পারে। এই মাত্রাতিরিক্ত কর্মপ্রবণতার জন্য কর্মক্ষেত্রে সংঘর্ষ সৃষ্টি হতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণের এই প্রয়োগগত সমস্যাই তার বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

৭.৩.৩ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের তুলনামূলক আলোচনা

পরিশেষে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণে তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়নের পর্বে কতকগুলি বিশেষ কথার পুনরুল্লেখ করতে হয়। যেমন (১) বিকেন্দ্রীকরণে অধিকসংখ্যক সিদ্ধান্তই আঞ্চলিক পর্যায়েই গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রধান কেন্দ্রীয় কর্মকেন্দ্রে। (২) বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের বা সংস্থার কর্তৃপক্ষদের বিচিত্র আঞ্চলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহুবিষয়ে সাধারণ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্যোগ নেবার সুযোগ আছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে এধরনের সুযোগ নেই বললেই চলে। (৩) বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় বিভিন্নক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্মকেন্দ্রগুলি নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। অন্যদিকে কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় প্রধান কর্মকেন্দ্র আদেশ জারি করে মাত্র। (৪) বিকেন্দ্রীকরণে আঞ্চলিক কর্মকেন্দ্রগুলি প্রধান কর্তৃত্বের অধীনে থেকেও দায়িত্বশীল একক বা শাখা হিসাবে কাজ করে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় বিভিন্ন দপ্তরগুলি প্রধান

কর্মকেন্দ্রের সংবাদ-বাহক হিসাবে কাজ করে থাকে। ফেজ্‌লার (Fesler) এধরনের আলোচনার সূত্রপাত করে বলেছেন, কোন ক্ষেত্রের কাজকর্ম কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণের দিকে ঝুঁকছে কিনা তা বোঝা যাবে এই বিচারে যে, সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তগ্রহণ করে থাকে সেই সব বিষয়ে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব আছে কিনা ফেজলারের নিজের কথায়, "Whether a given field service leans towards centralisation may be discovered from boservation of the importance of matters on which field officials have decision making authority, compared to matters wholly retained for head-quarters decision...."

সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে আবারও বলতে হয় যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ বা কেন্দ্রীকরণ হয়েছে কিনা তা স্থিতনিশ্চয় হয়ে বলা যায় না। বিকেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের পার্থক্য শুধুমাত্র মাত্রাগত। যদি কোন প্রশাসনে প্রধানকর্মকেন্দ্রে অধিক মাত্রায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে তাকে কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা আর যদি কোন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক কর্মক্ষেত্রে অধিক কর্তৃত্ব ও উদ্যোগের সুযোগ থাকে তবে তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা যায়।

কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যা সুক্ষ মাত্রা ও মাধ্যম বিচারের ওপর নির্ভর করে। এই সমস্যার কথা বিচার করে ফেজলার (Fesler) বলেছেন কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ কিভাবে সফল হবে তা নির্ভর করে গোটাকয়েক উপাদানের ওপর। যেমন কর্তৃত্ব ও আনুগত্য, প্রশাসনিক প্রয়োজন। কার্যগত উপাদান ও পরিবেশ প্রচেষ্টা বা চাপ কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণের রূপান্তর ঘটায়।

৭.৪ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। লুথার গালিফের মত উল্লেখ করে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের উপযুক্ত ভারসাম্য রক্ষার ভূমিকা কি দেখান।

২। কেন্দ্রীকরণ নীতি বলতে কি বোঝায়? এই সম্বন্ধে হে. ডি. মিলেট কি বলেন? এই বিষয়ে হার্বার্ট সাইমনেরই বা মত কি?

৩। কেন্দ্রীকরণ নীতি সম্বন্ধে পিটার সেলফ্‌ কি বলেছেন?

৪। সংগঠনে কেন্দ্রীকরণের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

৫। প্রশাসনিক স্তরে বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা ও অসুবিধার আলোচনা করুন।

৬। বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা প্রত্যর্পণের পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৭। জেমস্‌ ফেস্‌লার বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্বকে কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন?

৮। সমকালীন চিন্তা ধারায় বিকেন্দ্রীকরণের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৯। বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি?

১০। কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ সমস্যার সমাধান কল্পে ফেস্‌লার কথিত উপাদানগুলির উল্লেখ করুন।

একক ৮ ❑ ক্ষমতা প্রত্যর্পণ

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য

৮.১ প্রস্তাবনা

৮.২ প্রত্যর্পণ-এর অর্থ

৮.৩ প্রত্যর্পণের সুবিধা

৮.৪ প্রত্যর্পণের অসুবিধা

৮.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

৮.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৮.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- প্রত্যর্পণের অর্থ
- প্রশাসনে এর প্রয়োজনীয়তা
- প্রত্যর্পণের সুবিধা ও অসুবিধা

৮.১ প্রস্তাবনা

প্রশাসন শাস্ত্রের সংগঠন তত্ত্বে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ (Delegation) তত্ত্ব ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিজ্ঞানে যেমন কেন্দ্রীভূত শক্তির বিস্তীর্ণ এলাকায় (space) বিভিন্ন সময়ে (time) এবং বিভিন্ন বিন্দুতে (point) বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষের অনেক উপকার সাধন করা যায়, তেমনি প্রশাসন বিজ্ঞানে প্রশাসনের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে বিস্তৃত এলাকার (space) বিভিন্ন আঞ্চলিক দপ্তরের বা কেন্দ্রবিন্দুতে (point) প্রয়োজনীয় সময়ে (time) প্রত্যর্পণ করে কাজের গতি বাড়ানো যায়।

৮.২ প্রত্যর্পণ-এর অর্থ

এখানে ডেলিগেশন অর্থে 'প্রত্যর্পণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ সমাজ এবং একই অর্থে রাষ্ট্রও, প্রধান

কর্মকেন্দ্রে যে ক্ষমতা 'অর্পণ' করেছে তা আঞ্চলিক কেন্দ্র বা কোন দপ্তরে পুনরায় অর্পণ করা হচ্ছে। সংগঠনের কর্মক্ষেত্র যদি ছোট হয় তবে প্রত্যর্পণের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সংগঠনের কাজের এলাকা যদি বহু বিস্তৃত হয় তখন প্রধান কর্তৃপক্ষ তার ক্ষমতা বিভিন্ন স্তরে বা আঞ্চলিক সংগঠনে প্রত্যর্পণ করে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে নিম্নতম কর্তৃপক্ষকে এমনিভাবে ক্ষমতা অর্পণকে 'প্রত্যর্পণ' বলে। কিন্তু সামাজিক অর্থে প্রত্যর্পণ বলতে বোঝায় সংগঠনের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে প্রত্যর্পণ। এই প্রত্যর্পণ উচ্চ থেকে নিচ স্তরে বা পাশাপাশি স্তরেও হতে পারে। ক্ষমতা প্রত্যর্পণ অর্থ ক্ষমতার স্থানান্তর নয় বা ক্ষমতা পরিত্যাগও নয়। যে কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করে সে তার সমগ্র দায়িত্ব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে না, পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষমতা তার বজায় থাকে। ক্ষমতা প্রত্যর্পণকারী প্রয়োজনে ক্ষমতা সরিয়ে নিতেও পারে।

পরিচালন তত্ত্ববিদ্ জন মিলেট (John Millet) প্রত্যর্পণ অর্থে শুধু কাজের দায়িত্ব অর্পণের কথা বলেন নি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যখন অধস্তন কর্তৃপক্ষকে তার বিবেচনা অনুযায়ী বিশেষ সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করে তাকেই বিশেষ অর্থে প্রত্যর্পণ বলা হয়। এই অর্থে ডিমক ও ডিমক (Dimock and Dimock) শুধু কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিচালনা বা 'Management by Authority' নয়। এটি হল উদ্দেশ্যের পক্ষে পরিচালন বা 'Management by Objectives'-এর ফলে পরিচালন প্রক্রিয়া প্রশাসনের একটি দার্শনিক ডিমকের ভাষায় 'Management by objectives is so important as almost to be called a philosophy of administration." । ডিমক ও ডিমকের মতে প্রত্যর্পণের এই বিশেষ চরিত্রায়ণে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় : ক. প্রত্যর্পণ শুধু ঊর্ধ্বতন-অধস্তনের আদেশ ও আনুগত্যই বোঝায় না, বোঝায় পারস্পরিক সহযোগিতা। খ। প্রত্যর্পণ পরিচালনার তথাকথিত নীতিকেই বোঝায় না, বোঝায় প্রশাসন পরিচালনা, উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করা। গ. প্রত্যর্পণ সংগঠনের উদ্দেশ্য পৌঁছবার জন্য ক্ষমতা অর্পণের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মাত্রা নির্ধারণকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার কতকগুলি সুবিধা ও অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়।

৮.৩ প্রত্যর্পণের সুবিধা

সংগঠন যদি আকারে ছোট হয় তবে প্রত্যর্পণের প্রয়োজন পড়ে না। সংগঠন বৃহদাকৃতি হলে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন কার্যকরী সুবিধার সৃষ্টি হয় : ১. প্রত্যর্পণের সাহায্যে বৃহদায়তন সংগঠনে প্রধান কর্তৃপক্ষ ভারসাম্য বজায় রেখে বিভিন্ন স্তরকে ব্যবহার করতে পারে। এই ধরনের বড় সংগঠনে জটিলতার সৃষ্টি যাতে না হয় এবং মাথা-ভারি পরিচালন-এর (Top-heavy management) কুফল দূরকরবার জন্য প্রধান পরিচালক অন্যান্য অধস্তন কর্তৃপক্ষের হাতে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিচালনার ভার অর্পণ করে থাকে। সংগঠনের বিস্তৃত এলাকায় যে সময়ে যে ব্যক্তির দরকার সংগঠনের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তার বিস্তৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে প্রত্যর্পণের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাজের চাপ কমতে থাকে। কর্মীরা প্রয়োজনীয় প্রধান দায়িত্ব আরও বিশেষভাবে পালন করতে পারে। এইভাবে সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত সুষ্ঠু এবং কার্যকর যোগাযোগ সম্ভব

হয়। কেননা আজকের পরিচালন ব্যবস্থায় সার্থকতার জন্য প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন। ২. প্রত্যর্পণ ক্ষমতা বণ্টনের সাথে সাথে বিভিন্ন স্তরে দায়িত্বও অর্পণ করা হয়ে থাকে। দায়িত্বের সাথে সাথে স্বাতন্ত্র ও স্ববিবেচনা অনুসারে কাজ করতে হয় বলে অধস্তন কর্তৃপক্ষ কাজে উদ্যোগী হয়। নিজের কর্মশক্তিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে কাজের উৎকর্ষ সাধন করে থাকে। এর ফলে অধস্তন কর্তৃপক্ষের নিজের প্রতি বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যর্পণের বিশেষ সুবিধা হল সর্বস্তরের দায়িত্ব ও কুশলতা বৃদ্ধি। ৩. প্রত্যর্পণের ফলে সর্বস্তরে প্রয়োজনানুসারে ক্ষমতা বিন্যস্ত হওয়ায় সংগঠনের কাজের মান উন্নত হয়। কারণ কাজে অপচয় বন্ধ হয় এবং কর্মসংগঠনে দক্ষতা ও দ্রুততা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ৪. নিয়ন্ত্রণের ঐক্য যদি সংগঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয় তবে প্রত্যর্পণ একাজে বিশেষ প্রয়োজন। কে কোন্ এলাকায় কোন্ সময়ে কোন্ কাজ বিশেষভাবে দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত সম্পাদন করতে পারবে তার হিসেব থাকবে প্রধান পরিচালকের কাছে এবং এ সকল ক্ষেত্রে প্রধান পরিচালকের পক্ষে নিয়ন্ত্রণও সহজ হবে। মুনির (Moony) মতে প্রত্যর্পণ দুই স্তরের দায়িত্ববোধ (dual responsibility) সৃষ্টি করে—সর্বোচ্চ স্তরে প্রধান পরিচালক মূলকাজ সম্পাদনে ব্যস্ত থাকলেও তিনি তথাকথিত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাদের উপর ন্যস্ত করেন তারাও তাঁর কাছে দায়বদ্ধ থকে। সর্বোচ্চ পদাধিকারীর নিয়ন্ত্রণ তাদের উপর বজায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পৌর কর্পোরেশনে কমিশনারের উপর বার্ষিক বাজেট রচনার আইনগত অধিকার থাকলেও তিনি একাউন্টস অফিসারকে দিয়ে একাজ করতে পারেন। কিন্তু একাউন্টস অফিসার বাজেট রচনায় আরও অনেক কর্মিবর্গের সাহায্য নিতে পারেন কিন্তু মূলক্ষেত্রে একাউন্টস অফিসারের ওপরই কমিশনারের নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে। অনেকেই মনে করেন প্রত্যর্পণ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কিন্তু আসলে প্রত্যর্পণের প্রধান কথা হল মূল দায়িত্বের কিছু অংশের বণ্টন।

৮.৪ প্রত্যর্পণের অসুবিধা

খ. উল্লিখিত সুবিধাগুলি প্রত্যর্পণের আজকের বৃহদায়তন সংগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ আকর্ষণীয় হলেও প্রত্যর্পণের কতকগুলি সমস্যা ও অসুবিধাও দেখা যায় ঃ ১. কখন কোন্ এলাকায় কোন্ সময়ে কাকে কতটা পরিমাণ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে প্রত্যর্পণে এটি একটি সমস্যা। যে ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হবে তার দায়িত্ব বহনের পরিমাপ ও প্রত্যর্পণে একটি বিশেষ অসুবিধা হয়ে দেখা দেয়। সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সমাযোজন, সাংবিধানিক নির্দেশ ও আইনী বাধা ইত্যাদি প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করে। ২. প্রত্যর্পণের একটি বিশেষ অসুবিধা হল মনস্তত্ত্ব-জাত। প্রধান পরিচালক প্রায়শই নিজেকে সংগঠনে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ও নেতৃত্বে আসীন বলে মনে করেন। প্রধান পরিচালকের ভয় থাকে যে প্রত্যর্পণের ফলে নিজের কর্তৃত্বের কমতি হবে ও অধস্তনের আনুগত্যে ঘাটতি হতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক এই কারণ দুটি প্রত্যর্পণে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে। ৩. অধস্তন কর্তৃপক্ষও অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ দায়িত্ব ও স্বতন্ত্র পাওয়ার পর অধস্তন কর্তৃপক্ষ ও নিজেদের ক্ষমতার সীমারেখা ভুলে যায়, নিজেদের মধ্যেই দলাদলি সৃষ্টি করে প্রশাসনে নৈরাজ্য নিয়ে আসে।

গ. উপযুক্ত সুবিধা ও অসুবিধার কথা বিচার করেই প্রত্যর্পণের ধারণাটিকে সফলভাবে প্রয়োগের শর্তগুলি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রধান পরিচালক ও কর্মীদের সাথে নিয়ত যোগাযোগ, তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ও সময়কালীন কাজের পরিসংখ্যান সংরক্ষণ সাধারণ অর্থে প্রত্যর্পণ ব্যবস্থার শর্ত। ডিমক ও ডিমক সফলভাবে প্রত্যর্পণ প্রয়োগের কতকগুলি শর্তের উল্লেখ করেছেন ঃ ১. এঁদের মতে সমস্ত কর্মকাণ্ড একজন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করে, তার বিশেষ আলোচনা করে তবেই প্রত্যর্পণ সম্ভব। ২. ডিমক ও ডিমক মনে করেন যে আদেশ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন কর্তৃপক্ষকেই শুধু ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা উচিত। এক্ষেত্রে অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিকে কর্তৃত্ব ও স্বতন্ত্র দিলে কার্যক্ষেত্রে সুফল মিলবে। অবশ্য সমস্ত কার্যকলাপ সংগঠনের প্রধান কর্মকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ এলাকার মধ্যে থাকবে। ৩. সর্বত্রই শক্তির বিন্যাস ও সম্পর্কের ভারসাম্য নির্ধারণ করা যায় না, কিন্তু প্রত্যেকেরই কিছুমাত্র চেতনা ও বুদ্ধির প্রয়োগ করে সাংগঠনিক ঐক্য বজায় রাখবার চেষ্টা জরুরী। এক্ষেত্রে উর্ধ্বতনের নিয়ন্ত্রণ ও অধস্তনের আনুগত্যের একটি কার্যকরী সমন্বয় প্রয়োজন। প্রত্যর্পণের ধারণার সফল প্রয়োগে এটিই সবচেয়ে কঠিন শর্ত।

পরিশেষে বলা যায় দক্ষতার উন্মোচন ও বিশ্বাসের ভিত্তির জন্যই সংগঠনে প্রত্যর্পণ নীতি কার্যকরী। এক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রত্যর্পণের নীতি দুটিকেই সমান্তাল বলে মনে হয়। এই দুটি নীতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। প্রত্যর্পণ বলতে বোঝায় উর্ধ্বতম কর্তৃত্বের অধস্তন কর্তৃত্বকে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা। সাধারণতঃ অধস্তন কর্তৃপক্ষের আত্মবিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ অর্থে বোঝায় কোন বৃহদায়তন সংগঠনে কোন ক্ষেত্রে কোন কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য আঞ্চলিক সংগঠনের কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান। এই অর্থে বিকেন্দ্রীকরণ আর প্রত্যর্পণের পার্থক্য মাত্রাগত। প্রত্যর্পণ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত আর বিকেন্দ্রীকরণ কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে আঞ্চলিক সংগঠনে সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত। প্রত্যর্পণ প্রশাসন-শাস্ত্রের একটি অনুকেন্দ্রিক ধারণ (Micro-concept) আর বিকেন্দ্রীকরণ একটি সমষ্টিকেন্দ্রিক ধারণা (Macro-concept)। ক্ষমতা বন্টনের প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি আর তা বিকেন্দ্রীকরণে সংগঠন থেকে আঞ্চলিক সংগঠনে প্রসারিত। প্রত্যর্পণের ধারনায় অবশ্য যে দ্রুততা ও সাফল্যের কথা বলা হয় তা ব্যক্তিভিত্তিক আর বিকেন্দ্রীকরণে ধারণা সমকালীন গণতান্ত্রিক চেতনাপ্রসূত।

৮.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। ক্ষমতা প্রত্যর্পণ বলতে কি বোঝায়? এই বিষয়ে জন মিলেট এবং ডিমক ও ডিমকের সংজ্ঞাই বা কি?

২। ক্ষমতা প্রত্যর্পণের কার্যকরী সুবিধাগুলি কি কি?

৩। ক্ষমতা প্রত্যর্পণের সমস্যা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর। এই ব্যাপারে ডিমক ও ডিমকের মতটি কি?

৪। প্রত্যর্পণের শর্তগুলি আলোচনা করুন। ডিমক ও ডিমকের মত উল্লেখ করুন।

৫। বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা প্রত্যর্পণ নীতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৮.৬ গ্রন্থপঞ্জী

(1) Dimock and Dimock : Public Administration

(2) C. P. Bhamfri (ed) : Public Administration

(3) Avasthi and Maheswari : Public Administration

(4) Peter Self : Administrative Theories and Politics

(5) James & D. Mooney : The Principles of Organisation

(6) Amitai Etzioni : The Modern Organisations

(7) Donatld Rowatt (ed) : Basic Issues in Public Administration

(8) Mohit Bhattacharya : New Horizon in Public Administration.

একক ৯ ❑ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য
৯.১ প্রস্তাবনা
৯.২ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অর্থ, সংজ্ঞা ও কার্যাবলী
৯.৩ সারাংশ
৯.৪ অনুশীলনী
৯.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৯.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- জন-প্রশাসনে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব
- প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অর্থ কি ?
- প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পর্ক কি ?

৯.১ প্রস্তাবনা

জন-প্রশাসনের ছাত্রছাত্রী হিসেবে আপনাদের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অত্যন্ত প্রয়োন আছে। আপনারা আগের পর্যায়গুলোতে জানতে পেরেছেন যে, জন-প্রশাসন হ'ল সরকারী সংস্থাগুলি পরিচালনা-সংক্রান্ত বিজ্ঞান। সংস্থাগুলির পরিচালনার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া না জানতে পারলে এই সংস্থাগুলির অন্যান্য দিক, যেমন—কার্যাবলী, সমস্যা এবং সমস্যার সমাধানের উপায়গুলিও জানা যাবে না। প্রক্রিয়া হ'ল প্রশতসনের চালিকা শক্তি।

৯.২ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অর্থ, সংজ্ঞা ও কার্যাবলী

কর্মরত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সাধারণত দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমটি বিষয়গত প্রশাসনিক পর্যায় যেমন,

সেচ-সংক্রান্ত বা রাস্তা নির্মাণ-সংক্রান্ত কাজ এবং দ্বিতীয়টি প্রক্রিয়াগত পর্যায় যেমন, বোরো চাষের সময় সেচের জলবন্টন প্রক্রিয়া। প্রশাসনের প্রক্রিয়াগত পর্যায় আলোচনাই এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। হার্বাট সাইমনের মতে একটি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত প্রয়োজনীয় কার্যভার পরিচালনা করার কৌশল বা ধরনকে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বলা হয়। কাজেই প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগত দিক চলমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার ফলেই প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কার্যভার পরিচালনা করা যায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় ,এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বভার সংগঠনের বিভিন্নস্তরের কর্মীগণের মধ্যে বন্টন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। সংক্ষেপে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া প্রশাসনিক কাঠামোকে গতিশীল এবং সচল করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রতিষ্ঠান। পথচারীরা কলেজ স্ট্রীট অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করার সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বাহ্যিক চেহারা দেখে থাকেন।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু রীতিনীতি বা নিয়মকানুন, কার্যকরী ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এই রীতিনীতিকে আইনানুগ করার জন্য নির্দিষ্ট আইন এবং নিয়মাবলী গৃহীত হয়েছে। এই লিখিত আইনগুলি সংগঠন হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের বিষয়গত দিক। কিন্তু যখনই এই আইনগুলিকে কার্যে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তারা এবং কর্মীবৃন্দ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সম্মিলিত উপায়ে কার্যভার পরিচালনা করেন তখনই তাঁদের এই প্রচেষ্টা প্রশাসনের প্রক্রিয়াগত দিকটিকে চিহ্নিত করে। সাধারণত, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রয়াসে প্রতিটি প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনা করা সম্ভব হয়। স্থান বিশেষে কর্মীবৃন্দকে কার্যভার পরিচালনার ক্ষেত্রে সংগঠিত এবং সুসংবদ্ধ করে প্রশাসনিক কাজকে ত্বরান্বিত করা হয়। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্য সাধারণ কর্মীবৃন্দের ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার এইসব দিক বিশ্লেষণই এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

একটি বাস্তববাদী প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সাধারণত দুইটি প্রণালীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রথমত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী (decision making) ; দ্বিতীয়ত, সিদ্ধান্তের রূপায়ণ প্রণালী (implementing)। এক্ষেত্রে যে সকল ধারণা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে তা এরূপ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তের প্রয়োগ প্রণালী একই প্রশাসনিক কর্মবিধির অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ, একদল শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর একদল সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁরা কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করেন না। কিন্তু এই ধরনের ভ্রান্তিমূলক ধারণার মূল কারণ একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী হিসাবে গণ্য করার প্রচেষ্টা। কার্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তের রূপায়ণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার দুইটি অভিন্ন অংশ। এই দুইটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করেই একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব হয়। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সাফল্যমণ্ডিত করতে হ'লে উভয় প্রক্রিয়ায় সহাবস্থান প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার রূপায়ণ প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে একই মুদ্রার দুই ভিন্ন দিক।

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্তরেই, অর্থাৎ সচিবালয় থেকে শুরু করে নিম্ন স্তরের সংগঠনসমূহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন কর্মী বিভিন্ন সমস্যার

সম্মুখীন হতে হয় এবং সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাই এই সকল কর্মীকে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথ নির্দেশ করে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তের রূপায়ণ এই দু'টি প্রক্রিয়া নির্ধারিত পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে সুসংগঠিত প্রশাসনিক কর্মীগোষ্ঠীর অবদান অনস্বীকার্য। সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব সাধারণ একজন মুখ্য প্রশাসকের ওপর ন্যস্ত করা হয়। একজন, ধৈর্যশীল প্রশাসক পরিকল্পিত প্রশাসনিক দায়িত্বভার পরিচালনার উদ্দেশ্যে (ক) প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দের সাথে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেন, (খ) প্রশাসনিক সংবাদ প্রবাহের ক্ষেত্রে আদান-প্রদান ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা প্রদর্শন করেন। (গ) আন্তঃসাংগঠনিক, অর্থাৎ সংগঠনগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুষ্ঠু এবং সুসংবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন, (ঘ) নূতন সমস্যা সমাধানের পথ উদ্ভাবন করেন এবং (ঙ) বাহ্যিক ক্ষেত্রে ভোক্তাদের, অর্থাৎ যাদের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা হয় তাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সম্পর্কে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

৯.৩ সারাংশ

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার জন-প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ এই প্রক্রিয়া জন-প্রশাসনকে চলমান ও গতিশীল করে রাখে।

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্তরে, অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে, সুসংবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংগঠনের বিভিন্ন অংশের এবং উপাদানের সাহায্যে সম্ভব হয়। এর মধ্যে আছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সাংগঠনিক নেতৃত্ব।

৯.৪ অনুশীলনী

১। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?

২। জন-প্রশাসনে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব কী?

৩। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পর্ক কী?

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১। Mohit Bhattacharjya : Public Administration, 1987

২। Rumki Basu : Public Administration, 1994.

৩। Herbert Simon : Administrative Behaviour, 1961.

একক ১০ □ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য
১০.১ প্রস্তাবনা
১০.২ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত অর্থ ও সংজ্ঞা
১০.৩ সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রণালী ও তার বিভিন্ন প্রক্রিয়া
১০.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যালোচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী
১০.৪.১ যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ
১০.৪.২ দরাদরির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
১০.৪.৩ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
১০.৪.৪ জনগণের পছন্দের নীতি
১০.৫ সিদ্ধান্ত গহণে হার্বার্ট সাইমনের বিকল্প আচরণ-তত্ত্ব
১০.৬ সারাংশ
১০.৭ অনুশীলনী
১০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১০.০ উদ্দেশ্য

এই এককে আলোকপাত করা হয়েছে

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে হার্বার্ট সাইমনের বিকল্প আচরণ-তত্ত্ব

১০.১ প্রস্তাবনা

আগের এককে আপনারা জন-প্রশাসনে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া জন-

প্রশাসনকে চলমান ও সক্রিয় করে তোলে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রশাসনের প্রাণশক্তি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ নানাভাবে হ'তে পারে। বিভিন্ন সময় প্রশাসনবিদ্‌রা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানা দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে থাকেন। তবে সব দৃষ্টিভঙ্গীর উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে হার্বার্ট সাইমনের বিকল্প আচরণ-তত্ত্ব। এই এককে হার্বার্ট সাইমনের এই বিকল্প আচরণ-তত্ত্বর বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১০.২ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত অর্থ ও সংজ্ঞা

প্রশাসনিক সংগঠনে কোনও একটি উদ্দেশ্য অথবা দায়িত্ব সম্পাদনের প্রয়োজনে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, সংগঠনটি গড়ে ওঠার আগেই উক্ত সংগঠনের কার্যাবলীর সীমারেখা এবং দায়িত্বভার পরিচালনার পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সত্তরের দশকে যখন Calcutta Metropolitan Development Authority তৈরী হয় তখন এই প্রতিষ্ঠানের মূল কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য—বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন—শুরু থেকেই নির্ধারিত হয়। তবে চলমান একটি প্রশাসনিক সংস্থা কখনই অনমনীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এবং প্রয়োজনের তাগিদে প্রত্যেকটি প্রশাসনিক সংস্থা নির্দিষ্ট কোনও কারণে এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান তার গতিশীলতা রক্ষা করে। তাই বলা যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু।

দুই প্রকার সিদ্ধান্ত ঃ

হার্বার্ট সাইমন সাংগঠনিক সিদ্ধান্তকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ পূর্বনির্ধারিত ও অনির্ধারিত সিদ্ধান্ত (Programmed and Non-programmed decisions)। যখন আইনকানুন এবং লিখিত নিয়ম ও কাজের প্রক্রিয়া এমনভাবে ছকে দেওয়া থাকে যে, একজন কর্মচারী শুধু এইসব নিয়ম মেনে অনায়াসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যেমন, পুরসভার কর্মচারীরা বিল্ডিং প্ল্যানের দরখাস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে নেন এবং সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিয়মকানুন এমনভাবে ছকে দেওয়া আছে যে, এইরকম সিদ্ধান্ত নিতে বিশেষ কোনও চিন্তাভাবনা করতে হয় না। সাইমন এই ধরনের সিদ্ধান্তকে "পূর্বনির্ধারিত" সিদ্ধান্ত আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে, নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিলে সংগঠনে বাঁধা ধরা নিয়মে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। যেমন, খরার সময় হঠাৎ কিছু করা দরকার জল সরবরাহের জন্য। এই অবস্থায় স্থানীয় প্রশাসককে নতুনভাবে চিন্তা করতে হয় কিভাবে স্থানীয় মানুষের জন্য জলের ব্যবস্থা করা যায়। এইরকম অবস্থায় যে ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাকে সাইমন "অনির্ধারিত" সিদ্ধান্ত বলেছেন।

১০.৩ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী এবং তার বিভিন্ন প্রক্রিয়া

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী এবং তার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে প্রশাসনবিদ্‌গণ কতকগুলি জটিল সমস্যার কথা বলেছেন। সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশাসকগণকে সচেতন হ'তে বলেছেন।

(১) কী ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং কী ধরনের তথ্যের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এ বিষয়ে প্রশাসকগণের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ধারণা গড়ে ওঠা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আবার "ভারতীয় দূরভাষ নিয়ন্ত্রণ নিগমের" (Telecom Regulatory Authority) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ত্রুটিসমূহ নির্দেশ করা যেতে পারে। ভারতীয় দূরভাষ নিয়ন্ত্রণ নিগমের মূল দায়িত্ব ছিল দূরভাষ বিভাগের আয়ের পথ নির্দেশ করা। এই কার্যভার পরিচালনার প্রয়াসে উক্ত বিভাগের প্রশাসকগণ দূরভাষ ব্যবহারকারীর উপর অত্যন্ত উচ্চমানের মাশুলের হার নির্ধারণ করেন বলে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এই ধরনের অসন্তোষের কারণ ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(২) আবার একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে অবশ্যই তৎকালীন রাজনৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। যেমন "ভারতীয় দূরভাষ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের" দ্বারা নির্ধারিত দূরভাষ কর এবং মাশুল রাজনৈতিক মূল্যবোধের বিপক্ষে হওয়ার ফলে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং উক্ত বিভাগকে নির্ধারিত কর এবং মাশুলের হার কমিয়ে আনতে বাধ্য করা হয়। কাজেই কল্যাণমূলক প্রশাসনিক সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই সামাজিক প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টি রাখবেন এবং মুনাফা অপেক্ষা সামাজিক উন্নয়নের দিকে নজর দিয়ে সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট হবেন।

১০.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যালোচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি জটিল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। প্রশাসকবিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চারটি মূল দৃষ্টিভঙ্গী, এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(২) আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(৩) অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(৪) জনগণের পছন্দের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এই দৃষ্টিভঙ্গীগুলি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

১০.৪.১ যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই দৃষ্টিভঙ্গী হার্বার্ট সাইমনের আচরণের বিকল্পনীতির সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ প্রশাসক কোনও সমস্যার সম্মুখীন হ'লে, সমাধানের বিকল্প পথগুলি ভাবতে শুরু করে। যেমন, এলাকায় চুরি বন্ধ করতে হ'লে পুলিশ নিয়োগ করা যায়, স্থানীয় মানুষের সাহায্য নেওয়া যায়, রাস্তাঘাটে আলোর সুবন্দোবস্ত করা যায় ইত্যাদি। এইসব বিকল্প পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করলে সমাধান হ'তে পারে তার খরচের দিক ভাবতে হয়, আবার উপযোগীতা বা উপকারের দিকও ভাবতে হয়। শেষ অবধি, সমস্ত দিক বিবেচনা করে প্রশাসক একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এইভাবে বিকল্প চিন্তার মাধ্যমে যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি সাইমনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়েছে। সাইমনের তত্ত্ব আলাদাভাবে আলোচিত হয়েছে।

১০.৪.২ দরাদরির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় নীতি অর্থাৎ দরাদরির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতির প্রধান প্রবক্তা চার্লস্ ই লিন্ডব্লোম (Charlsc E Lindblom)। তাঁর মতে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আবার এই নীতি অবলম্বনের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বা প্রশাসকগণের মধ্যে ক্ষমতার রেষারেষি দূর করা সম্ভব হয়। কারণ উক্ত নীতি অবলম্বনের ফলে প্রত্যেক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রশাসকের সিদ্ধান্তগুলিকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রেখে একটি সংমিশ্র সিদ্ধান্তের উপস্থাপনা করেন এবং প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সাধন করেন। এক্ষেত্রে সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের পরিবর্তনও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নিজস্ব সিদ্ধান্তের প্রশাসনিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিশ্চিন্ত বোধ করেন। (Theory of incrementalism).

১০.৪.৩ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এই আলোচনায় প্রশাসনিকবিদ্গণ সম্মিলিতগোষ্ঠীর সক্রিয় প্রয়াসে গঠিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতির কয়েকটি ইতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে, এই নীতি গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটি অত্যাবশ্যকীয় নীতি। এই প্রক্রিয়ার ফলে সিদ্ধান্তের নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপকৃত ব্যক্তিসকল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং নিশ্চিন্ত বোধ করেন। যে চারটি বিশেষ দলের অংশগ্রহণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রক্রিয়ার পথে প্রয়োজন তাঁরা হলেন ঃ—

(১) সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদার প্রশাসকগণ

(২) উপকৃত জনগণ।

(৩) কর প্রদানকারী জনগণ।

(৪) নির্বাচনী এলাকার ভোটাধিকারীগণ।

১০.৪.৪ জনগণের পছন্দের নীতি ঃ

সাধারণত এই প্রক্রিয়ার ভিত্তিভূমি যুক্তিবাদী ব্যক্তি (rational individual)— যে ব্যক্তি তাঁর এই সিদ্ধান্ত যুক্তির নিরিখে তাঁর ভোগ্যবস্তু স্বাধীনভাবে নির্বাচন করেন। এই নীতির মতে সরকারী কর্মচারীগণ স্বার্থপর; ভোট প্রেমিক রাজনীতিবিদ্ আর ক্ষমতালোভী প্রশাসক—এ দুয়ের যোগসাজসে সরকারী প্রশাসন এবং খরচ ক্রমাগত বেড়ে চলে। এর ফলে উপকৃত হন তাঁরাই যাঁরা জনসাধারণ নন। জনগণের পছন্দনীতির প্রবক্তাদের মতে, সরকারকে ক্ষুদ্রাকার করা দরকার; সিদ্ধান্ত আমলাদের হাতে রাখা উচিত নয় এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বেশী হওয়া দরকার। এর ফলে, একজন ক্রেতা বা ভোক্তার পছন্দের জিনিস বিভিন্ন সংগঠন থেকে পাওয়া যেতে পারে। গণতান্ত্রিক সংগঠন ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হ'লে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিরোধ সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই সব বিভিন্ন নীতির বা দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা থেকে বোঝা যায়—বিষয়টি জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ।

১০.৫ হার্বার্ট সাইমনের বিকল্প আচরণ-তত্ত্ব

সিদ্ধান্ত গ্রহণের তত্ত্ব জন-প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। হার্বার্ট সাইমনের বিকল্প আচরণ-তত্ত্ব এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাইমন তাঁর Administrative Behaviour পুস্তকে একটি যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তের তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপনা করেছেন। সাইমন তাঁর পূর্বগামী "বৈজ্ঞানিক পরিচালনবাদী" প্রশাসনবিদ্‌দের আলোচনার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, পূর্বসুরিরা বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করেন নি, কিছু মনগড়া নীতি সুপারিশ করেছেন। এইসব নীতির একটার সঙ্গে আর একটার সঙ্গতি নেই এবং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। প্রশাসন সম্পর্কে বাস্তবসম্মত সত্ত্ব তৈরী করতে গেলে প্রশাসনের প্রক্রিয়াকে খুঁটিয়ে দেখা দরকার। সাইমেনর মতে, বিজ্ঞানসম্মত প্রশাসন তত্ত্বের প্রথম এবং প্রধান কাজ—প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রণালীকে বিশদভাবে জানা এবং বিশ্লেষণ করা।

সাইমন মনে করেন যে, বাস্তব জগতে একটিমাত্র উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নিদর্শন বিরল। তাই তিনি সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সমন্বিত একটি ছকের (Goal matrix) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই ছকের দ্বারা একজন প্রশাসক প্রত্যেকটি বিকল্প উদ্দেশ্যকে সুষ্ঠুভাবে বিচার করেন এবং নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্তে পৌছন।

সাইমনের মতে, একজন প্রশাসকের প্রকৃত আচরণ বা আচরণসমূহ সবসময়ই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বেই একজন প্রশাসক উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হন এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে দায়িত্ব সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন। কাজেই, প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে একটি উদ্দেশ্য ও উপায়ের নীতি বা লক্ষ্যের নির্ধারণ অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সিদ্ধান্তের নীতি উদ্দেশ্যের মূল্যায়নের নামান্তর মাত্র (Value Judgement)। আবার, পরিকল্পিত উদ্দেশ্য কাজে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাস্তবতামূলক মীমাংসা (Factual Judgement) বলে অভিহিত করা যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচেষ্টার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠা এবং মূল্যবোধ—এ দু'য়ের অবধারিত সম্পর্কের কথা সাইমন স্বীকার করেছেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনায় সাইমন তিনটি পদক্ষেপের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রশাসকের মানসিক প্রক্রিয়ায় এগুলি বিধৃত।

এক, প্রশাসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা সমস্যা প্রশাসকের চোখে ধরা পড়ে। যেমন ধরা যাক—হঠাৎ খুব রেলডাকাতি হচ্ছে কোনও একটি এলাকায়।

দুই, সমস্যাটি সমাধানের বিকল্প পথ বা উপায় কি কি? প্রশাসকের সামনে এটি দ্বিতীয় প্রশ্ন। রেলডাকাতি বন্ধ করতে কি কি উপায় আছে? যাত্রীদের কামরায় পুলিশ রাখা, রেলের বিভিন্ন কামরার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো করা, রেলযাত্রীদের সংগঠিত ও সচেতন করা, জেলাপুলিশ ও রেলপুলিশের সমন্বয়সাধন করা—ইত্যাদি বিভিন্ন উপায় এক্ষেত্রে আলোচিত হ'তে পারে।

তিন, তৃতীয় পর্যায়ে বিকল্প পথগুলি থেকে প্রশাসককে কোনও একটি পথ বেছে নিতে হয়। আমাদের উদাহরণে রেলপুলিশ ও জেলাপুলিশের খবরদারী এবং সমন্বয় আরও ভালো করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাইমনের এই তিন-পদক্ষেপ নেওয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্যে মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, যুক্তিনিষ্ঠা ও অর্থনীতির মেলবন্ধন ঘটেছে। সেই সিদ্ধান্তই প্রশাসক নেবেন যার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, আবার খরচ খুব বাড়বে না। উপায়গুলির মধ্যে যেটি গ্রহণ করা হ'ল তার তুলনামূলকভাবে খরচ কম।

সাইমন সম্পূর্ণ যুক্তিনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলেছেন। কিন্তু, তিনি পরবর্তীকালে স্বীকার করেন যে, প্রশাসকের সময়, আর্থিক সামর্থ্য, মানসিক শক্তি এবং বাস্তবে সম্পূর্ণ যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তের জন্য যে বিশাল পরিমাণ খবরাখবর দরকার—এ সবের কথা ভেবে প্রশাসক প্রকৃতপক্ষে তৃপ্ত (Satisfied) হওয়ার চেষ্টা করেন ; চূড়ান্ত কোনও আদর্শ সিদ্ধান্ত (Maximize) গ্রহণ করতে পারেন না। পরিতৃপ্ত প্রশাসন বনাম সর্বোৎকৃষ্ট প্রশাসন—এ দু'য়ের মধ্যে সাইমন প্রথমটার উপর শেষমেস জোর দেন।

সমালোচনা—সাইমনের সংগঠন সংক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক ধারণা অনেকটা নেতিবাচক। তিনি প্রকৃত সমন্বয় এবং খোলাখুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অভিযোজনা প্রক্রিয়ার প্রতি তেমন নজর দেননি। সাইমনের আচরণ বিকল্প কাঠামো নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক আবেদনযুক্ত। এই তত্ত্ব জন-প্রশাসনের বিভিন্ন প্রয়োজনের মোকাবিলা করতে সক্ষম। তবে সমালোচকের মতে, সাইমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি, বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিকে বেশি করে দেখিয়েছে ; আবেগ, সূক্ষ্ম অনুভূতি, মানবিকতাবোধ—এসব দিকগুলি তাঁর আলোচনায় অবহেলিত।

সাইমন তাঁর সিদ্ধান্ত নীতির মাধ্যমে তথ্য এবং মূল্যবোধ এই দুইটি বিষয়ের পার্থক্য একটি যুক্তিবাদী ইতিবাচক ধারণার দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তবে এই ধারণার কতকগুলি অসঙ্গতি রয়েছে যেমন—(১) এই নীতির মাধ্যমে রাজনীতি এবং প্রশাসনের মধ্যে বিভেদের পাঁচিল তৈরী হয়েছে, (২) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে, (৩) বাস্তবজীবনের প্রশাসকের উপর যে সব প্রভাব আসে সেগুলি সন্তর্পণে সাইমন এড়িয়ে গেছেন। সমালোচকরা মন্তব্য করেছেন ঃ সাইমন-কল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা একটি যান্ত্রিক ধারণা। প্রশাসনিক তৎপরতা একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার আরও অনেকগুলি দিক রয়েছে ; যেমন, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত উৎসাহ, পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন, কতকগুলি নীতি নিয়মের প্রচলন, যুক্তিবাদী প্রক্রিয়ার প্রয়োগ, অর্থের প্রকৃত বিনিয়োগ প্রভৃতি এই সকল প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সম্মিলিত প্রয়োগ একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য।

সাইমনের যুক্তিবাদী ধারণার সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, যুক্তিবাদী ব্যবস্থার প্রয়োগ এক প্রশাসককে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ধারণা, বিশ্বাস বা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাস্তব ছবি এঁকেছেন লিন্ডব্লোম (Lindblom)। সাইমনের মতের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রশাসক ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকা পরিকল্পনাকারী নন। গণতন্ত্রে বহুত্ববাদী বক্তব্য মেনে নিয়ে বলতে হয় যে, সিদ্ধান্তকারীকে অনেক মতামত এবং চাপসৃষ্টিকারী ব্যক্তি ও সংস্থার কথা শুনতে হয়। সিদ্ধান্ত শুধু যুক্তি নির্ভর নয়, আপোস মীমাংসার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সরকারী সিদ্ধান্ত অল্প স্বল্প পরিবর্তনের মাধ্যমে (incrementalism) নেওয়া হয় ; বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা সিদ্ধান্তের প্রকৃত চরিত্র নয়।

১০.৬ সারাংশ

প্রশাসনিক সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। একটি প্রশাসনিক সংস্থা কখনই অনমনীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ দরকার হয়ে পড়ে। কি ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং কি কি তথ্যের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা নিয়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গী জন-প্রশাসন আলোচনায় প্রচলিত আছে। তবে সাইমনের মতে, বিজ্ঞানসম্মত প্রশাসন তত্ত্বের প্রথম এবং প্রধান কাজ প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রণালীকে বিশদভাবে জানা এবং বিশ্লেষণ করা।

১০.৭ অনুশীলনী

১। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা কর।

২। হার্বার্ট সাইমনের বিকল্প আরচরণ তত্ত্বের উপর টিকা লেখ।

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Avashti and Maheswari : *Public Administration,* 1987

২। Herbert Simon : *Administrative Behaviou,* 1961.

৩। Peter Self : *Administrative Theories and Politics*. 1972.

একক ১১ ☐ যোগাযোগ ব্যবস্থা

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য
১১.১ প্রস্তাবনা
১১.২ অর্থ ও সংজ্ঞা
১১.৩ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা
১১.৪ যোগাযোগ প্রণালীসমূহ
১১.৫ যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্নরূপ
১১.৬ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমসমূহ
১১.৭ ঘরোয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা
১১.৮ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত প্রেরণা
১১.৯ আধুনিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া
১১.১০ যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা
১১.১১ সারাংশ
১১.১২ অনুশীলনী
১১.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১১.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- যোগাযোগের অর্থ ও প্রশাসনে যোগাযোগের গুরুত্ব
- যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ
- যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমসমূহ
- যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা

১১.১ প্রস্তাবনা

প্রশাসনিক তত্ত্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা হ'ল বহু আলোচিত বিষয়। ফ্রেড লুথানসের মতে, মানুষের কর্মময় জীবনের

প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ অংশে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব আছে। পৃথিবীতে সকল সমস্যার মূল কারণ হ'ল নিষ্ক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। হিক্স এবং গুলেটও প্রায় একই মত প্রকাশ করেছেন। তাই সক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি উন্নতদেশের পরিচায়ক। যোগাযোগ ব্যবস্থা ধারণার সঙ্গে সমন্বয়, নেতৃত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণ ইত্যাদি ধারণাগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই এককে আমরা আলোচনা করব, যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব, প্রকারভেদ, মাধ্যম ও নানা উপাদান যা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে থাকে।

১১.২ যোগাযোগ ব্যবস্থার অর্থ ও সংজ্ঞা

যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ। মিলেট (Millet) যোগাযাগ ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক সংগঠনের রক্তপ্রবাহ বলে অভিহিত করেছেন (The blood stream of administrative organisation)। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালন বিভাগের কেন্দ্রবিন্দু। আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে একথা বলা যেতে পারে যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া যার ফলে কোনও একটি সিদ্ধান্তের সূত্র (Decisional Premises) একজন সাংগঠনিক সদস্যের মাধ্যমে অন্য সদস্যের নিকট স্থানান্তরিত হয়। একটি সুষ্ঠু এবং সুসংবদ্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া কোনও পূর্ণাঙ্গ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না। সাধারণত সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনও একটি বিষয়গত সিদ্ধান্তের দায়িত্ব বিভিন্ন কর্মী কিংবা গোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। আবার সেই কর্মী বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন উপায়সমূহ উর্ধ্বতন প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী আবার তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত সংগঠনের নিম্নস্তরে প্রেরণ করেন এবং তার ভিত্তিতে অধস্তন কর্মীদের পরিচালনা করেন। কাজেই, একটি সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বিপথগামী ঃ উপর-নীচে এবং নীচ উপরে প্রবাহিত হয় এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে সাংগঠনিক সমন্বয় নিয়ে আসে।

যোগাযোগ শব্দটি ইংরেজী (communication) শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার communication শব্দটি লাতিন শব্দ communicare অথবা communico শব্দ থেকে নেওয়া; অর্থাৎ, ভাগ করে নেওয়া, অর্থাৎ কোনও সংবাদ সর্বসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার যে প্রণালী তাকে 'যোগাযোগ' বলে। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে বিভিন্ন 'সংকেত বা 'চিহ্নের' মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করার প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। সাধারণত তিনটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ঃ

(১) বিভিন্ন শব্দ বা পত্রের মাধ্যমে যখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নির্দেশ করেন,

(২) যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন এবং

(৩) যে কোনও একটি তথ্য অংশগ্রহণের মাধ্যমে যখন পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে অনুপ্রাণিত করেন তখনই সংযোগ স্থাপিত হয়।

নরবার্ট উইনার (Norbert Weiner) ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম সাইবারনেটিকস্ শব্দটির উদ্ভাবন করেন। উইনার-এর মতে, গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলার বা বিভাজনের প্রতি একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। তথ্যের সাহায্যে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই আবার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করতে সক্ষম হন। সমাজবদ্ধ

ব্যক্তিগণ একে অপরের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন এবং অবস্থার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেন। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা সাংগঠনিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

১১.৩ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবন

যোগাযোগ ব্যবস্থার কাঠামো বহু আলোচিত বিষয়। সর্বাধিক ব্যবহৃত কাঠামো (Model) স্যানন, ওয়েভার এবং স্ক্রাম (Shannon Weaver and Scharmm) প্রমুখ প্রশাসনবিদ্‌দের নামের সঙ্গে জড়িত। এই কাঠামোর প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) Encoder (সংবাদ সংকেতকারক) অর্থাৎ যিনি সংবাদসমূহ সংকেতে পরিণত করেন,

(২) Decoder (তথ্য বিশ্লেষক) বা সংবাদ প্রত্যহ পথ, অর্থাৎ তিনি তথ্যসমূহকে সংবাদে লিপিবদ্ধ করেন, এবং

(৩) সংবাদ পশ্চাদ প্রেরণের (Feed back) মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করেন এবং ব্যক্তির আচরণের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করেন। তথ্য বলতে সাধারণত এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার ফলে একজন প্রশাসনিক সদস্য কোনও সময়োপযোগী সংবাদ প্রেরণ করেন এবং সংযোগ স্থাপনের বিভিন্ন পথগুলিকে নির্দেশ করেন,

(৪) বার্তা হ'ল একটি সংবাদ। যখন একজন ব্যক্তি উপরস্থ একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিকট কোনও সংবাদ পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেন তখন তাকে বার্তা প্রেরণ করা বলে।

বার্তা প্রেরণ প্রণালীর মাধ্যমে একজন প্রেরক কেন্দ্রবিন্দু থেকে কোনও একটি সংবাদ প্রাপকের নিকট প্রেরণ করেন, যেমন লিখিত বার্তা, দূরভাষ যন্ত্রের দ্বারা প্রেরিত অথবা আধুনিক বার্তাবহ যন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ Fax, E-mail প্রভৃতির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে সংবাদ বা তথ্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ করা হয়—এই প্রথাকে বার্তা প্রেরণ প্রণালী বলা হয়। তবে একজন বার্তাবহ প্রত্যেকটি বার্তাই নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করেন এবং প্রেরণ করেন। কাজেই একজন সংবাদ গ্রহণারী প্রকৃত সংবাদ গ্রহণ করলেন কি না অথবা প্রকৃত বার্তা প্রেরণ করা হ'ল কি না সে বিষয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ থাকে। ফলত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই বার্তা পশ্চাৎবাদ্ প্রেরণের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

ক্ষেত্র বিশেষে যোগাযোগ প্রক্রিয়াতেও কিছু বিপত্তি ঘটে থাকে ; যেমন, সংবাদ প্রবাহ যন্ত্রের গোলযোগ, অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ অথবা বিচ্যুতি প্রভৃতি। স্যানন এবং ওয়েভার (Shannon and Wever) এই সকল গোলযোগ শব্দ বা গণ্ডগোল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই সকল প্রশাসনবিদ্‌গণ এই গোলযোগকে কোনও একটি ইঙ্গিতের মান বিকৃতকারী উপাদান হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। কোলাহল বা গোলযোগ আচরণবাদী বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিশ্বস্ততা নষ্ট করে।

১১.৪ যোগাযোগ প্রণালীসমূহ

সাধারণত তিনটি প্রণালীর উপর নির্ভর করে যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় ঃ (১) শ্রবণ (Audio) অর্থাৎ সম্মিলিত আলোচনার তথ্য শ্রবণ-মাধ্যমে সংগ্রহ করা (২) দর্শন (Visual) অর্থাৎ বিভিন্ন সংবাদ প্রবাহের তথ্য দর্শন মাধ্যমগুলির সাহায্যে সংগ্রহ করা, (৩) শ্রবণ এবং দর্শন (Audio-Visual) এই উভয় প্রক্রিয়ার সম্মিলিত প্রয়াস সংবাদ সংগ্রহ করা। যে সকল শ্রবণ প্রণালীর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তা এরূপ ঃ প্রথমত, দূরভাষ যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা, সম্মেলনের মাধ্যমে, অলোচনার দ্বারা, সংবাদ প্রবাহের মাধ্যমে এবং জন-সম্মেলনের দ্বারা প্রকৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়। দ্রষ্টব্য বস্তুর মাধ্যমগুলি এরূপ ঃ লিখিত পত্র, বিজ্ঞপ্তি, সাংকেতিক চিহ্ন, বিবরণ। তাছাড়া দর্শন এবং শ্রবণ উভয়ের যুগ্ম ব্যবহার সম্ভব হয়। বিভিন্ন শব্দ ও চলমান ছবির মাধ্যমে এবং দূরদর্শন যন্ত্র প্রবাহের দ্বারা যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। উপরোক্ত প্রত্যেকটি মাধ্যমেই কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি রয়েছে। একটি সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে যে কোন প্রক্রিয়া সফল হবে তা কেবলমাত্র একজন পরিচালক অথবা একজন প্রশাসকই নির্ধারণ করতে সক্ষম। উপরোক্ত মাধ্যমগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আবার কতগুলি অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত জটিলতা, সাধারণত বিভিন্ন প্রশসানিক কর্মীবৃন্দের মধ্যে গোলযোগ ব্যবস্থার যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় তা হ'ল, ভাষার অসঙ্গতি ; সাধারণত আন্তর্জাতিক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সকল অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। টেরির (Terry) মতে, কোনও শব্দকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—সংযোজিত অংশ এবং আন্তর্জাতিক অংশ। প্রথম স্তরে শব্দের ব্যবহারে সাধারণত ব্যক্তি, স্থান এবং বস্তু ; এই সকল বিষয়সমূহ খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়। তুলনামূলকভাবে আন্তর্জাতিক শব্দ সাধারণত কোনও বিষয়কেই নির্দেশ করে না। তবে একটি শব্দ বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে একটি শব্দ একই ব্যক্তির নিকট সমভাবে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয় না।

দ্বিতীয়ত, পিফনারের ভাষায় (Pifner) ভাবগত বাধা (Ideological/barriers) কোনও কোনও ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্তরায় হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দের সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা এবং আকাঙ্খা তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারাতে পরিবর্তন ঘটায়। এই সকল পরিবর্তন ক্ষেত্রবিশেষে যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সুষ্ঠু যোগাযোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না। আবার এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে আরও কিছু অসামঞ্জস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, যদি প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দ একই অভিজ্ঞতা এবং একই পরিবেশ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন। এই সকল অসামঞ্জস্যকর পরিবেশে সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, ক্ষেত্রবিশেষে কর্মীগণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে দেখা যায়। যদিও এই অনিচ্ছার কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না, তবে কখনও কখনও প্রশাসকগণ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেন। একজন প্রশাসকের এই অনীহা সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করে।

একটি সংগঠনের বৃহত্তর এলাকায় মূল বিভাগের সঙ্গে নিম্নস্তরের বিভাগসমূহের দূরত্ব সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার চতুর্থ অন্তরায় বলে ধরে নেওয়া হয়। সাধারণত বৃহত্তর সংগঠনের ক্ষেত্রে কর্মীসংখ্যাও বেশী থাকে এবং বিশাল গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন অসম্ভব হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস সংযোগ ব্যবস্থার বাধা

সৃষ্টি করে। আবার যদিও কোনও প্রশাসনিক সংগঠনের স্তরবিন্যাস সমগ্র দেশব্যাপী পরিব্যাপ্ত থাকে সে ক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলির বিভাগীয় বিচ্ছিন্নতা সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্তরায় হয়ে ওঠে। যেমন ভারতীয় খাদ্য নিগম কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা কিন্তু এর বিভাগসমূহ সমস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের ছড়িয়ে আছে। ক্ষেত্রবিশেষে কর্মগত নির্দেশ কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে পাঠানো হয় এবং এর ফলে নিম্নতর সংস্থাসমূহ সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করতে সক্ষম হয় না। যদিও সংযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ফলে অনেক ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজসাধ্য হয়েছে কিন্তু তবুও সুষ্ঠু সংযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় নি।

১১.৫ যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ

প্রশাসনিক কার্যভারকে প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করাই প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীবৃন্দের প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণত কোনও প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সমস্তরে (horizontal) কিংবা উল্লম্বভাবে (vertical) উৎসস্থল থেকে প্রয়োগকারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। একজন প্রশাসক নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিম্নস্তরে প্রেরণ করেন, এবং নিম্নস্তরের কর্মীবৃন্দ এক্ষেত্রে বার্তা বা তথ্য প্রেরণ করে থাকেন। যখনই কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরের দিকে ধাবিত হয় তখন তা অনেকটা উপদেশ বা নির্দেশের রূপ ধারণ করে এবং নিম্নস্তরের কর্মীবৃন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ থাকে না ; অর্থাৎ এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি একমুখি পথ ধরে ধাবিত হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থার সাধারণত দু'টি পরিকাঠামো রয়েছে ঃ

১। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা

(ক) সংবাদ সংগ্রহ করা এবং বিকীর্ণ করা

(খ) নির্দেশ প্রদান করা

(গ) মানবিক নীতি নিয়ম মেনে চলা

(ঘ) কর্মীবৃন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সচেতনতা গড়ে তোলা

২। বাহ্যিক যোগাযোগ ব্যবস্থা

(ক) সামাজিক পরিষেবার ব্যবস্থা গ্রহণ

(খ) আন্তঃপ্রতিষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

উপরোক্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রয়াসে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট হয়।

পরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থা সাধারণত দুইটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই পদ্ধতি দু'টি হ'ল আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ঘরোয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় কতকগুলি প্রণালী অবলম্বন করা হয়। এর ফলে সচেতন বা ইচ্ছাকৃতভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় ; অন্যদিকে ঘরোয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা কর্মীবৃন্দের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা গড়ে ওঠে।

১১.৬ আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমসমূহ

পরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে সকল মধ্যমে অবলম্বন করা হয় ঃ

১। সাধারণত মৌখিক যোগাযোগ সাংকেতিক চিহ্ন, শব্দ পত্র এবং স্মারকলিপি প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মধ্যেমে আন্তঃসাংগঠনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। আন্তর্বিভাগীয় যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও এই মাধ্যমগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই মাধ্যমগুলির ফলে মূল বিভাগের সঙ্গে নিম্নস্তরের বিভাগগুলির সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয়। তবে বাহ্যিক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যে সকল বিবৃতির মাধ্যমে পরিচালিত হয় তার মধ্যে দলিল, লিখিত বিবৃতি এবং লিখিত নিয়মাবলীসমূহ অন্যতম। সাধারণত আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে দু'টি পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়—(১) মৌখিক যোগাযোগ ব্যবস্থা (২) লিখিত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

মৌখিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপকতা খুবই সীমিত। সাধারণত সমস্তরের কর্মীবৃন্দের মধ্যে এই জাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে ঊর্ধ্বতন প্রশাসক নিম্নস্তরের কর্মীবৃন্দের সঙ্গে মৌখিক যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম, তবে উভয়েই একই কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলে এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করা সহজসাধ্য হয়।

পত্র এবং স্মারকলিপি ঃ

লিখিত পত্র এবং স্মারকলিপি একটি সর্বজন গ্রাহ্য যোগাযোগ মাধ্যম। সাধারণত লিখিত পত্র সরকারী প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিভাগের মধ্যে পরিচালিত হয়। লিখিত যোগাযোগ ব্যবস্থা কোনও নিয়মাবলী মেনে চলে না। সাধারণত আন্তর্বিভাগীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয় বিভাগীয় প্রধান পত্রালাপ শুরু করেন এবং একটি নির্দিষ্টি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রয়োজনে সেই সিদ্ধান্ত নিম্নস্তরের কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিভাগীয় প্রধানকে এই ব্যাপারে অবগত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় না। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে কোনও প্রতিষ্ঠানেরই নির্ধারিত প্রণালীর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালিত হয় না, আবার প্রশাসকের স্বাক্ষর ছাড়াও কোনও সিদ্ধান্তই কার্যকর হয় না। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি, অর্থাৎ ভারতীয় জীবনবীমা সংস্থা (Life Insurance Corporation of India) হিসাব বিভাগ (Accounting Department) এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ঋণ প্রদানকারী (Federal Money Lending) সংস্থাগুলি আবেদন পত্র পরীক্ষা করেও বীমাপত্র প্রদান করে। এক্ষেত্রে বীমাপত্রের আধিকারিকের একটি নথিপত্র তৈরী করা হয় এবং এই নথিপত্রে বীমাপত্রের অধিকার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খবরাখবর গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনে এই নথিপত্র এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় বীমা প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করে।

লিখিত তথ্য, স্মারকলিপি ইত্যাদি ঃ

এই জাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা সাধারণত সরকারী বিভাগগুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত নীতি অবলম্বন করা হয় এবং স্মারকলিপির মাধ্যমে পূর্বতন সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা করা হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ভবিষ্যৎ কার্যাবলী পরিচালিত হয়।

১১.৭ ঘরোয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা

একটি সংগঠনে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশদভাবে পরিচালিত হ'লেও ঘরোয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। সাধারণত কর্মীবৃন্দের মধ্যে বিভিন্ন বার্তা প্রবাহ, আদেশ, উপদেশ বা পরামর্শ ঘরোয়াভাবে প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের ফলে এই ধরনের সংযোগ গড়ে ওঠে। বন্ধুত্বপূর্ণ এবং শত্রুভাবাপন্ন সামাজিক অবস্থায় এই ধরনের ঘরোয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনও এক কর্মীর নেতৃত্ব মেনে নেন এবং এইভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একজন স্বাভাবিক নেতার (Natural) উদ্ভব ঘটে এবং তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থা ঘরোয়াভাবে পরিচালনা করেন। তবে একজন স্বাভাবিক নেতৃত্বের আলোচনা কোনও নথিপত্রে পাওয়া যায় না। এই ধরনের ঘরোয়া যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই কোনও ব্যক্তি নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নেতৃত্ব-পদ বা নেতার পদ গ্রহণ করেন। তবে ঘরোয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা সাধারণ কর্মীবৃন্দের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

আবার কোনও কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, কিন্তু প্রতিনিয়ত যোগাযোগের ফলে সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কাজেই এই সকল ক্ষেত্রে একজন প্রশাসকের প্রধান কর্তব্য হ'ল কর্মীবৃন্দের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত প্রশাসকগণের মধ্যে একটি ছোট গোষ্ঠী গঠন করা হয় এবং নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার ফলে কোনও কোনও প্রশাসক এই গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দের মধ্যে কোনও একটি প্রশাসনিক সংগঠনের প্রতি বিশেষ মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। আবার একই গোষ্ঠীর সাহায্যে প্রশাসনিক সংগঠনের ভিতরে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করতে চেষ্টা করেন। আমেরিকার ন্যায় কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই গোষ্ঠীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা আড্ডার মাধ্যমে পরিচালনা করার নজিরও রয়েছে। সাধারণত কোনও সংগঠনের কর্মীগণ প্রতিষ্ঠানের ভিতরে কোনও বিষয় আলোচনা খোলাখুলিভাবে করতে চান না। এই সকল ক্ষেত্রে গুজব, ঘরোয়া সংবাদ প্রবাহকে কাজে লাগানো হয়। এই সকল গুজবের সদ্ব্যবহারের ফলে ক্ষেত্রবিশেষে সুষ্ঠু জনমত গঠন করা সম্ভবপর হয়। একজন প্রশাসক সাধারণত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে কর্মীগণের মনোভাব সম্পর্কে সচেতন থাকতে চেষ্টা করেন। তার ফলে যে, কেবলমাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে সন্তোষ বিরাজ করে তা-ই নয়—প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণও সহজসাধ্য হয়। তবে একথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, ঘরোয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা সংগঠনের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর।

১১.৮ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত প্রেরণা

ঘরোয়া যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত প্রেরণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সংবাদ বা তথ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে না। কোনও একজন কর্মী নিজস্ব প্রচেষ্টায় বা প্রেরণায় সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহ করেন, বণ্টন করেন এবং

সংবাদের গুণাগুণ বিচার করেন, সংবাদ বা তথ্যের ফলাফল বিশ্লেষণ করেন এবং তা প্রচার করেন। যদি তিনি এই ধারণা গ্রহণ করেন যে প্রশাসনিক কর্মীর মনোভাবের ফলে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে তবে তিনি সেই সংবাদ বা তথ্য প্রচারে বাধা সৃষ্টি করেন। সংবাদ বা তথ্য প্রেরণ করার পূর্বে একজন কর্মী নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন করা প্রয়োজন কেন তা ব্যাখ্যা করা হ'ল ঃ

১। উক্ত তথ্য বা সংবাদ প্রচারের ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনোভাবের কোনও নেতিবাচক পরিবর্তন হবে কি না সেই বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করা।

২। ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রেরণ করা হবে কি না এবং সংবাদ সর্বাগ্রে প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করা যাবে কি না সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তথ্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত করা।

৩। সংবাদ প্রেরক প্রকৃত সংবাদ বা তথ্য প্রেরণ করতে সক্ষম কি না ইত্যাদি।

১১.৯ আধুনিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া

আধুনিক যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত হয়। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে সকল মাধ্যমগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে আছে, তার মধ্যে শব্দ গঠন প্রক্রিয়া (processor) টেবিলস্থ প্রকাশনার বিষয়াদি (Desk Top Publisher) ক্ষুদ্র ছবি (Micro Film) ক্ষুদ্র গণনাকারী যন্ত্র (Micro computer) প্রভৃতি এই সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা গণনাকারী যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই সকল যান্ত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রণালী সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে একটি পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করে। এই সকল যান্ত্রিক কৌশলগুলিকে নিছক প্রশাসনিক কৌশল হিসেবে পর্যালোচনা না করে প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তথ্য ও সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে আধুনিকতম মাধ্যম হিসেবে অত্যাধুনিক গণক যন্ত্রের দায়িত্ব অপরিহার্য। সংবাদ ব্যবস্থার নমুনা স্থির করা একটি অত্যাধুনিক পেশা। তথ্যের পরিচালনাকে একটি নিছক কৌশল হিসেবে না দেখে প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে দেখতে হবে এবং এর পূর্ণ ব্যবহারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

১১.১০ যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা

একটি সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অন্তর্ভুক্ত লোকেরা কয়েকটি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, যেমন ঃ—

১। তথ্যাদির জন্য সাহায্য নেওয়ার অসুবিধা

২। তথ্য প্রেরণ প্রণালীতে বিশৃঙ্খলা

৩। প্রকৃত স্মৃতি শক্তির অভাব

৪। তথ্য সংগ্রহকারীর অমনোযোগ

৫। তথ্য প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে অবিশ্বাস

৬। তথ্য সম্পর্কিত অসংলগ্ন ব্যাখ্যা

৭। আলোচনার বিষয় সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা

৮। তথ্যের সামঞ্জস্যহীন বিশ্লেষণ

৯। উদ্দেশ্যের অসংলগ্ন ব্যাখ্যা

১০। তথ্যের অসময়জনিত ব্যাখ্যা

১১। তথ্য প্রেরক ও প্রাপকের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

১২। ভাষার স্বচ্ছতার অভাব

উপরিউক্ত প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধকতারই সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব নয়। ক্ষেত্রবিশেষে প্রকৃত তথ্য বা সংবাদ গ্রহণে অসামঞ্জস্য থাকার ফলে এবং তথ্যের প্রাপকের বিশৃঙ্খল মনোভাবের ফলে এই সকল অসুবিধা দেখা যেতে পারে। আবার প্রেরক যদি তার পছন্দ অনুসারে নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করেন তবে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি কর্মীর মধ্যেই তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেওয়ার প্রণবতা দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একজন প্রাপকের মনোভাব এবং প্রেরকের মনোভাবের মধ্যে একটি বিভেদ সৃষ্টি হয়; ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে একজন প্রাপকের ক্লান্তিকর পরিবেশ এবং তথ্য প্রেরণের অলসতার ফলে সুসজ্জিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রেরণ করা সম্ভবপর হয় না। আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মৌখিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় খোলাখুলি আলোচনা সম্ভবপর হয় না; কারণ যোগাযোগের দায়িত্বভার গ্রহণকারী আবার খোলাখুলি আলোচনায় যোগদান করতে আপত্তিবোধ করেন এবং এর ফলে সুষ্ঠু যোগাযোগ পরিচালনা করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ প্রতিশব্দের বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে গ্রহণ করেন এবং এর ফলে একটি তথ্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়। আবার অর্থের প্রাচুর্যও অনেক সময় সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। মিলেটের মতে, কয়েকটি প্রয়োজনীয় নীতির উপর নির্ভর করে একটি সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। যেমন, তথ্য সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা, প্রাপকের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য প্রেরণ করা, প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের যোগান দেওয়া, সময়মতো সংবাদ প্রেরণ করা এবং সর্বজনগ্রাহ্য বার্তা প্রেরণ করা এবং ব্যক্তি ও সংগঠনের মধ্যে ধারণা ও ক্রিয়াকলাপের সামঞ্জস্য বজায় রাখা প্রভৃতি। টেরির (Terry) মতে, আটটি নীতির উপর নির্ভর করে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায়।

১। তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা।

২। প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক।

৩। প্রেরক এবং প্রাপকের তথ্য গ্রহণ এবং প্রেরণের ক্ষেত্রে একই ধরনের জ্ঞান প্রয়োজন।

৪। ব্যবহারযোগ্য শব্দের প্রয়োগ।

৫। তথ্যের বিষয় সম্পর্কে বিশ্বস্ততা।

৬। প্রাপকের মনযোগ আদায় করা ও ধরে রাখা।

৭। বিভিন্ন উদাহরণ ও ছবির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা।

৮। তথ্যের ফলাফল সম্পর্কে সচেতনভাবে অপেক্ষা করা।

আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক সংগঠনগুলির দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষির ক্ষেত্রে, সেচের ক্ষেত্রে বা জেলা ও পঞ্চায়েত প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপেই একটি সংগঠনের দায়িত্ব হ'ল জনসাধারণের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কাজেই আধুনিক যুগে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত, বিজ্ঞানসম্মত (তথ্য-নির্ভর) এবং কল্যাণকর সরকারী সিদ্ধান্তের প্রয়োজনে অপরিহার্য।

১১.১১ সারাংশ

যোগাযোগ যে কোনও প্রশাসনিক সংগঠনের একটি নীতি। মানুষের শরীরে যেমন রক্তের কাজ থাকে যোগাযোগও সংগঠনগুলিতে সেইরূপ কাজ করে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ননা মাধ্যম থাকে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমগুলির উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা নানাপ্রকারের হয়। প্রায় সব প্রকারের যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচালনার জন্য দক্ষতার প্রয়োজন হয়। একটি সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পরিকাঠামো নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায় যদি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা থাকে।

১১.১২ অনুশীলনী

১। প্রশাসনিক সংগঠনে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

২। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্ন মাধ্যমগুলি আলোচনা করুন।

৩। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতাগুলি কি কি?

১১.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১। Avasthi and Maheswari : *Public Administration,* Lakshmi Narayan Aggra, Agra.

২। Mohon, Krishna, Banerjee : *Developing Communication Skills,* Rajasthan, 1990.

৩। Bernard : *Organisation and Management,* 1948.

একক ১২ ❑ নেতৃত্ব

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য
১২.১ প্রস্তাবনা
১২.২ নেতৃত্বের অর্থ, সংজ্ঞা প্রকৃতি ও দায়িত্ব
১২.৩ নেতৃত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
১২.৪ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং নেতৃত্ব
১২.৪.১ অগাধ কৌতুহল, বিস্তীর্ণ চিন্তাশীলতা এবং মেধা
১২.৪.২ উচ্চমানের বুদ্ধিমত্তা
১২.৪.৩ মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা
১২.৪.৪ মনুষ্য সম্পর্কে বিশ্বাস উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা
১২.৫ নেতৃত্বের গুণাগুণসমূহ
১২.৬ সারাংশ
১২.৭ অনুশীলনী
১২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- নেতৃত্বের সংজ্ঞা
- নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি
- নেতৃত্বের কার্যাবলী ও গুণাগুণসমূহ
- নেতৃত্বের বিভিন্ন কৌশল ও সমস্যা

১২.১ প্রস্তাবনা

রাজনীতির জগতের সঙ্গে "নেতা" শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণত নেতা শব্দটির দ্বারা আমরা রাজনৈতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে নির্দেশ করি। ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রীকে পার্লামেন্ট বা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ

দলের নেতা বলা হয়। রাজ্যস্তরে মুখ্যমন্ত্রীও রাজ্য আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাছাড়া রাজ্যসভায় এবং লোকসভায় প্রত্যেক দলের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য সেই সব দলের নেতা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকেন। লোকসভায় যখন কোনও একটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকে না তখন কয়েকটি দলের মিশ্র সরকার গঠিত হয়। সেই সব দলগুলির মধ্যে যিনি নেতা নির্বাচিত হন তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার চালানোর দায়িত্ব পান। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নেতা শব্দটির দ্বারা কোনও সংগঠনের প্রশাসনিক প্রধানকে নির্দেশ করা হয়। এক্ষেত্রে বিভাগীয় সচিব, বিভাগীয় অধিকর্তা একজন তত্ত্বাবধায়ক, একজন পরিচালক প্রভৃতি প্রশাসনিক নেতা হিসেবে গণ্য। আবার, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকেও একজন নেতা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এঁরা শিক্ষা জগতের বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন।

সংগঠনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব এক বিশেষ নেতৃত্ব দেবার উপযোগী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং তিনি উক্ত সংগঠনের দায়িত্বভার সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। কার্যকরীভাবে একজন নেতা একজন পরিচালক, তবে তিনি ব্যবস্থাপনার সকল কাজ করেন না। তিনি একটি সংগঠনকে নিজস্ব লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সদস্যগণকে উৎসাহিত এবং প্রভাবিত করেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, একটি সংগঠনের কার্যভার পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক কর্মীবৃন্দকে একত্রিত করা, কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা প্রভৃতি একজন প্রশাসনিক কর্তার মূল উদ্দেশ্য।

১২.২ অর্থ, সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও দায়িত্ব

নেতৃত্ব শব্দটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন প্রশাসনবিদ্‌গণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন। এঁদের মধ্যে বারনার্ডের নামে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বারনার্ড-এর মতানুসারে, নেতৃত্বের প্রকৃত সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভবপর নয়। তাঁর ভাষায়, 'আমি মনে করি যে, আজও কোনও নেতা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অথবা স্বচ্ছন্দভাবে তাঁর নেতা হওয়ার কারণ বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করতে অক্ষম। আবার তাঁর অধীনস্থ কর্মীবৃন্দও এই নেতার নির্দেশ মেনে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেন না। বারনার্ডের কথায়, "Indeed I have never observed any leader who was able to state adequately and intelligently why he was able to be a leader"। একজন নেতৃত্বের স্থান দখলকারী ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রেই নিজস্ব বক্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে একজন নেতা ব্যক্তিগত খ্যাতিবৃদ্ধির উপর বিশেষ নজর দেওয়ার ফলে সকলেই ভুলে যায় যে নেতৃত্ব শব্দটিকে দুইদিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অভিধানিক অর্থে নেতৃত্ব হ'ল পরিচালনা করা (to lead)। এই পরিচালনা করা শব্দটি আবার দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি হ'ল "প্রভাবিত করা, সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া এবং সমাজে সুনাম অর্জন করা (to excell, to be in advance, to be promised)। আবার দ্বিতীয় অর্থে, নেতৃত্ব হ'ল অন্যকে পরিচালনা করা, সাংগঠনিক প্রধান হিসেবে গণ্য হওয়া এবং উপদেশ প্রদান করার ক্ষমতা অর্জন করা।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে ব্যক্তিগত নেতৃত্ব এবং পরিচালনগত নেতৃত্বের মধ্যে একটি সীমারেখা টানা যেতে পারে। সাধারণত কোনও একজন ব্যক্তি নেতৃত্বের ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তাকে পরিচালনা করার কাজকর্মে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। কোনও নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হ'লে প্রথমেই যে কথা

মনে রাখা আবশ্যক তা হ'ল যে কার্যগতভাবে একজন নেতার দায়িত্ব অবশ্যই কর্মীবৃন্দের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা নয় ; একজন স্বৈরাচারী শাসকের ন্যায় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করা তার মূল কর্তব্য নয়। একজন দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রশাসক তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের দ্বারা এবং বন্ধুত্বপূর্ণভাবে প্রশাসনিক কার্যভার পরিচালনা করতে অভ্যস্ত। কাজেই তিনি একজন প্রকৃত নেতা যিনি জনগণকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যান এবং একত্রিভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উপনীত হন ("Leadership in large organisation may be defined as influencing and energizing the people to work together in a common effort to achieve the purpose of the enterprise).

টেরির (Terry) ভাষায়, জনগণকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করাই একজন নেতার মূল উদ্দেশ্য (The activity of influencing people to strive willingly formulate logistic)। কাজেই, একজন নেতা নিজ ক্ষমতা বলে তার কর্মী সকলকে প্রভাবিত করেন এবং সকলকে প্রশাসনিক লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

সেকলার হাডসনের (Seckler Hudson) মতে, একটি বৃহৎ সংগঠনের তিনিই একজন নেতা যিনি তার কর্মীবৃন্দকে একটি প্রশাসনিক লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রভাবিত এবং উৎসাহিত করতে পারেন।

বারনার্ড-এর মতে, নেতৃত্ব বলতে কোনও ব্যক্তির আচরণকে নির্দেশ করে, যার ফলে তিনি অন্য ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কার্যভার পরিচালনা করতে সাহায্য করেন। সুতরাং বারনার্ডের মতে, নেতৃত্ব তিনটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল (১) ব্যক্তি, (২) অনুসরণকারী এবং (৩) অবস্থা।

উপরোক্ত আলোচনার উপর নির্ভর করে একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নেতার দায়িত্বকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) নির্দেশ প্রদান করা, (২) নিয়ন্ত্রণ করা, (৩) সমন্বয়সাধন করা এবং (৪) প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে কার্যকরী করা।

একথা মেনে নেওয়া হয় যে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একজন নেতার দায়িত্বভার বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু একজন নেতা হিসেবে প্রশাসকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। তবে, এক্ষেত্রে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা গড়ে উঠেছে যে, একটি সংগঠনের নেতার প্রধান দায়িত্ব হ'ল কর্মীবৃন্দকে প্রভাবিত এবং উৎসাহিত করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, একটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করা। সেকলার হাডসন (Seckler Hudson)-এর মতে, একটি ক্রমবর্ধমান সংগঠনের কর্মপরিধির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংগঠনের কার্যাবলীর জটিলতা প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি, দক্ষ কর্মীর প্রয়োজনীয়তা এবং সামাজিক প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে একজন নেতার দায়িত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বারনার্ড (Barnard)-এর মতে, একজন প্রকৃত নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উক্ত তিনটি আচরণ নির্দেশ করা যেতে পারে—(১) ব্যক্তি হিসেবে একজন নেতা, (২) কি ধরনের কর্মীবৃন্দকে তিনি প্রভাবিত করেন, (৩) পরিবেশ, অর্থাৎ কি ধরনের প্রশাসনিক পরিবেশে তিনি কর্মীবৃন্দের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব দায়িত্বভার পরিচালনা করেন।

আবার মিলেটের (Millet) মতে, দায়িত্বভার পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং প্রতিষ্ঠানগত পরিবেশ

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক পরিবেশ বলতে সাধারণত এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যে ক্ষেত্রে একজন প্রশাসক বাহ্যিক রাজনৈতিক নির্দেশ এবং কর্তৃত্বের প্রতি দায়িত্বশীল থাকেন। আবার প্রতিষ্ঠানিক পরিবেশ বলতে একজন নেতার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করার ক্ষমতা এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠানিক সম্পর্কের দ্বারা প্রশাসনিক কার্যভার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে।

১২.৩ নেতৃত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

নুজ বেং ডোনেল (Koontz and Donnel) নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—(১) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, (২) পরিবেশ সচেতনা এবং (৩) মূল সূত্রধর হিসেবে একজন নেতার ভূমিকা। বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন নেতা সাধারণত প্রকৃত নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন এবং যে সকল কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেন এবং তা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করেন তাই নিজের চারিত্রিক বিশ্লেষণের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেন। এই নীতি অবলম্বন করেই সাধারণত পশ্চিমীদেশগুলিতে সামরিকবাহিনীর এবং পুলিশবাহিনীর কর্মচারীগণকে নিযুক্ত করা হয়। আধুনিক যুগে জার্মানীতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও পরীক্ষামূলকভাবে এই নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। কাজেই একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, একজন বিশেষ চরিত্রের অধিকারী নেতা হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিগণ সাধারণত অপর সকল নেতাগণকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেন, উৎসাহিত করেন এবং তার বৈশিষ্ট্য সকলকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। একথাও অনস্বীকার্য যে, প্রশাসনিক নেতৃত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রায় সকল নেতারই চরিত্রগত কিছু সামঞ্জস্য রয়েছে এবং প্রয়োজনোপযোগী বৈশিষ্ট্যসমূহ সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে সম্ভাবনা সূচক কোনও নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার নমুনা নির্ণয় করার সম্ভাবনা থাকে।

বারনার্ড-এর মতে, মূলত একজন নেতার দায়িত্বভার বিশ্লেষণ করতে গেলে চারটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। (১) নীতি নির্ধারণ করা, (২) অবস্থার সদ্ব্যবহার করা, (৩) উপায়ভূত প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ করা এবং (৪) প্রকৃত সমন্বয়সাধনের প্রয়াসে সুষ্ঠু অবস্থার সৃষ্টি করা। তবে বারনার্ড-এর তালিকায় নেতৃত্বের আরও চারটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—(১) জীবনীশক্তি সম্পন্ন, (২) স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন, (৩) প্রত্যয় উৎপাদনের দক্ষতা এবং (৪) দায়িত্ব এবং বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি। বারনার্ড-এর মতে, গুরুত্ব অনুসারে একজন নেতার এই সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সকল সাজানো হয়ে থাকে।

টেরি (Terry)-এর মতে—(১) উৎসাহ, (২) মানসিক দৃঢ়তা, (৩) মানসিক সম্পর্কের জ্ঞান, (৪) ব্যক্তিগত প্রেরণা, (৫) যোগাযোগ স্থাপন করার ক্ষমতা, (৬) শিক্ষা প্রদানকারী ক্ষমতা, (৭) সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং (৮) প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রভৃতি নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

অনেকের মতে, একজন প্রশাসনিক নেতা সকল ক্ষেত্রেই দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছুক কর্মীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন ; কার্যভার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। স্থিরভাবে অপরের অভিযোগ সকল মনোযোগসহকারে শোনেন।

তীক্ষ্ণ প্রশ্নের দ্বারা অনুযোগের প্রকৃত কারণ নিরূপণ করেন। বিভিন্ন কর্মীবৃন্দের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। সক্ষম কর্মীকে অধীনস্থ কর্মচারী হিসেবে পছন্দ করেন। একা দায়িত্বভার পরিচালনা করতে অভ্যস্ত নন। এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বিশ্বাসী নন। সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা সকল কার্যভার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব কেবলমাত্র সে সকল ক্ষেত্রেই ক্ষমতার প্রয়োগ করেন। তিনি স্থির বুদ্ধির দ্বারা দুঃসংবাদ এবং সুসংবাদ উভয়ই গ্রহণ করতে সক্ষম। অধীনস্থ কর্মীবৃন্দকে প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করেন, সর্বদাই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রীতিনীতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীলতা প্রদর্শন করেন।

১২.৪ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং নেতৃত্ব

আধুনিক যুগে প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে একটি বিজ্ঞান বলে ধরে নেওয়া হয় ; ফলে, প্রশাসকগণ পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে প্রকৃত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। যদিও প্রশাসনিক কার্যভার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা একজন প্রশাসকের সহজাত বৃদ্ধি হিসেবে মেনে নেওয়া হয় তবুও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া জটিল এবং প্রয়োগভিত্তিক হওয়ার ফলে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন নেতা কিংবা প্রশাসককে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বারনার্ড প্রয়োজন অনুসারে নেতা তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করেছেন এবং প্রকৃত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী নেতার কথা বলতে গিয়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন।

১২.৪.১ অগাধ কৌতূহল, বিস্তীর্ণ চিন্তাশীলতা এবং মেধা

এই সকল সহজাত প্রবৃত্তি সকলকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে একজন নেতার পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। একজন নেতাকে নিজস্ব প্রচেষ্টায় অর্জন করা শিক্ষার (self-education) সঙ্গে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ; ফলে, একজন প্রশাসক সুষ্ঠুভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে কর্মভার পরিচালনা করতে সক্ষম হন। বারনার্ড মনে করেন যে, প্রত্যেক নেতাকেই প্রয়োজন অনুসারে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে বাৎসরিক ছুটির ব্যবস্থা করা উচিত। এর ফলে, একজন প্রশাসক নিজস্ব দপ্তর সম্পর্কীয় দায়-দায়িত্ব থেকে বিরত থেকে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হন।

১২.৪.২ উচ্চমানের বুদ্ধিমত্তা

উচ্চমানের বুদ্ধিমত্তা, ভালমন্দ বিচার করা, ক্ষমতার অধিক শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে একজন নেতা আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাগত জটিল কৌশলসমূহ সহজেই করায়ত্ত করতে পারেন এবং সুষ্ঠু প্রশাসকি ব্যবস্থা পরিচালনা করতে সক্ষম হন। কাজেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা একজন প্রকৃত নেতা গঠনের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বলে ধরে নেওয়া হয়। নেতার উচ্চমানের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ক্ষমতা থাকা দরকার।

একজন প্রশাসক, প্রকৃত অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিচার শক্তির অধিকারী। নিজস্ব ক্ষমতা বলে তিনি আধুনিক জগতের সকল প্রকার প্রযুক্তিবিদ্যাগত জটিল কৌশলসমূহ প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। এই সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন প্রশাসক রূপে পরিচিত ব্যক্তিত্বের পক্ষে প্রশিক্ষণ গ্রহণ অবশ্যই তাঁর বৃত্তি ও জীবিকার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

১২.৪.৩ মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা

বারনার্ড মনে করেন যে, একজন প্রশাসক অবশ্যই মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সচেতন মনোভাব গ্রহণ করবেন। মানবিক সম্পর্কের সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বারনার্ড তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন ঃ

১। আপেক্ষিক আচরণের প্রশংসাসূচক দিক

২। সাধারণ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা

৩। কোনও আনুষ্ঠানিক সংগঠনকে একটি জৈবিক এবং বিবর্তনবাদী ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেওয়া।

সাধারণত কোনও সংগঠনই একটি পূর্ব পরিকল্পিত ধারণার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠতে পারে না। তার একমাত্র কারণ হ'ল যে মানবসমাজ ছাড়া কোন সংগঠনই গড়ে ওঠে না এবং এই মানবসমাজ যেহেতু কোনও না কোনও আচরণের দ্বারা প্রভাবিত কাজেই একজন প্রশাসককে এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়ই। এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রকৃত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অবশ্যই।

১২.৪.৪ মনুষ্য সম্পর্কে বিশ্বাস উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা

একটি গণতান্ত্রিক সমাজে প্রশাসনিক নেতার সফল নেতৃত্বের প্রথম উদ্দেশ্যই হ'ল সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মীবৃন্দের মধ্যে বিশ্বাস উৎপাদন করা, অর্থাৎ একজন প্রশাসক কর্মীগণের মন জয় করেন এবং সকল ব্যক্তিকে প্রভাবিত করার ধরনসকল প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে যে প্রশ্ন প্রায়শই জনসমক্ষে উদ্ভাসিত হয় তা হ'ল এই সকল প্রয়োগ প্রণালী সম্পর্কে একজন প্রশাসককে শিক্ষিত করে তোলা। এক্ষেত্রে বারনার্ড দু'টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন ঃ (১) জ্ঞান (knowledge) এবং দক্ষতা (skill)। এই দু'টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন প্রশাসক সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে প্রকৃত নেতার ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হন। বারনার্ড-এর মতে, জ্ঞান এবং দক্ষতা উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ কতকগুলি পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। তাঁর মতে, এই উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি একজন নেতার চরিত্র গঠনে অত্যাবশ্যক। তাঁর মতে, প্রশাসনিক দক্ষতা একটি কার্যকরী আচরণ যার ফলে অফুরন্ত প্রশাসনিক জটিলতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো নেতৃত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সর্বক্ষেত্রে যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে না। সুতরাং প্রশিক্ষণের ফলে সকল সমস্যার মোকাবিলা সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র দক্ষতার মাধ্যমেই একজন প্রশাসক সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে সক্ষম হন। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে দূরদর্শিতা একজন প্রশাসককে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। একথাও

অনস্বীকার্য যে, বিশেষ একজন প্রশাসকের কার্যনির্বাহের ক্ষমতা এবং জ্ঞান প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সম্ভব। কাজেই উভয় প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু সংমিশ্রণের ফলে একজন প্রকৃত নেতা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত হন। কাজেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একজন নেতার নিযুক্তিকরণ থেকে শুরু করে তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, তার আনুষ্ঠানিক এবং ঘরোয়া অভিজ্ঞতা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রয়োগের ফলে একজন সময়োপযোগী নেতা নিয়োগ করা সম্ভব.

১২.৫ নেতৃত্বের গুণাগুণসমূহ

যৌথভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কার্যভার পরিচালনা করাই একটি সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। এই ভাবেই সাধারণত একটি সংগঠনের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং উন্নততর কার্যাবলী পরিচালনা করার ক্ষমতা গড়ে ওঠে। আচরণবাদী গবেষণামূলক বিজ্ঞান এমন একটি ব্যক্তিত্বকে নেতা হিসেবে দেখতে চেষ্টা করেন যিনি প্রকৃত নেতৃত্বকে সংগঠনের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসেবে তৈরী করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় চারটি বিশেষ দিক আলোচনা করা হ'ল ঃ

১। প্রকৃত নেতা একটি সংগঠনের প্রত্যেকটি সদস্যকে একত্রিত করেন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কর্মীবৃন্দের মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রতি মনোভাব গড়ে তোলেন।

২। প্রত্যেকটি কর্মীই নিজেকে তাঁর নিজস্ব সংগঠনের একজন অত্যাবশ্যকীয় অংশ বলে মনে করেন। একজন নেতাই কর্মীবৃন্দের মধ্যে এই মানসিক প্রস্তুতি গঠনে সাহায্য করেন।

৩। প্রকৃত নেতৃত্বের ফলে একটি সংগঠনের কর্মীবৃন্দ সংগঠনকে নিজস্ব লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। কোনও সদস্যকে দায়িত্বপূর্ণভাবে কার্যভার পরিচালনার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে উৎসাহিত করা একজন প্রকৃত নেতারই কৃতিত্ব।

৪। একজন সফল নেতা সংগঠনের কার্যভার পরিচালনা করার উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রয়োগ করেন। প্রয়োগিক বিজ্ঞানের সুবিধাসমূহের সুযোগ প্রদান করেন। এর ফলে একজন কর্মী তাঁর নিজস্ব দায়িত্বভার পরিচালনার ক্ষেত্রে সফল হন। অর্থাৎ, সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একজন নেতা কার্যভার পরিচালনা, পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেন এবং সফল নেতা অবশ্যই সর্ববিষয়েই সজাগ দৃষ্টি রাখেন। যে দু'টি বিষয়ের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয় তা হ'ল—(১) জনগণ এবং (২) উৎপাদন। কেবলমাত্র একটি সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে একজন নেতার দায়িত্ব সম্পন্ন হয় না। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্বভার পরিচালনা করার পথে সংগঠনের কর্মীবৃন্দকে উৎসাহিত করা, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা এবং সংগঠনকে নিজস্ব লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করাই একজন প্রকৃত নেতার মূল উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

১২.৬ সারাংশ

এই এককে আমরা বিভিন্ন সংগঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা আলোচনা করেছি। আধুনিক যুগে সংগঠনগুলি, তা

সেগুলি সরকারী হউক কিংবা বেসরকারী হউক, নেতৃত্বের গুণে সক্রিয় ও সজীব হয়ে ওঠে। প্রকৃত নেতৃত্বের ফলে একটি সংগঠনের কর্মীবৃন্দ সংগঠনকে নিজের লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্বভার পরিচালনা করার পথে সংগঠনের কর্মীবৃন্দকে উৎসাহিত করা এবং সংগঠনকে নিজস্ব লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করাই একজন প্রকৃত নেতার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

১২.৭ অনুশীলনী

১। নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা কি?

২। নেতৃত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৩। নেতৃত্বের গুণাগুণসমূহ বিশ্লেষণ করে প্রকৃত নেতার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Barnard Chester 1 : Organisation and Management, Harvard University Press, Cambridge, 1948

২। Terry : Principles of Management, 1956.

৩। Newman : Administrative Action, 1953.

একক ১৩ ❑ সমন্বয়

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য

১৩.১ প্রস্তাবনা

১৩.২ সমন্বয়ের অর্থ ও সংজ্ঞা

১৩.৩ সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা

১৩.৪ সমন্বয়ের কার্যক্রমিক ও বস্তুগত উপাদান

১৩.৫ সমন্বয় প্রক্রিয়া ও নির্ভরশীলতা

১৩.৫.১ মান অনুসারে কার্য নির্ধারণ

১৩.৫.২ পরিকল্পিত সমন্বয়

১৩.৫.৩ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমন্বয়

১৩.৬ বিভিন্ন ধরনের সমন্বয়

১৩.৭ সমন্বয় এবং কর্তৃত্ব

১৩.৮ সমন্বয়ের সুষ্ঠু প্রক্রিয়া

১৩.৯ সমন্বয়সাধনের বিভিন্ন উপায়সমূহ

১৩.১০ সমন্বয়ের অন্যান্য মাধ্যমসমূহ

১৩.১১ সমন্বয় ব্যবস্থার অসুবিধাসমূহ

১৩.১২ সারাংশ

১৩.১৩ অনুশীলনী

১৩.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১৩.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- সমন্বয়ের অর্থ, সংজ্ঞা এবং প্রশাসনে এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে
- সমন্বয়ের মাধ্যমগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে
- সমন্বয়ের অসুবিধাগুলি জানতে

১৩.১ প্রস্তাবনা

আধুনিকযুগে যে কোন সংস্থায়, তা আকারে ছোট হোক বা বড়ই হোক, বহুকর্মী একই সঙ্গে কাজ করে থাকে। একই সঙ্গে কাজ করার অর্থ হ'ল সংস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্যাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা। এই কর্মীবৃন্দ একই সঙ্গে একই রকমের কাজ করে থাকে না। তারা একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে থাকে। জন-প্রশাসনে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করাকে শ্রম বিভাগ বলা হয়। এই শ্রম বিভাগের সঙ্গে থাকা প্রয়োজন সমন্বয়। সমন্বয়—জেমস্ মুনির মতে, সংস্থার প্রথম ও প্রধান নীতি। এই এককে আমরা সমন্বয়ের অর্থ, সংজ্ঞা ও মাধ্যমগুলি আলোচনা করে এর বিভিন্ন অসুবিধাগুলির উপর আলোকপাত করব।

১৩.২ সমন্বয়ের অর্থ ও সংজ্ঞা

সমন্বয় শব্দটির অভিধানিক অর্থ সমশ্রেণীভুক্ত বা সমপদস্থ কর্মীগণের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক। সমন্বয় মানে একত্রিত করা—অবশ্য শুধুমাত্র সমশ্রেণীভুক্তই নয়, বিভিন্ন শ্রেণীভুক্তদেরও একই সমতলে নিয়ে এসে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যে পৌছবার প্রচেষ্টার মধ্যেও সমন্বয় প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ধরা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একই কাজের বিভিন্ন দিক বা অংশ থাকে। এক একটা অংশের কার্য পরিচালিত হয় এক একটি মানুষ বা দলের ওপর। এখন এই বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কাজের মধ্যে যদি সমন্বয় সৃষ্টি না করা যায় তবে সমগ্র কাজটি, যা নাকি একটি সংগঠন করে থাকে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরিচালন বিজ্ঞানের দার্শনিকগণের মতে, সাংগঠনিক সমন্বয় প্রশাসনিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞানসম্মত ধারণা। তবে আধুনিক মনোভাবাপন্ন প্রশাসনের ছাত্রছাত্রীদের নিকট সমন্বয় উন্নতিশীল প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর। এঁদের মতে, উন্নতশীল প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগীতার স্থান সমন্বয় অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাদের বিশ্বাস যে, প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই একটি সংগঠন উনতিসাধন করতে পারে, সমন্বয়ের মাধ্যমে নয়। আবার, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্বাস করে যে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ফলে বাহ্যিক ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অন্যান্য ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক আচরণ গড়ে উঠতে পারে। তবে সরকারী প্রশাসনিক অব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ অথবা অসন্তোষ প্রকাশ উভয় অবস্থাতেই সমন্বয় শব্দটি ঘন ঘন ব্যবহার করা হয়। সাধারণত সমন্বয় আন্তঃবিভাগীয় কার্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় অংশ। সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যভার পরিচালনায় সক্ষম হয়; নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে চেষ্টা করে। পরম্পরাগত পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া হয়। সাধারণত একজন প্রশাসকের পক্ষে কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার একা পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। সংগঠনের অন্যান্য কর্মীর যৌথ প্রচেষ্টার ফলেই তিনি তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে সফল হন। কাজেই প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সমন্বয় কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় নয়; একটি জটিল এবং দুঃসাধ্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমন্বয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার একটি জটিল অংশ। সেইদিক থেকে বিচার করলে সমন্বয় হ'ল কর্মীবৃন্দের মধ্যে প্রশাসনিক লক্ষ্যের পথে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়া।

বিভিন্ন প্রশাসনবিদ্‌গণ সমন্বয় শব্দটির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এল. ডি. হোয়াইট (L. D. White)-এর মতে, সমন্বয় হ'ল বিভাগীয় কার্যাবলীর সুষ্ঠু বিভাজন, সঙ্ঘবদ্ধভাবে দায়িত্বভার পরিচালনার ইচ্ছা এবং সংগঠনের কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগীতা।

১৩.৩ সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা

মুনির ভাষায় সমন্বয় হ'ল কোনও একটি গোষ্ঠীর শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কার্যভার পরিচালনার প্রয়াস এবং একই উদ্দেশ্যের দিকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়ের প্রয়াজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ঃ

১। সাধারণত আন্তঃবিভাগীয় সংস্থাগুলির মধ্যে একই দায়িত্বের পুনরাবৃত্তি হ'লে সংঘাত বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, কারণ প্রত্যেকটি বিভাগই নিজস্ব এলাকার উপর সম্পূর্ণ দখল প্রত্যাশা করে অথবা কোনও একটি বিশেষ এলাকার উপর কোনও না কোনও বিভাগ নিজস্ব দখল প্রত্যাশা করে। সুষ্ঠু সমন্বয়ের ফলে এই দায়িত্বভার বণ্টনের ক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খলা দূর করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পরে যে, কলকাতা শহরে গৃহ নির্মাণ করতে গেলে সেই গৃহের ছক বা পরিকল্পনা গৃহ নির্মাণ বিভাগের নিকট পেশ করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করার পর গৃহ নির্মাণ কার্য শুরু হয়। তবে পরবর্তীকালে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুমতি বিদ্যুৎ বিভাগ অথবা কলকাতা বিদ্যুৎ সংস্থা প্রদান করে। জল সরবরাহের অনুমতি জল সরবরাহ বিভাগের দায়িত্ব। কর গ্রহণ করার দায়িত্ব কলকাতা পৌর নিগমের। তবে এই সকল দায়িত্বের সুষ্ঠু বিভাজন কিংবা নির্ধারিত এলাকায় প্রত্যেকটি বিভাগের পূর্ণ সহযোগিতা একটি সুষ্ঠু সমন্বয়ের দ্বারাই সম্ভব।

২। কর্মীবৃন্দের মধ্যে প্রশাসন-সম্পর্কিত উচ্চ ধারণা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সমন্বয়ের পক্ষে একটি জরুরী পদক্ষেপ।

৩। প্রয়োজনীয় ব্যক্তি এবং সময়োপযোগী সম্পদ যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা এবং সকল সরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনায় প্রকৃত সমন্বয় অত্যধিক প্রয়োজনীয় উপাদান। কারণ হিসেবে বলতে হয়, যেহেতু প্রত্যেকটি সরকারি বিভাগ এবং প্রতিনিধিমূলক বিভাগসমূহ অত্যধিক দায়িত্বভার পরিচালনা করে সেই হেতু প্রত্যেকটি কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সুষ্ঠু সমন্বয় ব্যবস্থার প্রয়োগে আগ্রহী।

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার প্রকৃত সমন্বয়ের নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়। নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করলে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত দ্বন্দ্ব এবং একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির অবসান ঘটানোই সমন্বয়ের মূল উদ্দেশ্য। আবার ইতিবাচকভাবে সমন্বয়ের প্রয়োগ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব এবং সহকর্মীদের মধ্যে অন্তরঙ্গ মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। টেরির মতে, সমন্বয় হ'ল একটি প্রশাসনিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস, যার ফলে প্রত্যেকটি কর্মীর সরকারী কার্যভার সুষ্ঠু এবং সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন করার ইচ্ছার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

মুনির ভাষায়, একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মূল উৎস হ'ল সমন্বয় ; কাজেই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতি সমন্বয়ের মাধ্যমে অন্যান্য অধস্তন বিভাগসমূহ নিজস্ব কার্যভার পরিচালনা করে।

নিউম্যানের মতে, সমন্বয়ের ফলে সংগঠনের কর্মীবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধভাবে উদ্দেশ্যসাধনে সচেষ্ট হন এবং সময়োচিত উপায়ে পরিমিত দায়িত্বভার পরিচালনার প্রয়াসে প্রকৃত উদ্দেশ্যের পথে সম্মিলিত হন।

কাজেই, সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগসমূহ দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেও সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং সুসঙ্গতভাবে নিজস্ব কার্যভার পরিচালনা করে থাকে। স্বল্প সময়ের উদ্দেশ্যের পথে দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে যায় এবং স্বল্প ব্যয়ে প্রতিষ্ঠানিক কার্যাবলী পরিচালনা করে।

১৩.৪ সমন্বয়ের কার্যক্রমিক ও বস্তুগত উপাদান

হার্বার্ট সাইমন সমন্বয়ের কার্যক্রমিক এবং বস্তুগত উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। (১) কার্যক্রমিক সমন্বয় বলতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক নক্সার মাধ্যমে কর্তৃত্বের পথ নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। (২) কার্যের সীমা নির্ধারণ করে এবং (৩) সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণের দায়িত্বের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দেশ করে। (৪) কার্যক্রম সম্বন্ধীয় দায়িত্ব প্রদান করে। বস্তুগত সমন্বয় একটি সংগঠনের কার্যাবলীর সুষম ব্যাখ্যা প্রদান করে। যেমন, সরকারী কৃষিনিগম দুইটি বিভাগ নিয়ে গঠিত ঃ (১) বহিঃকেন্দ্রিক অথবা সম্প্রসারিত বিভাগ এবং (২) গবেষণা বিভাগ। উভয় বিভাগেরই নিজস্ব কার্যক্রম এলাকা নির্ধারিত থাকে এবং নিজস্ব দায়িত্বভার উক্ত সীমারেখার মধ্যেই সম্পন্ন করতে চেষ্টা করে। প্রয়োজনে এবং কৃষিনিগম অধিকর্তার নির্দেশে ক্ষেত্রবিশেষে উভয় বিভাগই সম্মিলিতভাবে কার্যভার পরিচালনা করতে বাধ্য হয়। এই আন্তঃবিভাগীয় সম্মিলিত এবং সুষ্ঠু প্রশাসনিক কার্যভার পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানই সমন্বয়ের মূল উদ্দেশ্য।

১৩.৫ সমন্বয় প্রক্রিয়া ও নির্ভরশীলতা

সাংগঠনিক তত্ত্বে সমন্বয় প্রক্রিয়াকে আন্তঃবিভাগীয় নির্ভরশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়। থম্পসন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার নির্ভরশীলতার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্দেশ করেন। (১) একত্রিত পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, (২) অনুক্রমিক নির্ভরশীলতা এবং (৩) প্রতিদানমূলক নির্ভরশীলতা। একত্রিত পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় সাধরণত সংগঠনের বিভিন্ন সংস্থাগুলি এমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, প্রত্যেকটি সংস্থা যদিও স্বাধীনভাবে কার্যভার পরিচালনা করে কিন্ত সমগ্র সংগঠনের সাফল্য সাধারণত যোগদানকারী সংস্থাসমূহের সম্মিলিত প্রয়াসে সম্ভবপর হয়।

অনুক্রমিক নির্ভরশীলতায় সংগঠনের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ এমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, প্রথম সংস্থার উৎপাদন দ্বিতীয় সংস্থার উপাদান ; কাজেই প্রথম সংস্থা উৎপাদন না করলে দ্বিতীয় সংস্থা উৎপাদনের অভাবে কার্যভার পরিচালনায় অক্ষম হয়। এই আন্তঃবিভগীয় নির্ভরশীলতাকে অনুক্রমিক নির্ভরশীলতা বলে অভিহিত করা হয়।

আবার যখন প্রতিটি সংস্থার উৎপাদন অপর সংস্থার উপাদান হিসেবে কাজ করে তখন এই প্রক্রিয়াকে প্রতিদানমূলক নির্ভরশীলতা বলে অভিহিত করা হয়। যেমন, একটি গাড়ী রাস্তায় বের করা তখনই সম্ভব যখন মেরামতির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আবার একটি গাড়ী পথ চলতে শুরু করলে তবেই পথ সংরক্ষণ বিভাগের দায়িত্ব শুরু হয়। অর্থাৎ, এই গাড়ী পরিবেশকে দায়িত্ব করছে কি না, পথ কর প্রদান করা হয়েছে কি না এই সকল বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। থম্পসনের মতে, সাধারণত তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত সমন্বয়সাধন করা সম্ভব : (১) মান অনুসারে কার্য নির্ধারণ করা, (২) পরিকল্পনাপ্রসূত সমন্বয়সাধন করা এবং (৩) পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমন্বয় গড়ে তোলা।

১৩.৫.১ মান অনুসারে কার্য নির্ধারণ

মান নির্ণয়কারী সংস্থার মূল দায়িত্ব হ'ল কতকগুলি বাহ্যিক নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে পরস্পর নির্ভরশীল প্রত্যেকটি সংস্থার উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। এই ধরনের সমন্বয় সাধারণত রুটিনমাফিক বা একই কার্যভার পরিচালনার ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। এই ধরনের সমন্বয় সাধারণত একটি স্থায়ী এবং একঘেয়ে দায়িত্ব নির্ধারণকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বর্তমান।

১৩.৫.২ পরিকল্পিত সমন্বয়

এই ব্যবস্থায় পূর্ব পরিকল্পিত কর্মসূচীর সাহায্যে পারস্পরিক নির্ভরশীল সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হয়। গতিশীল প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার এই ধরনের সমন্বয় অত্যন্ত উপযোগী।

১৩.৫.৩ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমন্বয়

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যে সকল তথ্য এবং সংবাদ আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়, তা সুষ্ঠুভাবে একটি বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের সমন্বয় ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তবে, এক্ষেত্রে পূর্বতন প্রক্রিয়া দু'টির ন্যায় পূর্ব সংস্থাপিত প্রণালীর মাধ্যমে সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হঠাৎ কোন গৃহে অগ্নিসংযোগ হ'লে অগ্নি নির্বাহক বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। আবার, আহত ব্যক্তিগণকে হাসপাতালে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে এম্বুলেন্স কিংবা মোটর গাড়ীর সাহায্য নেওয়া হয়। প্রয়োজনে এলাকার কোনও চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, আবার জরুরি অবস্থার মোকাবিলায় প্রতিবেশীর সাহায্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই আপৎকালীন সমন্বয় প্রক্রিয়াকে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সমন্বয় প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা যায়। সাংগঠনিক সমন্বয় ব্যবস্থাকে সাধারণত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় : (১) অভ্যন্তরীণ এবং (২) বাহ্যিক গঠনমূলক সমন্বয় উভয় ক্ষেত্রেই সমান্তরালভাবে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, একই স্তরে একজন কর্মীর সঙ্গে অপর কর্মীর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সমন্বয় ব্যবস্থাকে

আভ্যন্তরীণ সমন্বয় বলে অভিহিত করা হয়। আবার, বাহ্যিক ক্ষেত্রে এই জাতীয় সমন্বয় আন্তঃবিভাগীয় অথবা আন্তঃশাখাগত সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, এই ধরনের সমন্বয় সাধারণত বিভাগীয় কর্মীবৃন্দের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যেমন, একটি মহাবিদ্যালয়ের একই বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে বিষয়গত আলোচনার মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়গুলি সমভাবে বন্টন করা সম্ভব হয়। একমাত্র আভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্ভব। আবার একই মহাবিদ্যালয়ের আন্তঃবিভাগীয় শিক্ষক শিক্ষিকাগণ একত্রিত হন এবং নিজেদের দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পর্কিত কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই প্রক্রিয়া বাহ্যিক সমন্বয়ের ফলে বিভাগীয় প্রশাসক উক্ত বিভাগীয় কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে চেষ্টা করেন। আবার, একজন কর্মীও নির্দেশিত নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করেন। যথা, যদি একটি জমির রেজিষ্ট্রীকরণের জন্য জমির মালিক জমি রেজিষ্ট্রীকরণের প্রয়োজনে সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসে আপিল করেন তবে উক্ত বিভাগীয় প্রধান বিভাগীয় কর্মীবৃন্দকে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পেশ করতে নির্দেশ করেন। উক্ত কর্মী প্রয়োজনীয় নথিপত্রগুলি প্রশাসকের নিকট পেশ করেন এবং প্রশাসক এই নথিপত্র পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দিষ্ট কর্মীবৃন্দ এই নির্দেশ অনুসারে কার্যভার পরিচালনা করেন। প্রশাসনিক সমন্বয়ের এই প্রক্রিয়াকে খাড়া বা উল্লম্বভাবে পরিচালিত সমন্বয় হিসেবে অভিহিত করা হয়। এক্ষেত্রে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধারণত একজন মধ্যবর্তী কর্মীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, জন কার্যনির্ধারক বিভাগের (Public Works Department) এবং (Engineering) কারিগরী। বিভাগীয় প্রশাসক, সাধারণত পথঘাট সংযোজনের প্রয়াসে পথ সংশোধনের কার্যের সঙ্গে যুক্ত বিভাগীয় প্রশাসকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে, এক্ষেত্রে উভয় শাখার প্রধানগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং প্রয়োজনীয় যোগাযোগের ফলে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত নিম্নস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কার্যভার পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই প্রকার সমন্বয়কে উল্লম্বভাবে পরিচালিত সমন্বয় প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৩.৬ বিভিন্ন ধরনের সমন্বয়

অ্যাপল্‌বি (Appleby)-র মতে, একটি সাংগঠনিক স্তরবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত সমন্বয় সমান্তরালভাবে এবং উল্লম্বভাবে পরিচালিত হয়। উল্লম্বভাবে পরিচালিত সমন্বয় প্রক্রিয়া সাধারণত বিভিন্ন বিভাগীয় শাখা-প্রশাখা অথবা প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলির সঙ্গে সম্পর্ক সংস্থাপনের ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়। আবার সমান্তরালভাবে পরিচালিত সমন্বয় ব্যবস্থা সাধারণত, একজন প্রশাসকের অধীনস্থ কর্মীবৃন্দের মধ্যে কার্যকরী হয়; তবে ক্ষেত্র বিশেষে এই ধরনের সমন্বয় প্রক্রিয়া বিভিন্ন সংস্থাসমূহ এবং প্রতিনিধিমূলক সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। (Hierarchy functions with perpendicularly & horizontally. The horizontal relationship between units and agencies commonly regraded as co-ordination in a effort to distinguish between co-ordination affected and units responsible to a single executive in co-ordination at the level of units, administration at the level of the executive to whom they are responsible, whereas he in turn participates in co-ordination with other agencies at his level).

অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের সচিব একদিকে কিছু পরিমাণ চাল সংগ্রহের জন্য নির্দেশ প্রদান করলে উক্ত কার্যভার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব একজন জেলা প্রশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আবার সেই সচিবই ভারতীয় খাদ্য নিগমকে ভবিষ্যৎ প্রয়াজনে চাল জমা করে রাখার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু সমন্বয় প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে দায়িত্বভার পরিচালনা করতে সাহায্য করে আবার সমান্তরাল সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের সচিব ভারতীয় খাদ্য নিগমকে চালের রাজ্যভিত্তিক সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেন।

সুষ্ঠু সমন্বয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রেভস্ (Graves) মন্তব্য করেছেন যে, (১) প্রতিনিধিমূলক সংস্থাগুলির সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক, (২) ঘরোয়া যোগাযোগ, (৩) সাংগঠনিক নৈকট্য, (৪) একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের প্রয়োগ এবং (৫) সীমিত সংখ্যক অংশগ্রহণকারী নিয়োগ ইত্যাদি উপাদানের সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে একটি সংগঠন সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন করতে সক্ষম হয়। সরকারী সংগঠনসমূহ (governmental organisation) এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাসমূহ ও বিভিন্ন সরকারি নিগমসমূহ (corporation) সংযুক্তভাবে কোনও দায়িত্বভার সম্পন্ন করতে চেষ্টা করলে, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারে। ধরে নেওয়া যাক, দুই বন্ধু সঙ্গীত পরিচালনার কাজ আরম্ভ করেছেন। কোনও একটি সঙ্গীতের সুর সম্পর্কে উভয়েরই নিজস্ব একটি ধারণা রয়েছে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ধারণা সম্পর্কে কোন আলোচনাই করবেন না। উভয়ে যুক্তভাবে সঙ্গীতের সুর প্রদান করবেন ; প্রয়োজনে উভয়েই নিজস্ব মতামত প্রদান করবেন, প্রকৃত সমন্বয়ের মাধ্যমে সুষ্ঠু সুরের উপস্থাপনা করবেন। এই ক্ষেত্রে একটি উদ্দেশ্যের দিকে যুক্তিপূর্ণ মনোভাবে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াসকেই প্রকৃত সমন্বয় বলে অভিহিত করা হয়। কাজেই একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াস সুষ্ঠু সমন্বয় ব্যবস্থা পরিচালনায় সাহায্য করে।

এলর্বোন (Elbourne) ছয়টি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমন্বয় ব্যবস্থা পরিচালনার উপায় আলোচনা করেছেন—(১) কর্মীবৃন্দের মধ্যে সমন্বয়, (২) কমিটি বা অধিবেশনের মাধ্যমে সমন্বয়, (৩) নির্দেশ প্রদান করা, (৪) বিবরণ দেওয়া এবং কার্য আদায় করা, (৫) প্রকৃত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং (৬) এ বিষয়ে নীতি নির্ধারিত করা। এক কথায় সহযোগিতাই সমন্বয়ের মূল উদ্দেশ্য।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অনেক পৌর নিগমের নিজস্ব কতগুলি স্থায়ী কমিটি থাকে। এই কমিটিগুলি নির্ধারিত কার্যভার পরিচালনা করে। এই সকল কমিটির মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থ সংক্রান্ত কমিটি পৌর নিগমের দায়িত্বভার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সংবাদ সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং কার্যভার পরিচালনা করতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ, এই সকল কমিটির সম্মিলিত প্রয়াসেই পৌর নিগমের কার্যভার পরিচালিত হয়।

কর্মীবৃন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমন্বয় একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। সাধারণত এই ধরনের সমন্বয় একটি অতি সাধারণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই ধরনের কার্যভার পরিচালনার দায়িত্ব পেশাদারী অথবা কোন প্রয়োগবিদ্‌দের দ্বারা এবং সাধারণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে সমন্বয় সমান্তরালভাবে কিংবা উল্লম্বভাবে পরিচালিত হ'তে পারে। সাধারণত কোনও জন-প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সমন্বয়, আলোচনা এবং মতামত আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত প্রকৃত

সমন্বয় যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং দায়িত্বের সমবিভাজনের দ্বারা সম্ভব। তবে প্রকৃত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের প্রশাসনিক কর্মী নিম্নস্তরের কর্মীগণের উপর কোনও রকমের আধিপত্য প্রয়োগ করেন না তা বিশ্বাস করা যায় না। প্রকৃত প্রশাসনিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সমন্বয়ের মূল উদ্দেশ্য হ'ল সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে সমভাবে ক্ষমতার বিস্তার ঘটানো।

১৩.৭ সমন্বয় এবং কর্তৃত্ব

ডিমক (Dimock)-র ভাষায়, একটি প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং নীতি নির্ধারণ করা হয়। প্রয়োজনে নির্দেশ করা হয়; ক্ষমতার বণ্টন সম্ভবপর হয় আবার স্থান বিশেষে প্রকৃত তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা হয়। কাজেই, সমন্বয় হ'ল নির্ধারিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার প্রকৃত সংযোগসাধন। কিন্তু কর্তৃত্ব শব্দটি ব্যবহারের ফলে উক্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। এর ফলে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নির্ধারিত প্রণালীর মাধ্যমে উদ্দেশ্যের পথে পরিচালিত হয়।

'সমন্বয়' একটি সচল প্রক্রিয়া যার দ্বারা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য সংমিশ্রণ সম্ভব। অপরদিকে কর্তৃত্ব একটি প্রণালী যার ফলে একটি সংমিশ্রিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে প্রতিনিয়িত বিশ্লেষণ করে; সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন করার প্রয়োজনবোধ করা হয়। বিশ্লেষণ এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমন্বয় এবং কর্তৃত্বের মধ্যে একটি প্রকৃত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার আবর্তন সম্পূর্ণ হয়।

অর্থাৎ, সরকারী সচিবালয়ের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা বিভাগীয় সচিব রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক স্নাতক-স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কারিগরী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের হাতে তুলে দেন। প্রত্যেকটি বিভাগের নির্দিষ্ট কার্যাবলী নির্দেশ করেন এবং উক্ত কার্যাবলীর সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে। কিন্তু কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে, প্রকৃত প্রক্রিয়ায় তফাৎ পরিলক্ষিত হয়।

১৩.৮ সমন্বয়ের সুষ্ঠু প্রক্রিয়া

মেকফারল্যাণ্ড (McFarland) প্রকৃত সমন্বয়ের চারটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। এই সকল প্রক্রিয়াগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। ক্ষমতা এবং দায়িত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ঃ এই প্রক্রিয়ার ফলে দায়িত্বের সুষ্ঠু বিভাজন সম্ভব।

২। কার্যাবলীর উপর প্রকৃত দৃষ্টি প্রদান করা বা তত্ত্বাবধান করা ঃ একই প্রক্রিয়াকে কর্তৃত্বের প্রকৃত ভূমিকা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ একজন প্রশাসক এক্ষেত্রে প্রকৃত প্রক্রিয়ার সঙ্গে আকাঙ্খিত প্রক্রিয়ার তুলনা করতে পারেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই বিভিন্ন তথ্য এবং বিবরণের মাধ্যমে একজন প্রশাসক সমন্বয় প্রক্রিয়ার ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হন।

৩। এই ব্যবস্থায় প্রকৃত সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া নির্দেশ করা যেতে পারে ঃ প্রকৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষমতার

এবং তত্ত্বাবধানের বিভিন্ন প্রণালীসমূহের বিশ্লেষণের ফলে প্রকৃত সমন্বয় সম্ভবপর হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কমিটি অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত সমন্বয় সম্ভব।

৪। নেতৃত্বের মাধ্যমেও সমন্বয়সাধন করা যেতে পারে ঃ একজন উচ্চশ্রেণীর প্রশাসককে নেতৃত্বের ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা উচিত। আধুনিককালে প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবে সুষ্ঠু সমন্বয় ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভবপর হয় নি।

কলকতা পৌর নিগমের মেয়র-এর দায়িত্ব বিভিন্ন দপ্তরগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। যেমন, স্বাস্থ্য বিভাগের হাতে মহানগরীর স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বস্তি উন্নয়নের দায়িত্ব বস্তি উন্নয়ন বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু নেতৃত্ব এবং প্রকৃত কার্যভার পরিচালনার দায়িত্ব মেয়রের হাতেই থাকে। এই সকল দায়িত্বভার পরিচালনার প্রয়াস গ্রহণে মেয়র সকল তথ্য এবং সংবাদ সমভাবে পর্যালোচনা করেন। বিভিন্ন বিভাগীয় সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। প্রয়োজনে বিভিন্ন কমিটিগুলির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। প্রকৃত সমন্বয় ব্যবস্থা প্রণয়ন করে প্রশাসনিক দায়িত্বভার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।

১৩.৯ সমন্বয়সাধনের বিভিন্ন উপায়সমূহ

সমন্বয় প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা ও ব্যক্তির ভূমিকা জরুরী। দু'টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমন্বয়সাধন সম্ভবপর হয়, যেমন আনুষ্ঠানিক এবং ঘরোয়া সমন্বয় ব্যবস্থা।

১। পরিকল্পনা

একটি সফল সমন্বয় প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনার স্থান অবশ্যম্ভাবী। এই পরিকল্পনাজনিত সমন্বয় সর্ব নিম্নস্তর থেকেই শুরু করা উচিত। কাজেই, প্রকৃত সমন্বয়সাধন করা এই সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্যতম অংশ। একটি বৃহৎ প্রশাসনিক সংগঠনের বিশ্লেষণমূলক পরিকল্পনা প্রকৃত সমন্বয় স্থাপনের কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ উক্ত পকিল্পনার ফলে প্রশাসনিক কার্যভার পরিচালনা করার পূর্বেই প্রয়োজনীয় বাধা-বিপত্তিসমূহ সম্পর্কে সচেতন হওয়া সম্ভব। ভারতবর্ষে পরিকল্পনা কমিশন সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত।

২। সংগঠনের সুষ্ঠু নীতিসমূহ

সাধারণত একটি প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত প্রক্রিয়া কতকগুলি সুষ্ঠু নীতিসমূহের দ্বারা পরিচালিত হয়। একটি সংগঠনের প্রকৃত সমন্বয় প্রক্রিয়ার বাধাগুলি দূর করে। কাজেই এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠু ক্ষমতা বণ্টন, প্রকৃত ক্ষমতার প্রয়োগ, কর্তব্যের প্রকৃত বিভাজন, কোনও একটি প্রক্রিয়া একঘেয়েমি এবং প্রকৃত ক্ষমতার বণ্টন প্রভৃতি সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে।

৩। ক্যাবিনেট ব্যবস্থা এবং ক্যাবিনেট সচিব

একটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন করা সাধারণত বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব। আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের

ক্ষেত্রে দায়িত্বভার ক্যাবিনেটের নিকট প্রেরণ করা হয়। সাধারণত ক্যাবিনেটের সচিব প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থেকে কাজ করেন। বিভাগীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করেন। এই মন্ত্রী পরিষদের মূল দায়িত্ব হ'ল ভারত সরকারের প্রশাসনিক নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে সমন্বয়সাধন করার প্রচেষ্টা চালানো। তার কারণ কিছু কিছু প্রশাসনিক কার্যভার পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু মন্ত্রী পরিষদীয় বিভাগসমূহ কোনও কোনওভাবে যুক্ত থাকে, ফলে এই সকল বিভাগের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'তে পারে। তার মোকাবিলা ক্যাবিনেটই করে থাকে। আবার, ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় বিভাগসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'লেও তারা তার সমাধান করেন। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় আবার ভারত সরকারের অর্থনৈতিক এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রেও প্রকৃত সমন্বয়সাধন করিতে সচেষ্ট হয়।

৪। আন্তঃবিভাগীয় কমিটিসমূহ

এই কমিটিসমূহ আন্তঃবিভাগীয় দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। যে সমস্ত দ্বন্দ্ব সাধারণ প্রতিষ্ঠানের উচ্চ বিভাগীয় কর্মচারী কিংবা মধ্যবর্তী স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, এই কমিটিসমূহ তার সমাধান করে।

৫। আঞ্চলিক পরিষদ

আঞ্চলিক পরিষদসমূহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের ক্ষেত্রে সমন্বয় স্থাপনে সাহায্য করে থাকে, কারণ এই পরিষদগুলি বিভিন্ন তথ্যের বিনিয়োগের দ্বারা বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে এবং পরিকল্পনামূলক কার্যভার পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করে; বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে কার্যভার পরিচালনায় সহায়তা করে। ভারতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহকুমা পরিষদ একটি উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক সংস্থার দায়িত্ব বহন করে।

৬। কর্তৃত্বের প্রতিনিধি

সাধারণত বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দ এবং সংস্থাসমূহ বিভিন্ন বিভাগসমূহের নিকট তথ্য এবং উপদেশ প্রেরণ করেন। এর ফলে বিভিন্ন বিভাগসমূহ নিজেদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে সক্ষম হয়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে কার্যকরী যে সকল সংস্থা রয়েছে, যেমন জনহিতকারী সংস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক এবং পরিকল্পনামূলক বিভাগ কেন্দ্রীয় ক্রয় সংস্থাসমূহ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

১৩.১০ সমন্বয়ের অন্যান্য মাধ্যমসমূহ

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সংস্থাগুলির মাধ্যমে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিব, সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সংস্থা হিসেবে গণ্য। জেলা প্রশাসনের ক্ষেত্রে একজন জেলাপ্রধান সমন্বয়ের প্রধান মাধ্যম। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় আন্তঃবিভাগীয় যুগ্মকমিটি প্রয়োজনীয় উপযোগী সংগঠনর মাধ্যমে সমন্বয়সাধন করে থাকে। সাধারণত ঘরোয়া সমন্বয় ব্যবস্থা পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা, অর্থাৎ আলোচনা এবং বিভিন্ন তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে কোনও বক্তব্যকে একটি নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সাইমনের মতে, গোষ্ঠীগত আচরণ কেবলমাত্র সফলপ্রদ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় হয়। যদি কোনও সিদ্ধান্ত কর্মীবৃন্দের যুগ্ম প্রয়াসে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয় তবে গোষ্ঠী আচরণের পরিকল্পনা, গোষ্ঠী

মনোভাবকে বিশেষ কোনও ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এই ব্যবস্থায় কেবলমাত্র একটি গোষ্ঠীর আচরণের উপর সচেতন দৃষ্টি রাখা হয়। একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধারণত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় কোনও একটি কার্যকরী নীতি কর্মীবৃন্দের নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তবে সকল প্রকার সমন্বয়ে পৌঁছানোর একমাত্র কারণ হ'ল যখন কোনও কর্মীগোষ্ঠী অনেকগুলি বিকল্প সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজী হন এবং সেক্ষেত্রে যদিও কর্মীগণের মধ্যে কোনও না কোনও বিষয়ে দ্বিমত দেখা যায় তবে সমন্বয়ে বিশ্বাসী কর্মীগণ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করতে রাজী থাকেন ; ফলে সুষ্ঠু সমন্বয় সম্ভব হয় এবং একটি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সম্ভবপর হয়।

১৩.১১ সমন্বয় ব্যবস্থার অসুবিধাসমূহ

সাধারণত আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রচুর বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। লুথারগুলিকে এর মতে, এই সকল বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ উল্লেখযোগ্য--(১) সাধারণত ব্যক্তি হিসেবে অথবা গোষ্ঠী হিসেবে মনুষ্যচরিত্রে নিশ্চয়তার অভাব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করে। (২) কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার অভাব, কর্মীবৃন্দের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক ধারণার উপস্থিতি সুষ্ঠু সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার অভাব প্রকৃত সমন্বয়সাধনের অন্তরায় হ'তে পারে। (৩) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও একজন প্রশাসককে অনেকগুলি বিকল্প সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হ'তে হয়। ব্যক্তি এবং জীবন সম্পর্কে প্রকৃত ধারণার অভাব সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। (৪) শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রকৃত নীতি নির্ধারণ করার অক্ষমতা, সুষ্ঠু বিচার বিবেচনার অভাব, নূতন নূতন ধারণা এবং পরিকল্পনা গহণের ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকৃত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

সেকলার বাডসনের মতে, প্রকৃত সমন্বয়ের অসুবিধার কারণ স্বরূপ আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে। সাধারণত বিশেষ কতকগুলি গুণাগুণের অভাবে জন-প্রশাসনের সাফল্য বিঘ্নিত হয়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের উপর স্বচ্ছ ধারণার অভাবে প্রকৃত সমন্বয় সম্ভব হয় না। (১) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞান, (২) সততার অভাব, (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জন-প্রশাসনের বিস্তার এবং (৪) জন-প্রশাসনের কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিলতার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলির মধ্যে জন-প্রশাসনের জটিলতা নূতন নূতন সংস্থার উদ্ভব, নূতন নূতন দাবী দাওয়ার উদ্ভব, কর্মীবৃন্দের উপর প্রশাসকের সীমিত প্রভাব, প্রকৃত প্রশাসককে অমান্য করা, ক্ষমতার বন্টনের প্রতি অনীহা প্রভৃতি সৃষ্ট সমন্বয়ে বাধা সৃষ্টি করে। তবে যে সকল চিন্তাবিদ সমন্বয়ের বিপক্ষে তাঁরা এই ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানান। তাঁদের মতে, প্রকৃত সমন্বয় সুষ্ঠু প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত দ্বন্দ্ব একজন প্রশাসককে তার দায়িত্বভার সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা প্রদান করে এবং প্রকৃত পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া পরিচালনায় সাহায্য করে।

১৩.১২ সারাংশ

আধুনিক সংগঠনগুলিতে উৎপাদনের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাজন, বিশেষীকরণ ইত্যাদিরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যাচ্ছে। জন-প্রশাসনে শ্রমবিভাজন ও বিশেষীকরণের ঠিক যতটা প্রয়োজন আছে ঠিক ততটা গুরুত্ব আছে শ্রমবিভাজনের পরে বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত কর্মীদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। সমন্বয়সাধন করা সহজ কাজ নয়। সমন্বয়ের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির যদি সমকালীনতা থাকে তবে সমন্বয়সাধনের অসুবিধাগুলি উপেক্ষা করা যায়।

১৩.১৩ অনুশীলনী

১। সমন্বয় কাকে বলে? জন-প্রশাসনে এর প্রয়োজনীয়তা কি?

২। সমন্বয়ের মাধ্যমগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৩। সমন্বয়ের বিভিন্ন অসুবিধাগুলি কি কি?

১৩.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। Ordway Tead : *The Art of Administration,* 1951.

২। Gulick Luther and Urwick L : Papers on the science of Administration (eds.) ; Public Administration Service : New York, 1937.

৩। Seckla and Hudson : *Organisation and Management Theory and Practice,* 1957.

৪। Simon, Herbert : *Administrative Behaviour : A study of Decision Making Process in Administrative Organisation.* The Free Press, New York, 1957.

একক ১৪ ❑ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য
১৪.১ প্রস্তাবনা
১৪.২ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণার অর্থ ও সংজ্ঞা
১৪.৩ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণার নানা উপাদান
১৪.৪ সামাজিক কাঠামো ও কর্মস্পৃহা
১৪.৫ কর্মপ্রেরণার অর্থ
১৪.৬ কাজের প্রকৃতি ও কর্মস্পৃহা
১৪.৭ সারাংশ
১৪.৮ অনুশীলনী
১৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১৪.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- জন-প্রশাসনে কর্মস্পৃহা বা প্রেষণার মূল্য কী ?
- কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সংক্রান্ত তত্ত্বাবলী
- সংগঠনের অগ্রগতিতে প্রেষণার ভূমিকা কী ধরনের হয়ে থাকে
- সামাজিক কাঠামো কি ভাবে কর্মীর প্রেষণা বা স্পৃহাকে তৈরী করে

১৪.১ প্রস্তাবনা

যে কোনও সংস্থার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দরকার কর্মীবাহিনী। এই কর্মীবৃন্দকে কাজকর্মে যুক্ত করে সঠিকভাবে পরিচালিত করলে সংগঠনের লক্ষ্যে পৌঁছনো অতি সহজ হবে। প্রেষণা মানুষের কমকর্মের অন্যতম শক্তি। সামাজিক কাঠামোর মধ্যে কর্মীর প্রেষণা বা স্পৃহা তৈরী হয়ে থাকে। সামাজিক প্রেষণা চক্রাকারে আবর্তিত হয়। মানুষ শুধু তার বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার বলে তা গ্রহণ করে। তাই যে কোন সংগঠনে প্রেষণা হচ্ছে চলমান বিষয়। কোন কাজের উপযোগিতা, কাজের পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধি এইগুলি সংগঠনের কর্মীদের প্রেষণা বা স্পৃহা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

১৪.২ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণার অর্থ ও সংজ্ঞা

জন-প্রশাসন একটি প্রক্রিয়া। সাংগঠনিক কাজকর্মের মধ্যে যার প্রবহমানতা। এই সাংগঠনিক কাজকর্মে যুক্ত থাকে এক কর্মীবাহিনী। এই কর্মীবাহিনীকে কাজকর্মে যুক্ত করে সঠিকভাবে পরিচালিত করা সংগঠনের লক্ষ্য। এই কাজকর্মে সাফল্য অর্জন করা হচ্ছে প্রশাসকের লক্ষ্য। সংগঠনের কাজকর্মে কর্মীবাহিনীকে যুক্ত করা একটি পরিচালন সমস্যা। কারণ সাধারণত দেখা যায় যে, কর্মীরা সংগঠনে চাকুরী করে বা কাজ করে। কর্মীগণ বেতন বা মজুরী অর্জনে যতটা আগ্রহ ও ব্যস্ত থাকে, সংগঠনের কাজকর্মে বা উৎপাদনে তেমন আগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখায় না। কর্মীরা উচিত মত কাজে তেমন উৎসাহ দেখায় না। কোথাও বা শুধুমাত্র নিয়মানুযায়ী কাজ করে। কোথাও সেটাও করে না। কর্মীদের এই মনোভাব থাকলে প্রশাসন কোনও সংগঠনেই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। তাই কর্মীদের যাতে কাজে অনীহা না থাকে তার চেষ্টা চালানো প্রত্যেক প্রশাসকের কর্তব্য।

কাজে কর্মীদের অনীহা যাতে না আসে এবং কাজে কর্মীরা যাতে বেশী উৎসাহ পায় ও আত্মনিয়োগ করে তার জন্য কর্মীদের মধ্যে একধরনের ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা সংগঠন পরিচালকদের কর্তব্য। এই মনোভাব সৃষ্টি নানা ভাবেই করা সম্ভব। সংগঠনের কাজের প্রতি কর্মীদের ইতিবাচক এই মনোভাবেই মনস্তত্ত্বের ভাষায় জন-প্রশাসন তত্ত্বে Motivation বা প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা বলা হয়ে থাকে। প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে কর্মীর একটি মানসিক অবস্থা। কর্মীদের এই ধরনের মানসিক অবস্থা যে কোনও সংগঠনের প্রশাসনিক কাজকর্মে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রবার্ট ডাবিন (Robert Dubin) প্রেষণা বা কর্মস্পৃহার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন যে, "Motivation may be defined as the complex of forces starting and keeping a person at work in an organisation." অর্থাৎ, প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা হ'ল মানুষের মনের কতকগুলি দ্বিধাদ্বন্দ্বের টানাপোড়েনের জটিল মিশ্রণ অথবা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যা মানুষকে সংগঠনের কাজে যুক্ত করে, সম্পৃক্ত করে।

প্রেষণা হচ্ছে মানুষের কাজকর্মের এক অন্যতম শক্তি। নৈতিকতা (Morality) মানুষকে কাজকর্মের জগতে উৎসাহিত করে। উৎসাহ-ভাতা (Incentive) কর্মীকে একটি বিশেষ লক্ষ্যের অভিমুখে উৎপাদনের কাজে পরিচালিত করে। যে কোনও সংগঠনের কাজকর্মে রত কর্মীর মানসিকতার সুস্পষ্ট তিনটি দিক হচ্ছে—প্রেষণা বা স্পৃহা, নৈতিকতা এবং উৎসাহ-ভাতা।

সাধারণভাবে, প্রেষণা বা স্পৃহা কর্মীকে কাজের ব্যাপারে একটি বিশেষ দিক থেকে উৎসাহিত করে বা পরিচালিত করে। স্পৃহা বা প্রেষণা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা কর্মীকে একটি কাজে লিপ্ত করে। শুরু হওয়া কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্মী ঐ কাজে নিজেকে অবিশ্রান্তভাবে যুক্ত রাখে। সুতরাং, প্রেষণা বা স্পৃহা হচ্ছে কর্মীর কাজের একটি দিক বা উপাদান। কর্মীকে কর্মস্পৃহাই কাজে সচল রাখে।

কর্মী কিভাবে কোন্ কাজ কতটা করবে তা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন, চেষ্টা (drive), প্রবৃত্তি

(instinct), ইচ্ছা (wishes) এবং উত্তেজনা (tension) প্রভৃতি। এই সব উপাদানগুলি এককভাবে সামগ্রিকভাবে একজন কর্মীর কাজের মানসিকতা তৈরি করে দেয়।

একথা বলা বাহুল্য যে, কোনও কাজ করার ক্ষেত্রে কর্মীর আচরণ (behaviour) থাকে সুসংগঠিত (highly organised)। যে সব প্রবৃত্তি (impulses) দ্বারা কর্মীর আচরণ তৈরী হয় সেই সব প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে আচরণের মাধ্যমে। যে সামাজিক পরিবেশে কর্মী কাজ করে সেই সামাজিক পরিবেশ দ্বারা কর্মীর আচরণ প্রভাবিত হয়। এই সামাজিক পরিবেশ একজন কর্মীর কাজের প্রতি স্পৃহা বা প্রেষণা তৈরী করতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে।

১৪.৩ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণার নানা উপাদান

বিভিন্ন আচরণবাদী বিজ্ঞানী বিভিন্ন কারণ দ্বারা কাজের প্রতি স্পৃহা বা প্রেষণা বিশ্লেষণ করেছেন। ডব্লু. আই. টমাস (W. I. Thomas) বলেছেন যে, নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন স্বীকৃতি, নূতন ধরনের নিরাপত্তা এবং নূতন ধরনের সংবেদনশীলতা কর্মীর স্পৃহা বা প্রেষণা তৈরী করে।

সাম্প্রতিককালের আচরণবাদীরা মনে করেন যে, কাজের প্রতি স্পৃহার বিশ্লেষণে কোন ধরাবাঁধা সাধারণ নিয়ম চলে না। কারণ, একই ধরনের স্পৃহা বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে বিভিন্ন কারণে ঘটতে দেখা গেছে। আবার, একই ধরনের প্রেষণা বা স্পৃহা বিভিন্ন কর্মীকে কাজের বিভিন্ন দিকে বা বিভিন্ন স্তরে পরিচালিত করে। সুতরাং, প্রেষণা বা স্পৃহার সঙ্গে কাজের মধ্যে সম্পর্ক একেবারে দুই-দুইয়ে চার—এইভাবে ব্যাখ্যা হয় না।

সুতরাং, কর্মার প্রেষণার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কর্মীর নিজের ভেতরের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এবং কর্মীর অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াশীলতা। এই ব্যাপারে কর্মীর সামাজিক পরিবেশ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কর্মীর মনে সমাজ বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ তৈরী করে দেয়। ফলে, প্রত্যেক ধরনের কাজ সম্পর্কে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা একজন কর্মীর সামনে থাকে। একটি কাজের উৎস, প্রকৃতি, কাজের পদ্ধতি—সমস্ত কিছুই সমাজ সংগঠিত করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, পিতা বলতে কি বোঝায় তা সমাজ সংজ্ঞা দান করে ঠিক করে দেয়। জীবিকা বলতে কি বোঝায়—তাও সামাজিক সংজ্ঞাই ঠিক করে দেয়। কিন্তু, একজন ব্যক্তি নিজেকে পিতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য কিভাবে পরিচালিত হবে অর্থাৎ পিতা হওয়ার প্রেষণা বা স্পৃহা কি হবে তা ব্যক্তির একেবারে নিজস্ব আভ্যন্তরীণ বিষয়। কেউ মনে করতে পারেন যে, পিতা হওয়াটা হচ্ছে যৌন মিলনের ফল। অনেকে শিশু ভালোবাসেন বলে পিতা হ'তে চান। অনেকে পিতার কর্তৃত্ব ভোগ করে সন্তান-সন্ততিদের লালন-পালন করতে চান বলে পিতা হ'তে চান। সুতরাং, একই সমাজব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ প্রেষণা-শক্তি বিভিন্ন রকম হ'তে পারে। এই আভ্যন্তরীণ শক্তির পার্থক্যের জন্য পিতা হওয়ার প্রেষণা বিভিন্ন রকম হয়ে যায়। পিতার ভূমিকার অর্থও বিভিন্ন হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে অধস্তন কর্মীরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাজে নিজেদের আভ্যন্তরীণ প্রেষণা শক্তি দ্বারা যুক্ত করে রাখে। একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অধস্তন কর্মীদের মধ্যে কারও প্রেষণা শক্তি হচ্ছে অহংবোধ ; অনেকের প্রেষণা শক্তি হচ্ছে সংগঠনের মধ্যে ক্ষমতা লাভ ; অনেকের প্রেষণা শক্তি হচ্ছে সম্পদ অর্জন

করা। আবার, অনেকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠা ও সেবাকে প্রেষণ শক্তি হিসেবে গণ্য করেন। এই সকল বিষয়ের কোনও একটিকে বা কয়েকটিকে মিলিত আকারে আমরা কোনও একজন কর্মীর কাজের প্রেরণায় প্রেষণা বা স্পৃহা রূপে দেখতে পাই। ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানটির তরফ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রেষণা দ্বারা পরিচালিত সকল কর্মীর কাজের স্পৃহা এমনভাবে তৈরী করা দরকার যাতে করে প্রত্যেকটি কর্মীই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার শীর্ষপদটি দখল করার জন্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাজে নিজেকে আন্তরিকভাবে ও সর্বতোভাবে যুক্ত করতে পারে। এর জন্য পদোন্নতির এবং সাফল্যের সোপানগুলি প্রত্যেক কর্মীর সামনে উন্মুক্ত রাখা উচিত। বিভিন্ন ধরনের উৎসাহ-ভাতা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের তরফে কর্মীকে দেওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক কর্মীই ব্যবসায়ী সংগঠনের সাফল্যের জন্য কাজ করতে পারে।

যদি প্রেষণাকে কর্মীর আভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখা হয় তাহ'লে প্রেষণা বা কর্মস্পৃহাকে ব্যক্তি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন উপাদান বা বিষয় সম্মিলিতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে কাজ করে 'প্রেষণা' তৈরি করে। এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে কোনও একটিকে পৃথকভাবে বাছাই করা খুব কঠিন। কারণ, একটি কাজের মধ্যে কোনও একজন কর্মী যখন যুক্ত হয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন সেই কর্মস্পৃহার পিছনে কোন্ বিশেষ কারণটি সক্রিয় তা খুঁজে বার করা কঠিন।

সমাজ বা কোনও ব্যবসায়ী সংগঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, একজন কর্মীর মধ্যে কোন্ ধরনের স্পৃহা কাজ করে তা নির্ভর করে কর্মীটির কাজ করার সামর্থ্যের উপর। যে কর্মীদের কাজ করার সামর্থ্য খুব কম তাদের প্রশাসনের কাজকর্ম থেকে প্রথমে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। কাজের পরিবেশের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই এমন সব কর্মী যাঁরা কাজের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে নিজেদের অসামর্থ্য বা অযোগ্যতার কারণে নিজেদের দূরে রাখেন, সমাজ বা যে কোনও সংগঠন প্রথমে সেই ধরনের কর্মীদের বাতিল করতে পারে। তাছাড়া, যে সকল কর্মী তাঁদের নিজেদের পরিবেশগত কারণে নানা অতিরিক্ত বোঝা বহন করেন তাঁদেরও প্রশাসন বা সংগঠন থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। নতুবা তাঁরা নিজেদের পরিবেশগত অতিরিক্ত বোঝার চাপে সংগঠনের কাজে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবেন বা কাজে উদাসীন থাকবেন বা সেই কাজে যুক্ত হয়ে তাঁরা সে কাজের প্রতি তাঁদের অনীহার ফলে প্রশাসনকে বা সংগঠনকে কার্যত অচল বা বিকল করে দিতে পারেন।

কর্মীর কাজের সামর্থ্য বিচার করে কর্মীকে তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ দিলে কর্মী তাঁর কাজে প্রেষণা বা স্পৃহা খুঁজে পাবে। ফলে কর্মীর প্রত্যেকটি কাজ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। কর্মীর প্রত্যেকটি কাজকর্মকে সঠিকভাবে ও নির্দিষ্টভাবে পরিচালিত করতে হ'লে কর্মীর প্রেষণা বা স্পৃহার ব্যবস্থা (system of motivation) প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১৪.৪ সামাজিক কাঠামো ও কর্মস্পৃহা

সামাজিক কাঠামো কর্মীর প্রেষণা বা স্পৃহাকে তৈরী করে ও পরিচালিত করে। সামাজিক কাঠামোর দ্বারা প্রেষণা বা স্পৃহার তৈরী হওয়া ও পরিচালিত হওয়া ব্যাপারটা প্রধানত দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—(ক) একজন ব্যক্তির পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জনের প্রক্রিয়ায় সামাজিকীকরণের ভূমিকা, (খ) ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম যে নির্দিষ্ট সংগঠনে যুক্ত তার শিক্ষণ প্রক্রিয়া।

সামাজিক কাঠামোর প্রভাবে প্রেষণা বা স্পৃহা একটি নির্দিষ্ট উপায়ে তৈরী হয়। যখন কোনও ব্যক্তি কোনও মূল্যবোধ, লক্ষ্য বা আচরণের রীতিনীতি আত্মস্থ করে তখনই কাজকর্মের প্রতি তাঁর স্পৃহা বা প্রেষণা ভবিষ্যতে কেমন হবে তা স্থির হয়ে যায়। এই আত্মস্থকরণের অর্থ হ'ল—চিন্তার ধারা ও ব্যক্তিগত আচরণের ধারা অনুসরণ করা। আক্ষরিক অর্থে এটা হচ্ছে কাজকর্মের পদ্ধতি এবং চিন্তার পদ্ধতি দ্বারা ব্যক্তির এক সামাজিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভবিষ্যৎ আচরণ ও কর্মকে স্থিরীকৃত করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, এই কাজকর্ম ও চিন্তাধারা ব্যক্তির সামাজিক অভিজ্ঞতারই ফল।

সামাজিক প্রেষণা বা স্পৃহা আবর্তিত হয় চক্রাকারে। সামাজিক অভিজ্ঞতা দ্বারা ব্যক্তি যা গ্রহণ করে সেটাকেই ব্যক্তি আত্মস্থ করে। একবার যা আত্মস্থ হয়ে যায় তা ভবিষ্যতের আচরণের প্রেষণার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, আচরণ-ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই আচরণ-ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেটাই ব্যক্তির কাজকর্মের পছন্দ-অপছন্দ, উদ্যোগ, স্পৃহা, গতি ও বৃদ্ধি ঠিক করে; কাজকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত টেনে নিয়ে চলে।

প্রেষণা বা স্পৃহার ফল হচ্ছে কর্মী তাঁর দ্বারা সম্পাদিত কাজ থেকে যা পায়, সেই পাওয়া কোন্ কাজ থেকে কিভাবে পাওয়া যায় তা ঠিক করে দেয় সমাজ। অর্থাৎ, কাজের পুরস্কার কি হবে তা ঠিক করে দেয় সমাজ। প্রত্যেক কাজের জন্য সমাজ যে পুরস্কার নির্দ্ধারণ করে দেয় তা হচ্ছে সাধারণ প্রকৃতির, ব্যক্তি-বিশেষের নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, শিশুকে বরাবর এবং বারংবার বলা হয় "ভালো" হ'তে হবে। শিশু যদি ভালো হয় তাহ'লে বড়দের কাছ থেকে সে পায় স্নেহ, স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা। এই ধরনের পুরস্কারকে এক কথায় বলা যায় "Status Coin". অর্থাৎ মুদ্রার মর্যাদা। সমাজে বড়রা খারাপ শিশুর তুলনায় ভালো শিশুকে উচ্চতর মর্যাদা দান করে থাকেন। মূল্যবান মুদ্রার যে কদর থাকে প্রতিশ্রুতিবান শিশুকে সেই চোখেই দেখা আর কী।

একই উদাহরণ থেকে প্রেষণা ও উৎসাহর (motivation and incentive) মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। একটি শিশুকে যদি বলা হয় যে, তুমি যদি তোমার ওষুধটা খেয়ে নাও তাহ'লে তোমাকে একটি চলোকেট দেওয়া হবে তাহ'লে সেটা হয় উৎসাহ-ভাতা (incentive)। প্রাপ্তির আশায় শিশুটি এগিয়ে আসে ও কাজটি সম্পন্ন করে। একইভাবে, যদি ঐ শিশুকে বলা হয় যে, তুমি যদি ভালো শিশু হও তাহ'লে তুমি সমাজে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে তাহ'লে তখন শিশু যে কাজকর্ম করবে সেই কাজকর্মের পিছনে সমাজে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার লক্ষ্য বা আকাঙ্খা কাজকর্মের স্পৃহা বা প্রেষণা (motivation) হিসেবে কাজ করে। যখন "ভালো" সম্পর্কে ভাবনাটি শিশু আত্মস্থ করে ফেলে তখন সমাজজীবনের বিভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার আচরণের একটি মান (standard) সে নিজেই তৈরী করে নিতে সক্ষম হয়।

মৌলিক মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই সমাজ-স্বীকৃত ব্যক্তিগত আচরণের বা কাজকর্মের পুরস্কার কি হবে তা ঠিক করে দেয় সমাজের প্রেষণা ব্যবস্থা (Social motivational system)। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্তি ("pay-off") কে ক্ষমতাপ্রাপ্তি বা "power off' এবং কর্তৃত্বপ্রাপ্তি বা authority-pay, মর্যাদাপ্রাপ্তি বা 'Status-pay' বলা হয়। সঠিক আচরণ বা কাজকর্মকে পুরস্কৃত করা হয় আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করে; অন্যভাবে বলা যায়, কোনও কাজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রদান করে। এখানে পুরস্কার প্রাপ্তি যা হচ্ছে তাহ'ল ক্ষমতা (power)। যখন আচরণ বা কাজকর্মের পুরস্কার হিসেবে কর্মীকে প্রদান করা হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তখন কর্মীর প্রাপ্তি হয় কর্তৃত্ব (Authority)। সবশেষে, সমাজ অনুমোদিত সঠিক আচরণ-এর পুরস্কার

হিসেবে প্রদান করা হয় উচ্চতর পদ বা rank। এই প্রাপ্তিকে বলা হয় Status-pay। এই সকল পুরস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা হয় যে, ব্যাপক অর্থে, প্রেষণা বা স্পৃহা-ব্যবহার প্রাপ্তি বা pay-off হচ্ছে সাধারণ প্রকৃতির, ব্যক্তি-বিশেষ প্রকৃতির নয়। যে আচরণগুলিকে সমাজ গুরুত্ব দেয় সেই সমস্ত আচরণকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং প্রদর্শন করা হয়। শৈশব অবস্থায় যথাযথ ও সঠিক আচরণ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা হয় এবং সেই সমস্ত আচরণের পুরস্কার সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করা হয়। সেই সঙ্গে অবশ্যই ভাবতে শেখানো হয় বেঠিক আচরণ কাকে বলে এবং বেঠিক আচরণ সম্পর্কে শাস্তি কি ধরনের হতে পারে। শিশু শৈশবাবস্থা কাটিয়ে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন সমাজ-স্বীকৃত বা অনুমোদিত আচরণ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করে ও সে-ই শিক্ষিত হয়ে ওঠে। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো কাজের বা আচরণের পুরস্কার ততটা স্পষ্টভাবে থাকে না কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরস্কারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ থাকে। একজনের মর্যাদা বা উপাধি, পিতামাতার কাছ থেকে বা অগ্রজদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অথবা শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছ থেকে হর্ষধ্বনি বা করতালি হচ্ছে এমন পুরস্কার যা সর্বতোভাবে প্রেষণা সৃষ্টি করে; কাজে লিপ্ত হওয়া বা যুক্ত হওয়ার প্রেরণা দেয়। পরিবার, বিদ্যায়তন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া গোষ্ঠীর এবং খেলার দল প্রভৃতি হচ্ছে সেই সকল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন ধরনের কাজের প্রকৃতি ও ধারা সম্পর্কে এবং পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে শিশু শিক্ষা লাভ করে। উপরিউক্ত অর্থে বিচার করে বলা যায় যে, কোনও ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই, অর্থাৎ সমাজ পরিমণ্ডলে কাজের পরিবেশে বা কাজের সংগঠনে নিজেকে যুক্ত করার পূর্বেই তার নিজের সমাজের প্রেষণার বা কর্মস্পৃহার মূল কাঠামো সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে যায়।

কাজের সংগঠনে ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করে তার কাজের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় প্রেষণা বা স্পৃহা সম্পর্কে। তখনই দেখা যায় ব্যক্তির শৈশবে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাথে তাঁর প্রাপ্ত বয়সে যুক্ত হওয়া কাজের সংগঠনটির অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি সাযুজ্যের ধারাবাহিকতা। কাজের সংগঠনটি সামাজিক ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়েই প্রেষণা-ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তির সামাজিক প্রেষণাবোধের নির্দিষ্ট রূপ কাজের সাথে যথার্থরূপে সঙ্গতিপূর্ণ।

"Power-pay" বা "ক্ষমতাপ্রাপ্তি" রূপে কাজের প্রেষণা বস্তুত কাজের দায়িত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কোনও কাজের খুব জটিল ক্ষেত্রটিতে কোনও কর্মীকে যদি সিদ্ধান্তগ্রহণ ও রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে তা হবে "Power-pay" বা "ক্ষমতাপ্রাপ্তি" সংক্রান্ত প্রেষণা। অন্যদিকে, "Authority-pay" বা "কর্তৃত্বপ্রাপ্তি" হবে যদি পদোন্নতির দ্বারা পরিচালনা-ব্যবস্থার শীর্ষে কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করে সেই ব্যক্তির প্রেষণাকে পরিচালিত করা হয়। উচ্চতর মর্যাদা দান করে কর্মীর যে Status-pay ঘটে তা হয় ব্যতিক্রমী দক্ষতাকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে।

সকল সংগঠনে প্রেষণা-ব্যবস্থা একই ধরনের নয়। কোনও ধর্মীয় সংস্থায় পুরোহিতের কর্মস্পৃহার পিছনে শক্তি বা প্রেষণা যা হবে, তা নিশ্চয়ই কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে হিসাব-রক্ষক বা এ্যাকাউন্টট্যান্টের প্রেষণা হ'তে পারে না। তারপরে আরও দেখা যাবে যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দের প্রেষণা-কাঠামো যা হবে তা কখনই কোন সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত জাতীয় ব্যাঙ্ক বা বীমা কর্মীগোষ্ঠীর প্রেষণা কাঠামো হিসেবে কাজ করবে না। প্রত্যেক সংগঠনের নিজস্ব এবং অনন্য প্রেষণা-ব্যবস্থা থাকে যা সেই সংগঠনের বিশিষ্ট প্রেষণা হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকে।

প্রত্যেক সংগঠনের মধ্যেকার একজন হ'তে গেলে, অর্থাৎ সংগঠনের ভেতরের লোক হ'তে গেলে। একজন ব্যক্তিকে বা কর্মীকে একটি শিক্ষণ-প্রক্রিয়া বা সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই প্রক্রিয়া যে বিষয়টি শিক্ষণীয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেটি হচ্ছে সংগঠনটির প্রেষণা-ব্যবস্থার নির্দিষ্ট প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা ও আত্মস্থ করা।

যে মুহূর্তে একজন কর্মী বা ব্যক্তি সংগঠনের কাজকর্মের প্রেষণাকে নিজের প্রেষণা-শক্তি বা কর্মস্পৃহার পরিচালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে ফেলে সেই মুহূর্ত থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা ব্যক্তির প্রেষণা হয়ে ওঠে একেবারে স্বয়ংক্রিয় বা স্বাভাবিক। তা কোনও ধর্মীয় সংস্থাতেই হোক বা কোনও ক্লাবেই হোক। অন্য যে কোনও বিনোদন-সংস্থাতে হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, একবার প্রেষণা গৃহীত হয়ে গেলে ব্যক্তি সংগঠনের আভ্যন্তরীকরণ প্রক্রিয়ায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। এই অর্থে বিচার করলে বলা যায় যে, সামাজিক কাঠামো বা সংগঠন দ্বারাই প্রেষণা-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

যে কোনও সংগঠনে প্রেষণা হচ্ছে চলমান বিষয়। যে সকল ব্যক্তিদের নিয়ে সংগঠন পরিচালিত হয় সেই সকল ব্যক্তিরা একবার যখন নিজেদেরকে সংগঠনের অংশরূপে গণ্য করে নেন তখন থেকে তাঁরা সংগঠনের কাজকর্মে প্রেষণা সৃষ্টি করতে থাকেন ও প্রেষণাকে বজায় রেখে চলতে যান।

প্রেষণার প্রেক্ষাপটে বলা যয় যে, প্রত্যেক কাজের বেলায় কর্মী বা ব্যক্তির আচরণ কি হবে তা তিনটি পরিবেশ-নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—কাজ (task), কর্তব্য (duties) এবং অধিকার (rights) । এই তিনটি বিষয় সংগঠনের কাজকর্মে কারিগরী বিষয়গুলিকে ও কারিগরী বিষয়ের সাথে সাধারণ বিষয় সমূহকে ঠিক করে পরিচালিত করে। কাজের সাথে যুক্ত অধিকারসমূহ ভালোভাবে কাজকে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ পুরস্কার হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রত্যেক কর্মীর পদমর্যাদার (position) সাথে দায়িত্ব (responsibility), আনুগত্য (obedience) এবং সুবিধা (privilege) গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। এই তিনটি বিষয় যে বিষয়গুলিকে প্রতিফলিত করে সেইগুলি হচ্ছে—কাজের মূল্যবোধের ব্যক্তিগত আত্মীকরণ, কাজের এক আনুগত্য বা বাধ্যবাধকতার বোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজের মূল্যবোধের প্রতি আবেগগত দায়বদ্ধতা। পুরস্কারের প্রতিদানেই পাওয়া যায় অন্তত ন্যূনতম দায়িত্ব ও আনুগত্যসহ কাজ সম্পাদন বা কর্তব্য পালন।

কাজ-এর দায়িত্ব অর্পণ করার সাথে সাথে কিভাবে কাজ সম্পাদন করতে হবে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা এবং কিভাবে কোন্ কাজ সম্পাদন করলে কি ধরনের পুরস্কার পাওয়া যাবে তা নির্দিষ্ট করে রাখা জরুরী কেন না কাজের পরিবেশের চরিত্র প্রেষণার আভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবে চলমানভাবে কাজ করে।

প্রত্যেক সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে এমন নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা কর্মী বা অন্য বিষয়ের উপর ততটা নির্ভর করে না। প্রেষণার এই স্থায়ীরূপের কারণ হিসেবে অনেক কিছু কাজ করে। প্রথমত, সংগঠনের সাধারণ উদ্দেশ্য বা দর্শন প্রেষণার স্থায়ী রূপ প্রদানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে যেখানে মুনাফার হিসাব নিকাশটা হচ্ছে আসল কাজ যেখানে আর্থিক বিষয় যে প্রেষণা হবে সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলীর প্রেষণা কখনও শুধুমাত্র আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভ হ'তে পারে না। অনেক শিক্ষকের মেধা ও কর্মপ্রচেষ্টা এমন থাকে যে তাঁরা অন্য কোনও ধরনের প্রতিষ্ঠানে গেলে আরও অর্থলাভ করতে পারতেন। কিন্তু শিক্ষকতা গ্রহণ করে তাঁরা যখন থাকেন তখন তাঁদের প্রেষণা থাকে অর্থ ছাড়া আরও অন্য কিছু বিষয়। সে ক্ষেত্রে

বিষয়টিকে এইভাবে দেখা যায় যে, যেহেতু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য অর্থোপার্জনই নয়, মানুষকে শিক্ষাদান করা, তাই শিক্ষকদের প্রেষণা এক্ষেত্রে হয়, অ-আর্থিক বিষয়। ধর্মীয় সংস্থার ক্ষেত্রে সংগঠনের লক্ষ্য কিভাবে প্রেষণাকে স্থিরীকৃত করে স্থায়ী করে রাখে তা বিশেষভাবে দেখা যায়। ধর্মীয় সংস্থার প্রেষণার কেন্দ্রস্থল আছে আত্মত্যাগ ও ভাববাদী লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা। বেশভূষায় সজ্জিত ধর্মপ্রচারককে লোকে সন্দেহের চোখে দেখতে পারে কিন্তু সাদা কাপড় পরা সাধু-সন্ন্যাসীর মতো দেখতে ধর্ম-প্রচারককে লোকে আধ্যাত্মিক জগতের লোক ভেবে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। প্রেষণার ভূমিকা এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রেষণা-ব্যবস্থার স্থায়ীরূপের দ্বিতীয় উৎস হ'তে পারে না প্রেষণা সংগঠনের প্রাথমিক আনুগত্যের বন্ধন তৈরী করে। ফলে, সংগঠনটিতে প্রেষণা-ব্যবস্থা স্থায়ী রূপ লাভ করে। প্রেষণা-ব্যবস্থা সংগঠনের এক ব্যক্তির আসক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করে। প্রেষণা-ব্যবস্থার যে কোনও পরিবর্তন সংগঠনের সাথে সংগঠনের সদস্য বা কর্মীদের সম্পর্কের গ্রন্থিকে ব্যাপক ও গুরুতর আকারে পরিবর্তিত করে দিতে পারে। এমনকি ধ্বংসের মুখেও সংগঠনকে ঠেলে দিতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনও সংগঠনে আর্থিক উৎসাহ ভাতা দানের যে ব্যবস্থা চালু আছে তা পরিবর্তন করলে শ্রমিক কর্মচারীরা কিভাবে সেটাকে প্রতিরোধ করে তার মূল নিহিত থাকে প্রেষণা-ব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টার মধ্যে। টাকা পাওয়ার ব্যবস্থার যদি কোনও পরিবর্তন ঘটে তাহ'লে সেই পরিবর্তনকে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন বলে ধরে নেওয়া হয়। সেই পরিবর্তনকে সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেওয়া হয়।

তাই বলা যায় যে, যে কোনও সংগঠনের মৌলিক উপাদান হচ্ছে প্রেষণা। শুধু তাই নয় প্রেষণা হচ্ছে সংগঠনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য এবং প্রেষণায় প্রতিফলিত হয় সংগঠনের লক্ষ্য, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং সংগঠনের দর্শন। সাধারণত সংগঠনে যুক্ত প্রত্যেকেই হৃদয়ঙ্গম করে থাকে সংগঠনের প্রেষণার বিষয়টিকে। সংগঠনের পরিচালক এবং সদস্যদের কাছেও সংগঠনের প্রেষণার বিষয়টি স্থায়ীভাবে ধরা থাকে। বস্তুত একটি প্রেষণা-ব্যবস্থা কখনই সফল হ'তে পারে না, যদি না সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দ্বারা প্রেষণার বিষয়টির উপলব্ধি ঘটে ও কার্যকর হয়।

Whiting Williams প্রায় একশত বৎসর পূর্বে প্রেষণা বা কর্মস্পৃহার ক্ষেত্রে "Social handles of pay-up" শব্দগুচ্ছকে চয়ন করেছিলেন। তাঁর মতে, একজন কর্মী তাঁর কাজের গুরুত্ব তখনই বুঝতে পারেন যখন তিনি দেখেন তাঁর কাজের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য সমাজে অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য হয় এমনকি সমাজের চোখে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কিংবা সামাজিক গুরুত্ব কতখানি কিভাবে কর্মীর উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি থাকবে সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থাকলেও সমাজ যদি কোনও কাজের এক মূল্য বা গুরুত্ব দেয় তাহ'লে ঐ কাজ সম্পাদন করার জন্য কর্মী প্রেষণা লাভ করে। অর্থাৎ, যে কোনও কাজের সামাজিক স্বীকৃতিই প্রেষণার উৎস হয়ে ওঠে। একজন কর্মীর কাজের মূল্য বা গুরুত্ব যখন কর্মী আত্মস্থ করে ফেলে তখন ব্যক্তি কর্মীটি তাঁর মালিক-প্রতিষ্ঠানটিতে কোনও কিছু সুনাম এমনকি ধন্যবাদের প্রত্যাশা না করেই উৎপাদন বৃদ্ধি করে যেতে থাকে।

কোনও কাজের উপযোগিতা সেই কাজে নিযুক্ত কর্মীর প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা হিসেবে কাজ করতে পারে। কর্মীর কাজের মর্যাদার সাথে কর্মীর নিজস্ব সমাজের সংযোগ সাধারণভাবে কর্মীর প্রেষণা হয়ে ওঠে। কোনও পেতলের কারখানার কর্মী যখন জানতে পারে যে, তার দ্বারা তৈরী পেতলের যন্ত্রাংশ দ্বারা দেশরক্ষার জন্য বন্দুকের কার্তুজ তৈরীতে প্রয়োজন হয় তখন সেই কর্মীর মনে একটি প্রেষণা সৃষ্টি হয় যার দ্বারা সে খুব গৌরবের সাথে তাঁর কাজে স্পৃহা লাভ করতে পারে। যদিও লিপস্টিক তৈরীর কারখানায় কিংবা ভ্যানিটি ব্যাগ তৈরীর কারখানায় কর্মী যেমন

তার কাজে রং বা নক্সার বৈচিত্র্যের আস্বাদ লাভ করে। কার্তুজ তৈরীর কারখানায় বা পেতলের যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানায় কর্মী সেই ধরনের বৈচিত্র্য লাভ করে না ; বরং একধরনের একঘেঁয়েমি ও ক্লান্তির মধ্যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শ্রমিক বা কর্মীকে কাজ করতে হয়।

সর্বোপরি, কাজের পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হ'লে প্রয়োজন কাজের পরিবেশকে উন্নত করা, যন্ত্রপাতিকে উন্নত করা। এই উন্নতির কাজটি করা অসম্ভব কিছু নয়। যদি কাজের পরিবেশের বৈষয়িক উন্নতি করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে তখন কর্মীর আত্মিক দিকটিকে উন্নত করার চেষ্টা হয়। অর্থাৎ, কাজ সম্পর্কে কর্মীর নিজস্ব ভাবনা, বাইরের লোকদের ভাবনা এবং সমাজের সকলের ভাবনার দিকটিতে উন্নত করা প্রয়োজন। Whiting Williams-এ ভাষায় বলা যায় যে, "The best way to improve the job may often be, in fact, to change what the outside public thinks about it and its doers." অর্থাৎ, Whiting-এর কথায়—কোন কাজকে উন্নত মানে তুলতে হ'লে বাইরের লোক সেই কাজ এবং কর্মী সম্বন্ধে কী ভাবছে তার পরিবর্তন আনতে হবে।

সংগঠন ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরস্কার ও শাস্তি হচ্ছে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সংগঠন তার কর্মীকে কাজের জন্য যে পুরস্কার প্রদান করে সেটাকে উৎসাহ-ভাতা বা incentive বলে গণ্য করা যেতে পারে। Robert Dubin কাজের incentive বা প্রেষণার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "Incentives are what the working person gets from his employing organisation for being a productive member." । অর্থাৎ নিয়োগকারী সংগঠন বা সংস্থা, সংগঠনের সদস্যকে তার উৎপানশীলতার জন্য যা প্রদান করে তাকে কর্মপ্রেরণার সংজ্ঞা হিসেবে গণ্য করা যায়। এই incentive হচ্ছে কাজের জন্য বিশেষ কিছু 'পাওনা' হিসেবে লাভ করা। Incentive বা কর্মপ্রেরণাকে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই কাজের বিনিময়ে কিছু অতিরিক্ত প্রাপ্য হিসেবেই গণ্য করেন। তাই বলা হয় যে, incentive হচ্ছে কাজের পরিবেশের একটি অঙ্গ। বিভিন্ন ধরনের incentive দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি সংগঠনে কাজের বিভিন্ন ধরনের সাথে কাজের incentive-কে সুসংবদ্ধ আকারে সন্নিবিষ্ট করা থাকে।

১৪.৫ কর্মপ্রেরণার অর্থ

কর্মপ্রেরণা (incentive) বলতে কি বোঝানো হয় ? আদান-প্রদানই সংগঠনের অস্তিত্বের মূল। মানুষের শ্রম এবং উদ্ভাবনী বা অন্যকিছু সবই অন্তমূলে নির্ধারিত হয়। কাজ থেকে লোকে কিছু প্রত্যাশা করে। যেখানে বেশী পাওয়া যায় লোকে সেখানেই কাজ করতে চায়। কর্মীর কাছে যেটা incentive বলে বিবেচিত হয় যথাসম্ভব সেটাই মালিকের গ্রহণ করা উচিত। কারণ ঐ কর্মীকে কাজে যুক্ত করে রাখার জন্যে এবং কর্মরত অবস্থায় কর্মীকে যথেষ্ট উৎপাদনশীল রাখার জন্য incentive বা কর্মপ্রেরণা সে যে মূল্যেই নির্ধারিত হোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Incentive ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের বা শ্রেণীর হ'তে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে টাকা জড়িত থাকে তাকে financial incentive আর্থিক উৎসাহ-ভাতা বলা যায়।

আধুনিক যুগের ব্যক্তি-মানুষ হচ্ছে "সাংগঠনিক মানুষ" বা Organisation Man। বহুত্ববাদী সমাজে তিন ধরনের স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়—ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার স্বাধীনতা, সংঘ-সমিতির স্বাধীনতা এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। বহুত্ববাদী সমাজের স্থান হচ্ছে "Organisation Man"। "ব্যক্তি" যখন "সাংগঠনিক মানুষ" হয়ে ওঠেন তখন তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ, চাহিদা, দাবী উপেক্ষিত হয়ে যায় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের

পুরস্কার নিজস্ব মূল্য হারিয়ে ফেলে। এইজন্য বলা হয় যে, "The organisation is also held to lose the benefits of individual initiative, inventiveness and drive that would otherwise result if less conformity were demanded of its members"। এই বক্তব্যের ভাবানুষঙ্গে বলা যায় যে, সংগঠনের সীমাবদ্ধতা অনেক। ব্যক্তি-মানুষের উদ্যোগ, উদ্ভাবনী এবং চলার উদ্দেশ্যসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকেজো হয়ে পড়ে কেন না সংগঠন নিয়ম-কানুনের ফাঁসে আবদ্ধ এবং সংগঠনের সদস্যকে বদ্ধ সীমার মধ্যেই কাজ করতে হয়।

কৃষ আর্গিরিস বলেছেন যে, সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর ভিত্তি হচ্ছে যুক্তি বা rationality। তিনি বলেছেন যে, "Formal Organisations are rational organisations." অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলি নিয়ম-কানুনের দ্বারা নিগড়বদ্ধ। যে কোনও সংগঠন গঠিত হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য। ফলে, সংগঠনে যে সকল কর্মী কাজ করেন তাঁরা কোনও না কোনও সময় মনে করেন যে, তাঁরাও ঐ লক্ষ্য অর্জনে আগ্রহী বা ঐক্য লক্ষ্য অর্জন করার অন্যতম উপাদান।

টেলর মনে করতেন যে, কর্মীদের "মানসিক বিপ্লব" (mental revolution) ব্যতীত বৈজ্ঞানিক পরিচালনা পদ্ধতি সাফল্য লাভ করতে পারে না। ফেয়লও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁর espirit de corps-এর ধারণার মধ্যে। আনুষ্ঠানিক সংগঠনের তাত্ত্বিকেরা প্রেষণা বা Motivation সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন সেইগুলিকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত না করায় ঐ ধারণা বা নীতিসমূহকে 'ধরে নেওয়া হয়' মাত্র। তবে, যে বিষয়টা আবশ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা হচ্ছে বিশেষীকরণ (specialisation)-এর প্রয়োজনীয়তা দ্বারা সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামো পরিচালিত হ'লে, সেই সংগঠনে কর্মীদের কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা লাভ করা যেতে পারে।

বিশেষীকরণ নীতি দ্বারা সংগঠিত হ'তে যে কোনও প্রশাসনিক সংগঠনে একটি আদেশ-শৃংখলা বা 'chain of command' দেখা যায়। এখানে এই ধারণা কাজ করে যে, সংগঠনের বিভিন্ন অংশ বা উপাদানগুলিকে যদি একটি স্তরবিন্যস্ত কাঠামোর (determinate hierarchy of authority) মধ্যে সংগঠিত করা যায় যেখানে উর্ধ্বতন অংশ নিম্নতন অংশকে নির্দেশ দান করবে ও নিয়ন্ত্রণ করবে তাহ'লে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। কৃষ আর্গিরিস বলেছেন যে, "If the parts being considered as individual, then they must be motivated to accept control, direction, and co-ordination of their behaviour"। অর্থাৎ, মানুষগুলিকে যদি সংগঠনের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয় তবে তাদের এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে করে তারা নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য, সচেতন এবং আচরণের সমন্বয় প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে।

যেখানে সংগঠনের কাজসমূহকে বিশেষীকৃত করে রাখা হয় সেখানে প্রয়োজন হয় "নির্দেশের ঐক্যের" (Unity of Direction)। নির্দেশের ঐক্যের নীতি অনুযায়ী সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি হয়। সংগঠনের নীতি কর্মীর কাজের সমস্ত দিকগুলি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। এবং এই নিয়ন্ত্রণই কর্মীর মধ্যে কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা তৈরী করে দেবে। এখানে অবশ্য একটি সমস্যার উদ্ভব হ'তে পারে। সেই সমস্যাটি হচ্ছে যে, ব্যক্তি-কর্মীর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সাথে সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর সংঘাত ঘটে যেতে পারে। কৃষ আর্গিরিস ব্যক্তি-কর্মীর প্রয়োজন এবং সংগঠনের চাহিদার মধ্যে যে সংঘাতের উল্লেখ করেছেন তা যে কোনও সংগঠনের একটি মৌলিক সংকট বা সমস্যা। এক্ষেত্রে ব্যক্তি—কর্মী ও সংগঠন উভয়ের তরফে কাম্য—যা হওয়া বাঞ্ছনীয়—তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হ'লে প্রয়োজন পরিচালক দ্বারা কর্মীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সৃষ্টি করা এবং যার দ্বারা কর্মে অনীহাগ্রস্ত কর্মীকে নিয়ন্ত্রণ করে

কর্মে উৎসাহী করে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যক্তি-কর্মীর জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে কাজে ইচ্ছুক ও উৎসাহী করে তোলা। যেমন— বোনাস, লাভের অংশ, নগদ টাকায় অবসরকারীল সুবিধা, ছুটির বিনিময়ে টাকা, স্বাস্থ্য বীমা, বিনাব্যয়ে কোম্পানী কর্তৃক চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন ইত্যাদি।

Non-financial বা অ-আর্থিক উৎসাহ সুবিধায় কোনও অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা যুক্ত থাকে না। এই ধরনের উৎসাহ ভাতা বা incentive বলতে বোঝায় উচ্চতর মর্যাদা লাভ (higher status)। কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিক দায়িত্ব ও ভূমিকা গ্রহণ, প্রকাশ্যে বা জনসমক্ষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রশংসা, কিংবা প্রতীকী কিছু পুরস্কার লাভ। অ-আর্থিক উৎসাহ সাধারণভাবে সেই সকল প্রেষণা বা উদ্দীপক বিষয়সমূহকে বোঝায় যার সঙ্গে টাকাকড়ির কোনও যোগসূত্র থাকে না।

অবশ্য, এমন অনেক উৎসাহ-ভাতা বা incentive আছে যেগুলি আর্থিক ও অ-আর্থিক উৎসাহ হিসেবে কাজ করে। যেমন, পদোন্নতি একটি অ-আর্থিক উৎসাহ হ'লেও পদোন্নতির দ্বারা আর্থিক উৎসাহ বা সুবিধা কর্মী লাভ করে থাকে। এছাড়া, মেধার স্বীকৃতি, প্রবীণতার স্বীকৃতি এবং স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি প্রভৃতিকে আর্থিক ও অ-আর্থিক উৎসাহ (incentive) বলে গণ্য করা যায়।

অর্থাৎ, financial incentive বা আর্থিক উৎসাহ এবং non-financial incentive বা অ-আর্থিক উৎসাহ এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কখনও আর্থিক কখনও আর্থিক-মানসিক। রবার্ট ডুবিন এই প্রসঙ্গে বলছেন যে, কর্ম প্রেরণার বিভিন্ন প্রকরণগুলি জানা জরুরী। কেন না, কর্মীদের কর্মে উৎসাহিত করবার ব্যবস্থাগুলি যে কোনও কর্মও সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তির ওপর কাজের উৎসাহের প্রভাব কি প্রকার হয় তার উপর নির্ভর করে উৎসাহিত হবার ধরন কি হবে। এটকে বলা হয় Subjective Response to incentive অথবা উৎসাহ প্রাপ্তির বিষয়গত সাড়া। একজন ব্যক্তির কাজের সম্পর্কে আত্মতুষ্টি (job staisfaction) কর্মীর কাছে incentive বা মানসিক প্রেরণা হিসেবে কাজ করতে পারে। অন্যদিকে বলা যায়, কাজ সম্পর্কে অসন্তুষ্টি (job dissatisfaction) যখন কোনও কর্মীর কাছ থেকে জানা যায় তখন সেই অসন্তোষ দূর করে কর্মীর প্রত্যাশামত কাজের সন্তুষ্টি বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে সেটাকেও কর্ম প্রেরণা বলে গণ্য করা হয়।

প্রেষণা বা Motivation-এর সাথে যুক্ত আর একটি বিষয় হচ্ছে প্রয়োজনীয় কাজ বনাম স্বেচ্ছা-শ্রম-জনিত কাজ। প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে সেইগুলি যা সাংগঠনিকভাবে প্রাসঙ্গিক ও উচিত বলে মনে হয় এবং স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তি-কর্মীর কাছে নিরপেক্ষ বলে গণ্য হয়। এই প্রয়োজনীয় কাজে যে সমস্ত বিষয় দেখা যায় তাহ'ল—(১) কাজের প্রতি প্রেষণা (motivation for work), (২) প্রয়োজনীয় কাজকে নিয়ন্ত্রণ (control of necessary behaviour) এবং (৩) প্রয়োজনীয় ও স্বেচ্ছামূলক কাজের মধ্যে সাযুজ্য (complimentariness of necessary and volunfary behaviour)। স্বেচ্ছাশ্রম বা কাজ বা আবরণ বলে সেইটিকে বোঝায় যেখানে যুক্তির কারণে বা কার্যকর কোনও কারণে বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে একটিকে পছন্দ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাজে কর্মীর কোনও পছন্দ থাকে না—তাই সেখানে কাজের প্রতি তার উদাসীনতা দেখা যেতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছামূলক কাজে তার পছন্দ ক্রিয়াশীল থাকায় তার কাজের প্রতি উদাসীন হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

বর্তমান যন্ত্র-প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে কর্মীর কাজ যেমন প্রয়োজনীয় কাজ বলে গণ্য হয় ঠিক তেমনই কর্মীর কাজকে স্বেচ্ছামূলক রাখার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় সংগঠনের কর্মীরা এমনকি পরিচালকবৃন্দের অনেকেই কাজ করেন, সেই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তাঁদের জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয় নয়। ফলে, সংগঠনের কাজে দেখা যায় তাঁদের বীতরাগ, অনীহা ও কর্মবিমুখীনতা। কিন্তু যে সকল কর্মী সংগঠনের কাজকে তাঁদের জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয় বলে মনে করেন তাঁরা সকলে কাজকেই তাঁদের জীবন বলে মনে করবেন। তাঁদের কাছে সংগঠনে কাজ করার দ্বারা নিজেকে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে নিজেকে জাহির করে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন সেটাই তাঁদের কাজের "পুরস্কার" হিসেবে গণ্য হয়। এই অবস্থা ব্যাখ্যা করে এই প্রসঙ্গে রবার্ট ডুবিন মনে করেন যে, সংগঠনে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়ে কর্মী নিজেকে সংগঠনের অংশ বলে মনে করতে পারে এবং ব্যক্তিগত বঞ্চনা ও ব্যর্থতাবোধ থেকেও মুক্ত হ'তে পারে। সামগ্রিক বিচারে তাই বলা যায় যে, একজন ব্যক্তি-কর্মী যেভাবে সংগঠনের পরিধির মধ্যে যুক্ত রাখেন তার উপর অনেকটাই নির্ভর করে সংগঠনের কাজে কর্মীর স্পৃহা বা প্রেষণার মাত্রা।

আমাদের মধ্যে কেউই কাজকে খুব একটা প্রিয় বিষয় হিসেবে দেখে না বা নিজের জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয় বলে মনে করে না ; এই মনোভাব থেকেও কর্মীদের কর্মে অনীহা ও ঔদাসীন্য বা নির্লিপ্ততাকে কাটিয়ে ওঠা যায়। সংগঠনের স্তরবিন্যস্ত কাঠামোকে হ্রাস করে বা একেবারে উচ্ছেদ করে সংগঠনের সকল কর্মীদের মধ্যে ক্ষমতার সমতা এনে কর্মীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করা যায় বলে কৃব আর্গিরিস মনে করেন। অন্যদিকে রেনসিস লিকার্ড বলেছেন যে, "But if the nature of the job makes poweer-equalisation techniques impractical, change the nature of the job." । অন্যভাবে, লিকার্ড-এর বক্তব্য হ'ল কাজের প্রকৃতি যদি এমন হয় যে, সেখানে বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার সমীকরণ সম্ভব নয় তবে কাজের প্রকৃতির মধ্যেই পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, "To be highly motived, each member of the organisation must feel that the organisation's objectives are of significance." । লিকার্ড আরও এগিয়ে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, কর্মীকে তার কাজ সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হ'তে গেলে তাকে অবশ্যই বোধ করতে হবে, সে যে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তার উদ্দেশ্যগুলি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৪.৬ কাজের প্রকৃতি ও কর্মস্পৃহা

কাজের ধরন বা প্রকৃতি পরিবর্তন করে প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করার নানা উপায় আছে। বিশেষত, কর্মীকে যদি কাজের স্বাতন্ত্র্য ও সাফল্য পৃথকভাবে দেওয়া হয় তাহ'লে কর্মীর মধ্যে কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা জাগরিত হয়। এছাড়া, যদি যথাযথ তদারকির ব্যবস্থা থাকে এবং উপযুক্ত কর্মীবৃন্দকে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করা যায় তাহ'লেও কর্মীর মধ্যে কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা দেখা যাবে। আবার, কাজের যন্ত্রপাতি বা কৃৎকৌশলের পরির্তন হ'লেও কর্মীর প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি যদি কাজের শ্রমের ঘন্টা হ্রাস করে দেওয়া যায় এবং অবসর বিনোদনের পূর্ণ ব্যবস্থা রাখা যায় তাহ'লেও কর্মীদের কাজের যথেষ্ট উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং কর্মস্পৃহা থাকে। সবশেষে বলা যায়, কর্মীদের কাজের নিরাপত্তা বা স্থায়িত্ব কর্মীদের কাজে প্রেষণা সৃষ্টি করে। আবার, অনেক সময় এটার বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। কর্মী যখন অস্থায়ী থাকে তখন তার কর্মস্পৃহা ও কর্মচাঞ্চল্য যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু

যে মুহূর্তে অস্থায়ী কর্মীটি স্থায়ীপদে নিযুক্ত হয়ে যায় এবং তাঁর চাকুরীর নিরাপত্তা গ্যারান্টিকৃত অবস্থায় থাকে তখন কর্মীর কর্মস্পৃহার অন্তর্ধান হয়। কর্মী ক্রমশ তাঁর কাজকর্মের প্রতি নিস্পৃহ হয়ে পড়েন। এই ধরনের ঘটনা ভারতের মতো অনুন্নত দেশে সর্বাধিক মাত্রায় দেখা যায়। শুধু তাই নয়, যদি কর্মীদের ক্ষমতার মধ্যে সমতা (power equlisation) চালু করা হয় কর্মীর কর্মস্পৃহা তৈরীতে তা হিতে বিপরীত হ'তে পারে। কারণ তখন মুড়ি-মিছরী সব একদর হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে নিম্নমানের কর্মী তো উন্নত কর্মস্পৃহালাভে ইচ্ছুক হবেন না ; বরং উন্নত কর্মস্পৃহার কর্মীর কর্মস্পৃহা তাঁরা নষ্ট করবেন।

রবার্ট ডুবিন প্রেষণা বা কর্মস্পৃহার সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, "By motivation we usually mean mechanisms inside the person that must aim his continued activity as a human being."। রবার্ট ডুবিন কর্মস্পৃহা বা প্রেষণার প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, মানুষের অভ্যন্তরে একটি কার্যপদ্ধতি যা নাকি মানুষকে সর্বদাই সক্রিয় করে রাখে। এই সংজ্ঞা থেকে তিনি তিনটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন,—(১) ব্যক্তির অভ্যন্তরে ঠিক কোথায় প্রেষণা-শক্তির উৎপাদন থাকে ? (২) কোন বিশেষ কাজে বিশেষ ব্যক্তি যে পছন্দ বা উৎসাহ লাভ করে তা ব্যক্তির অভ্যন্তরে ঠিক কি বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হ'তে পারে ? (৩) কেমনভাবে প্রেষণা নামক বিশেষ বস্তুর সারবত্তা ব্যক্তির মধ্যে থাকতে পারে ?

মনস্তত্ত্বের প্রাচীন বা সাবেকী মতানুসারে প্রেষণা বা কর্মস্পৃহাকে ব্যক্তির জন্মগত অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি বলে মনে করা হ'ত। যেহেতু ব্যক্তি জন্মসূত্রে কর্ম-প্রচেষ্টার স্পৃহা বা প্রবৃত্তি লাভ করে, তাই উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর একবাক্যেই দেওয়া হ'ত যে, কর্মস্পৃহা বা কর্ম-প্রচেষ্টা বা প্রেষণা ব্যক্তির জন্মগত ব্যাপার।

কিন্তু প্রবৃত্তি দ্বারা (instinct-mode) প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা বা কর্মপ্রচেষ্টা ব্যক্তির মধ্যে দেখা—এই তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদি বলা হয়, ব্যক্তি-মানুষ ক্ষুধার চাহিদা (hnnger-instinct) মেটানোর জন্য কিংবা যৌন চাহিদা (sex-instinct) মেটানোর জন্য কর্মে প্রবিষ্ট হয় বা কর্মস্পৃহা লাভ করে তাহ'লে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে বিভিন্ন ব্যক্তির খাদ্যাভ্যাস (food-habits) থাকে বিভিন্ন ধরনের। একই খাবারের বিভিন্ন প্রকার রন্ধন-পদ্ধতি এবং খাবারের আসবাবপত্রও বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে। এছাড়া, একই ধরনের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন হ'তে পারে এবং তার ফলে তাঁর খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হ'তে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা সম্পর্কে যে কথাটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে—Motivation is some form of exchange between the individual and his social environment."। অর্থাৎ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা হ'ল ব্যক্তি-মানুষ ও তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে একধরনের বিনিময় অর্থাৎ সহজ করে বলতে গেলে দেওয়া নেওয়া মাত্র।

এখানে 'Motivation' বলতে যে অর্থ প্রকাশ পায় তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, "motivating soldiers to fight". বা সৈন্যদের যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া, "motivating junior executives" অথবা প্রাথমিক স্তরের পরিচালকদের উৎসাহিত করা, "motivating workers" কর্মীদের উৎসাহ দেওয়া, এই সব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, প্রেষণা হচ্ছে এক ধরনের "drive" অথবা ধাবন প্রক্রিয়া। যে কোন সংগঠনে সদস্যদের বা কর্মীদের ব্যক্তিগত প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা নির্ধারিত হয় সংগঠনের মূল্যবোধ, রীতিনীতি ইত্যাদির দ্বারা।

১৪.৭ সারাংশ

এই এককে আমরা জানতে পারলাম যে, কোন সংস্থা, তা সে বেসরকারী হউক কিংবা সরকারী, সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য যে কর্মীবৃন্দ থাকে সেই কর্মীদের কাজে যাতে উৎসাহ পায় ও আত্মনিয়োগ করে তার জন্য কর্মস্পৃহা বা প্রেষণার দরকার। কর্মীদের কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সামাজিক কাঠামোর মধ্যে তৈরী হয়ে থাকে। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় অভাবনীয় উন্নতির ফলে সংগঠনগুলি কর্মীদের নানাভাবে কর্মপ্রেরণা যুগিয়ে থাকে। সংক্ষেপে বলতে হ'লে, কর্মরত অবস্থায় কর্মীকে যথেষ্ট উৎপাদনশীল রাখার জন্য কর্মপ্রেরণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৪.৮ অনুশীলনী

অনুশীলনী—১

১। প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা বলতে ঠিক কি বোঝানো হয়?

২। রবার্ট ডুবিন কিভাবে প্রেষণার সংজ্ঞা দিয়েছেন?

৩। সংগঠনের অগ্রগতিতে প্রেষণার ভূমিকা কতটুকু?

৪। উদাহরণ সহযোগে প্রেষণার অর্থ স্পষ্টভাবে লিখুন।

অনুশীলনী—২

১। প্রেষণা ব্যবস্থা পরিচালনায় সামাজিক কাঠামো বা সংগঠন কেমন করে কাজ করে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২। কর্মপ্রেরণা (incentive) কিভাবে পরিমাপ করা যায় এবং কিভাবেই বা শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে?

৩। সংগঠনের কর্মীর কর্মস্পৃহা ও প্রেষণা মাত্রা কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে?

৫। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীর কর্মপ্রেরণার (incentive) উপায়গুলির প্রকৃতি কি?

১৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। Mohit Bhattacharjya : New Horizons of Public Administration

২। Vroom Victor H. : Work and Motivation, Wiley Eastern. New Delhi 1980.

৩। Dwivedi. R. S. : Human Relations and Organisational Behavior, Oxford IBH Publishing Co. New Delhi 1979.

একক ১৫ ❑ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সংক্রান্ত তত্ত্বাবলী

গঠন

১৫.০ উদ্দেশ্য
১৫.১ প্রস্তাবনা
১৫.২ তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ
১৫.২.১ প্রয়োজন তত্ত্ব
১৫.২.২ উৎসাহ তত্ত্ব
১৫.২.৩ আকাঙ্খা তত্ত্ব
১৫.৩ কাজের পরিকল্পনা
১৫.৪ সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ
১৫.৫ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সৃষ্টিতে নগদ অর্থের ভূমিকা
১৫.৬ সারাংশ
১৫.৭ অনুশীলনী
১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১৫.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সম্পর্কে প্রচলিত তত্ত্বগুলির প্রকৃতিগত পার্থক্য
- কর্মপরিকল্পনা কর্মীর কর্মস্পৃহাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে
- সংগঠনে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ প্রেষণা তৈরী করার ক্ষেত্রে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে
- কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সৃষ্টিতে নগদ অর্থের ভূমিকা কী?

১৫.১ প্রস্তাবনা

এই এককে কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বাবলী আলোচনা করা হবে। সময়, স্থান এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনবিদরা কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সংক্রান্ত নানা তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন। এই তত্ত্বগুলি সমেত

আরও অন্য উপাদানের ভূমিকাও এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ কর্মের সংস্থানে যায় অর্থের প্রয়োজনে। তাই কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন, অর্থ ও আকাঙ্খা সবারই গুরুত্ব আছে। এই দিকটা প্রশাসনিবদদের নজর এড়ায়নি। তাই জন-প্রশাসনের সংগঠনে কর্মীদের কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা বৃদ্ধি করতেও এই তত্ত্বগুলি নানাভাবে জন-প্রশাসনের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে থাকে।

১৫.২ তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত তত্ত্বাবলী

কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা অর্থৎ Motivation সম্বন্ধে একাধিক তত্ত্ব প্রচলিত। এই তত্ত্বসমূহের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত হচ্ছে প্রয়োজন তত্ত্ব (Need Theory), উৎসাহ তত্ত্ব (Incentive Theory) এবং আকাঙ্খা তত্ত্ব (expectancy Theory)। তত্ত্বগুলি প্রায়শই মানবতাবাদী মনস্তাত্ত্বিক। যদিও তত্ত্বগুলির মধ্যে প্রকৃতিগত কিছু বিভিন্নতা লক্ষণীয়।

১৫.২.১ প্রয়োজন তত্ত্ব

প্রয়োজন তত্ত্ব অনুযায়ী কর্মীর আচরণকে উদ্দীপ্ত করার জন্য ব্যক্তি কর্মীর নিজস্ব প্রয়োজনকে অর্থাৎ কর্মীর আভ্যন্তরীণ বিষয়কে প্রেষণার শক্তি হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, "Needs act as the prime causes of individual Behaviour". অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনবোধই তার আচরণকে নির্ধারণ করে। মাসলো (Maslow) এই প্রসঙ্গে পাঁচ প্রকার প্রয়োজনের উল্লেখ করেছেন, যথা—জৈবিক নিরাপত্তা, সামাজিক, মর্যাদা এবং আত্মপ্রকাশ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোনও উচ্চতর প্রয়োজন পূরণের পূর্বে নিম্নতর প্রয়োজন প্রথমে পূরণ করা প্রয়োজন।

ম্যাকলেলাণ্ড (Mclelland) অবশ্য সামাজিক প্রয়োজনেরও তিনটি ভাগ করেছেন। সাফল্য অর্জনের প্রয়োজন, অনুমোদন বা স্বীকৃতির প্রয়োজন, ক্ষমতার প্রয়োজন। ম্যাকলেলাণ্ডের মতে, কর্মী নিয়োগের সময়ই দেখে নিতে হবে যে, কর্মী কোন্ ধরনের প্রয়োজন দ্বারা পরিচালিত হ'তে পারে।

অতি সম্প্রতি অলডারফার (Alderfer), প্রয়োজন তত্ত্বের তিনটি উপাদান উল্লেখ করেছেন—অস্তিত্ব, সম্পর্ক এবং উন্নতি। এই তিনটি উপাদানের সাথে মাসলোর বিশ্লেষণের মিল আছে।

১৫.২.২ উৎসাহ তত্ত্ব

উৎসাহ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, কর্মীর প্রেষণা বাহিরের শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়। হার্জবার্গ এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দুইটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন— Hygiene factor সাংগঠনিক সুস্বাস্থ্যগত উপাদান এবং Motivation factor বা কর্মস্পৃহাগত উপাদান। Hygiene factor বলতে হার্জবার্গ বুঝিয়েছেন টাকাকড়ি, (money, salary/wages) চাকুরীর শর্তাবলী, কোম্পানীর নীতিদায়ক ব্যবস্থা ও কর্মীদের আন্তঃসম্পর্ক।

Hygiene factor-এর উন্নত অবস্থা বা মান সৃষ্টি করে চেষ্টা করা হয় যেন কর্মীরা অসন্তুষ্ট (dissatisfied) না থাকেন। কর্মীদের মধ্যে প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা জাগ্রত করার জন্য কাজের অন্তস্থ প্রকৃতি (intrinsic aspects of the job) যেমন—সাফল্য, স্বীকৃতি, দায়িত্ব এবং অগ্রগতি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১৫.২.৩ আকাঙ্খা তত্ত্ব

আকাঙ্খা তত্ত্ব মূলত কর্মীর 'পছন্দ'-র উপর কর্মীর প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে একজন কর্মী তাঁর কর্ম বা কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার নিজের দিকে তাকিয়েই একজন কর্মীর কর্মস্পৃহা জাগ্রত হয়। এই তত্ত্বে গুরুত্ব দেওয়া হয় একজন কর্মী কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—অর্থাৎ, কর্মীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর। কর্মী নিজের আকাঙ্খা অনুযায়ী নিজের পছন্দমত আচরণ অনুসারী হয়। আকাঙ্খিত পুরস্কার (কাম্য) লাভ করার জন্য নিজের কর্মস্পৃহা জাগ্রত করে। এই অবস্থায় কর্মী চিন্তা করে যে, কিভাবে কোন কাজ করলে কাম্য পুরস্কার সে লাভ করতে পারে। আকাঙ্খা তত্ত্বের একজন শক্তিশালী প্রবক্তা হ'লেন ব্রুম (Vroom)। ব্রুমের কল্পিত মডেল বা আদল অনুসারে কর্মী তার কাঙ্খিত প্রাপ্তির আশাতেই তার কাজের পরিমাণ ঠিক করে এবং সেই মত পরিশ্রমের মাত্রা নির্দিষ্ট করে নেয়।

১৫.৩ কাজের পরিকল্পনা

কর্মীর প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাজের পরিকল্পনা বা ছক (Work Design) হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজের পরিকল্পনা বা ছক প্রণয়নে দু'টি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রচলিত— বৈজ্ঞানিক পরিচালন দৃষ্টিভঙ্গি (Scientific management approach) এবং কাজের বৈশিষ্ট্যগত দৃষ্টিভঙ্গী (Job characteristic approach)।

বৈজ্ঞানিক পরিচালন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে কাজকে পরিচালনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। কাজকে পরিসংখ্যান আকারেও প্রকাশ করা হয়। তার ফলে, কাজের প্রত্যেকটি অংশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার হিসেব নির্ধারণ করা যায়। একটি বিশেষ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করার জন্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়। কাজের সফল পরিসমাপ্তি ঘটলে আর্থিক সুবিধা প্রদান বা বোনাস-প্রদানের দ্বারা পুরস্কার দেওয়া সম্ভব হয়।

কাজের বৈশিষ্ট্যগত দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গবেষণার দ্বারা তিনটি মনস্তাত্ত্বিক উপাদানকে চিহ্নিত করা হয়। এই তিনটি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান বলা বাহুল্য, কর্মীর কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা এবং কাজের সন্তুষ্টি উভয়দিকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি উপাদান হ'ল—(১) কর্মী অবশ্যই তার কাজকে অর্থপূর্ণ বলে মনে করবে, (২) তার কাজের ফলাফল সম্পর্কে কর্মীর অবশ্যই যথাযথ জ্ঞান পূর্বাহ্নেই থাকা উচিত, (৩) কর্মীর কাজের ফলাফলের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব যে তার, এই ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ফলে, কাজের ফলাফলের প্রতি কর্মীর দায়বদ্ধতা থাকে। তখন কর্মী তার কাজকে উপেক্ষা করে নিজের কাজের প্রতি বিমুখ থাকে না। অর্থাৎ, কাজের প্রতি অনীহা বা কাজে

স্পৃহা বা প্রেষণা না থাকা ব্যাপারটা তখন আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। কাজে স্পৃহা বা প্রেষণা দেখা যায় যদি এই তিনটি উপাদান ইতিবাচকরূপে উপস্থিত থাকে ; তখন কর্মীর নিজের মধ্যে প্রেষণা বা motivation এবং কাজের সন্তুষ্টি অধিক পরিমাণে থাকে। ফলে, কর্মীরা কাজে কম অনুপস্থিত থাকে এবং কাজের উৎপাদন ব্যাহত হয় না। অবশ্য, এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি অসুবিধাও দেখা যেতে পারে ; যেমন, বিভিন্ন কর্মীর উৎপাদন ক্ষমতা বিভিন্ন। তাই তখন তাদের যদি চ্যালঞ্জের মুখে ফেলে দেওয়া হয় তখন তা থেকে কর্মীদর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। এছাড়া দেখা যায় যে, সংগঠনের সামগ্রিক পরিচালনব্যবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্টি, যেমন—বেতন, চাকুরীর নিরাপত্তা, সহকর্মী ও পরিদর্শক বা তদারকি অধিকর্তার মধ্যেকার সম্পর্ক এবং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা প্রভৃতি, কর্মীর মনের আভ্যন্তরীণ প্রেষণাকে নির্ধারিত ও পরিচালিত করে। বিভিন্ন মানবতাবাদী মনস্তাত্বিক লেখকদের মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রয়োজন, উৎসাহ এবং আকাঙ্খা—এই তিনটি তত্ত্বের উপাদান সন্নিবেশিত করে কর্মীর কর্মস্পৃহার মাত্রা বৃদ্ধির একটা সঠিক কৌশল নির্ধারণ করা সম্ভব। তবে, এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে তা হচ্ছে—কাজের মূল্যায়ন, কাজের উন্নতি, গুণমান-বৃত্ত, পচিালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতৃত্ব প্রদান। স্বতন্ত্র কর্মীগোষ্ঠী, সংগঠনের স্বাভাবিক কাঠামো, চাকুরী বা কাজের মেয়াদ, কর্মীদের ভাতা, সুবিধা এবং নির্দিষ্ট দায়বদ্ধতা-ভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা।

১৫.৪ সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ

কর্মীর কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা তৈরীর ক্ষেত্রে কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় বা মতামতের আদান-প্রদান বা পারস্পরিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে (Communications in organisations are important influences on the motivational levels of staff.)। যদি সংগঠনের কর্মীদের পারস্পরিক যোগাযোগ একেবারে অনুপস্থিত থাকে তাহ'লে কর্মীদের কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে। পারস্পরিক যোগাযোগ বা সংযোগের অভাব তথ্য বা সংবাদ সরবরাহ বা প্রাপ্তি ক্ষেত্রে কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টি করতে পারে। কর্মীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং কাজের শর্তাবলী বা কাজের পরিবেশ, কর্মী-মালিক বা কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, বেতন, কাজের পরিকল্পনা এবং এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তথ্যাদি যেভাবে কর্মীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয় তার দ্বারা কিন্তু কর্মীদের কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা উচ্চগ্রামে পৌছতে পারে ; অন্যথায় নিম্নগ্রামে পৌঁছে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

তবে, সাধারণভাবে মন্তব্য করা যায় যে, যেহেতু প্রত্যেক সংগঠনে কর্মীদের কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই বলা যায় যে, কম কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা থাকলে কর্মীদের দ্বারা কাজ কম হয়। এই ধরনের হতাশা ও ব্যর্থতাজনিত পরিস্থিতি সংগঠনের মালিক বা শ্রমিক কর্মচারী কারও পক্ষে মোটেই কাম্য নয়। কি এবং কোন্ ধরনের সমস্যা সংগঠনে কর্মীদের কর্মস্পৃহায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তা চিহ্নিত করে সেই সমস্যাগুলি সমাধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কর্মীদের কর্মস্পৃহার উন্নতি সব সময়েই ঘটানো যায় যদি মালিক বা কর্তৃপক্ষ সেটা একান্তই চান। সেজন্য মালিকদের বা কর্তৃপক্ষের প্রথমেই উচিত শ্রমিক

বা কর্মচারীর দিকে উপযুক্ত নজর দেওয়া—শ্রমিকরা কি চিন্তা করে এবং শ্রমিকরা কি ধরনের কাজ করতে চায় তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। এক্ষেত্রে সারমর্ম হচ্ছে, কর্মীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি বা উন্নতির জন্য প্রথমেই মালিক বা কর্তৃপক্ষের নিজেদেরই আত্ম-সমীক্ষা বা আত্মানুসন্ধান করা উচিত ও প্রয়োজন।

১৫.৫ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সৃষ্টিতে নগদ অর্থের ভূমিকা

কর্মীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধিতে নগদ অর্থের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নগদ অর্থ দ্বারা কর্মী জৈবিক প্রয়োজন, যথা—খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয় সংগ্রহ করতে পারে। এই ধরনের ন্যূনতম জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর সাথে কর্মীর আরও কিছু অতিরিক্ত জৈবিক প্রয়োজনজনিত চাহিদা সৃষ্টি হ'তে পারে। যেমন, পান, চা, তামাক ইত্যাদি সেবন অভ্যাস। এই ধরনের খাদ্য-পানীয়র মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের পর কর্মীর অন্যান্য দ্রব্যাদির জন্য চাহিদা সৃষ্টি হয়।

ন্যূনতম মৌলিক জৈবিক চাহিদার পর কর্মীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আর্থিক নিরাপত্তা। বার্ধক্য, স্বাস্থ্যহানি, বেকারী, অসুস্থতা প্রভৃতি অবস্থায় যাতে আর্থিক নিশ্চয়তা থাকে তার জন্য প্রত্যেক কর্মী-ই চায় আর্থিক নিরাপত্তা।

আর্থিক নিরাপত্তার পর কর্মীর দৃষ্টি থাকে সামাজিক প্রয়োজন পূরণের দিকে। এর জন্য কোনও কর্মী একটি ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করতে পারে। কিন্তু ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করেই যে ক্লাবের সকল সদস্যদের সাথে বন্ধুত্ব লাভ করা যাবে তা নাও হ'তে পারে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক কর্মী নিজের সামাজিক মর্যাদা লাভে ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করতে চায়।

কর্মীদের চাহিদার মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে থাকে মর্যাদার প্রয়োজন। মার্কিন জীবনধারায় নগদ অর্থের গুরুত্ব থাকে কেবলমাত্র মর্যাদা ও সাফল্যের (Status and Achievement)। অনেক কর্মী তার বেতনকে তার নগদ অর্থের প্রয়োজনের চাইতে তার গুণের মূল্য হিসেবে দেখে। এক্ষেত্রে একজন কর্মী নগদ অর্থকে তার আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর বস্তু বলে গণ্য না করে প্রতিবেশী-বন্ধুর কাছে নিজেকে অধিক যোগ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তার বেতন-ভাতা ইত্যাদি নগদপ্রাপ্তিকে গুরুত্ব দান করে থাকে। এই ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের কাছে শুধু নগদ অর্থর গুরুত্ব ততটা থাকে না।

নগদ অর্থ মানুষের ন্যূনতম বা নিম্নতর জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য যতটা প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ সমাজের উচ্চস্তরে মান-মর্যাদা বা স্বীকৃতি প্রভৃতি উচ্চস্তরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় হ'লেও অর্থ দ্বারাই সেই উচ্চতর সামাজিক মান-মর্যাদা বা স্বীকৃতি সম্ভব হয় না। এ প্রসঙ্গে চার্লস ম্যাকডারমিডের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "Man's striving for money, once his basic needs are satisfied, often becomes a substitute for the true satisfaction of his higher needs." । অর্থাৎ ম্যাকডারমিডের ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় যে, অর্থের বিনিময়ে মানুষের জৈবিক ন্যূনতম প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর অর্থ বা সম্পদ হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের উচ্চতর প্রয়োজন মেটানোর সোপান-বিশেষ। এ প্রসঙ্গে হার্বার্ট হিক্স্ সম্পাদিত প্রবন্ধাবলীর উল্লেখ করা যায়। সুতরাং বলা যায় যে, শুধু পুরস্কারের লোভে বা শাস্তির ভয়ে কর্মী তার কাজে কর্মস্পৃহা লাভ

প্রকৃতিগত বিভিন্নতা লক্ষণীয়। কর্মস্পৃহা তৈরী করতে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নগদ অর্থের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

১৫.৭ অনুশীলনী

১। কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি কি কি?

২। প্রেষণা সংক্রান্ত তত্ত্বাবলীর মূল বক্তব্য কি?

৩। সংগঠনের কর্মীদের কর্মস্পৃহা বা প্রেষণার মাত্রা বৃদ্ধি করা কিভাবে সম্ভব?

৪। সংগঠনে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৫। কর্মস্পৃহা সৃষ্টিতে অর্থের গুরুত্ব কি রূপ?

৬। মানুষের কর্মস্পৃহা সৃষ্টিতে অর্থ ছাড়া আর কি কি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ।

৭। কর্মস্পৃহা সৃষ্টিতে ডি. এম. ম্যাকগ্রিগরর্স-এর বক্তব্য উল্লেখ করুন।

১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Mohit Bhattacharya : *New Horizons of Public Administration*

২। S. R. Maheswari : *Administrative Thinkers.*

৩। রুমকি বসু ও পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ঃ *লোক প্রশাসন।*

প্রকৃতিগত বিভিন্নতা লক্ষণীয়। কর্মস্পৃহা তৈরী করতে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নগদ অর্থের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

১৫.৭ অনুশীলনী

১। কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি কি কি?

২। প্রেষণা সংক্রান্ত তত্ত্বাবলীর মূল বক্তব্য কি?

৩। সংগঠনের কর্মীদের কর্মস্পৃহা বা প্রেষণার মাত্রা বৃদ্ধি করা কিভাবে সম্ভব?

৪। সংগঠনে কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৫। কর্মস্পৃহা সৃষ্টিতে অর্থের গুরুত্ব কি রূপ?

৬। মানুষের কর্মস্পৃহা সৃষ্টিতে অর্থ ছাড়া আর কি কি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ।

৭। কর্মস্পৃহা সৃষ্টিতে ডি. এম. ম্যাকগ্রিগরর্স-এর বক্তব্য উল্লেখ করুন।

১৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Mohit Bhattacharya : *New Horizons of Public Administration*

২। S. R. Maheswari : *Administrative Thinkers.*

৩। রুমকি বসু ও পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ঃ *লোক প্রশাসন।*

একক ১৬ ❑ কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা সৃষ্টি সম্পর্কে ফ্রেডরিক হার্জবার্গের ও আব্রাহাম মাসলোর তত্ত্ব (Theories of Frederick Herzberg and Abraham Maslow on motivation)

গঠন

১৬.০ উদ্দেশ্য

১৬.১ প্রস্তাবনা

১৬.২ হার্জবার্গের তত্ত্বের প্রকৃতি

১৬.৩ হার্জবার্গের তত্ত্বের সন্তুষ্টি বিধায়ক শক্তিগুলি

১৬.৪ অসন্তুষ্টির কারণগুলি

১৬.৫ নিবারণমূলক উপাদান

১৬.৬ হার্জবার্গের তত্ত্বের সমালোচনা

১৬.৭ আব্রাহাম মাসলোর তত্ত্বের অর্থ ও প্রকৃতি

১৬.৮ মাসলোর "প্রয়োজন" ধারণার ব্যাখ্যা

১৬.৯ মাসলোর তত্ত্বের সমালোচনা

১৬.১০ সারাংশ

১৬.১১ অনুশীলনী

১৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১৬.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- হার্জবার্গের তত্ত্বের মৌলিকতা কতখানি
- কাজের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মীর মানসিক স্বাস্থ্য ও শক্তি বিকাশের সম্পর্ক স্থাপন কিভাবে হয়ে থাকে
- কাজের সন্তুষ্টি বিধায়ক শক্তিগুলি কি কি
- আব্রাহাম মাসলোর প্রয়োজনীয়তার স্তরবিন্যাস তত্ত্বের গুরুত্ব কী

১৬.১ প্রস্তাবনা

এই এককে কর্মস্পৃহা বা প্রেষণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফ্রেডরিক হার্জবার্গের ও আব্রাহাম মাসলোর তত্ত্বের উপযোগিতা আলোচনা করা হবে। হার্জবার্গের তত্ত্বটি Motivation-Hygiene Theory নামে সুপরিচিত। এই তত্ত্বটি কার্যকরী করার পশ্চাতে যে শক্তিগুলি কাজ করে এই এককে বিশদভাবে আলোকপাত করা হবে। হার্জবার্গের সঙ্গে আব্রাহাম মাসলোর তত্ত্বটি কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। হার্জবার্গ যাকে শক্তি বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন মাসলো তাকে প্রয়োজন বলে নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

১৬.২ হার্জবার্গের তত্ত্বের প্রকৃতি

হার্জবার্গের তত্ত্ব হচ্ছে কাজের প্রেষণা বা স্পৃহার সাথে কাজের স্বাস্থ্য বা পরিষেবা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একজন কর্মী তাঁর কাজ সম্পর্কে সুখী বা অসুখী হওয়ার মনোভাব বিশ্লেষণে হার্জবার্গ এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

হার্জবার্গ বলেছেন যে, কাজ সম্পর্কে সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টি পরস্পর বিপরীতে অবস্থান নাও করতে পারে। এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থা না সন্তুষ্টি (No satisfaction) বা না অসন্তুষ্টি (No dissatisfaction) একজন কর্মীর মধ্যে থাকতে পারে। এইজন্য দেখা যায় যে, কাজে অসন্তুষ্টি থাকলে একজন কর্মী এখন আর প্রতিবাদ (Protest) না করে এড়িয়ে (Avoid) যান। এই অবস্থা থেকে শুরু হয় কর্মীর মধ্যে কর্মপ্রেষণার অভাব বা কর্মস্পৃহার অভাব।

হার্জবার্গের তত্ত্ব হচ্ছে—কাজের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মীর মানসিক স্বাস্থ্য বা শক্তি বিকাশের সম্পর্ক স্থাপনের তত্ত্ব। তাঁর তত্ত্বকে Motivation-Hygiene Theory অর্থাৎ কর্মীর কর্মস্পৃহা-সাংগঠনিক সুস্বাস্থ্যগত তত্ত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। তিনি দু'টি উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন—(১) একজন কর্মীর কাজে সন্তুষ্টি-বিধানের (satisfier) বিষয়টিকে চিহ্নিত করা, (২) একজন কর্মীর কাজে অসন্তুষ্টি-বিধানের (dissatisfier) বিষয়টিকে চিহ্নিত করা।

হার্জবার্গের এই দুই উপাদানের তত্ত্ব 'কাজের সন্তুষ্টির' পাঁচটি উপাদান ও 'কাজের অসন্তুষ্টির' পাঁচটি উপাদানকে চিহ্নিত করে। তাঁর মতে, কাজের বিষয় এবং কর্মীর মানসিক স্বাস্থ্য বা শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে কাজের 'সন্তুষ্টি বিধায়ক' শক্তি। অন্যদিকে 'যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি এবং কাজের প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ' হতে পারে কাজের অসন্তুষ্টি বিধায়ক শক্তি।

১৬.৩ হার্জবার্গের তত্ত্বের সন্তুষ্টি বিধায়ক শক্তিগুলি

হার্জবার্গের মতে, কাজের সন্তুষ্টি-বিধায়ক শক্তিগুলি হচ্ছে যেমন—

(১) সাফল্য বা কৃতিত্ব (Achievement) : একজন কর্মীর উদ্যোগে স্বাধীনভাবে যদি কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে যে সাফল্য আসে, সেই সাফল্য কাজের ব্যাপারে সন্তুষ্টি বিধান করে।

(২) স্বীকৃতি (Recognition) ঃ কাজের সাফল্যের স্বীকৃতিকে সাধারণের মধ্যে গণ্য না করে যদি বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়, তাহলে কর্মী নিজের কাজের ব্যক্তিগত স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। এই ধরনের স্বীকৃতি কাজের সন্তুষ্টি বিধায়ক উপাদান হয়।

(৩) কাজের নিজস্ব ধরণ (Work itself) ঃ কাজের বিষয়বস্তু এমন ধরনের হতে পারে যা নূতন আগ্রহ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে স্বাধীনভাবে কর্মীকে কাজ করতে উদ্দীপ্ত করে এবং কর্মীকে কাজের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি দেয়। এই ধরনের কাজ করে কর্মী নিজে নিজে এক ধরনের সন্তুষ্টি লাভ করে।

(৪) দায়িত্ব Responsibility) ঃ কোন কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব যদি কোন কর্মীকে দেওয়া হয় এবং অন্যের কাজের ব্যাপারেও কোন কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে দায়িত্ব পাওয়ার গৌরবে একজন কর্মী নিজের কাজে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।

(৫) অগ্রগতি ও বিকাশ (Advancement and growth) ঃ উচ্চমানের কাজ করাকে কর্মী অগ্রগতি বলে মনে করে। এই অগ্রগতিতে নিজের বিকাশ ঘটছে বলেও কর্মী মনে করে। নূতন কাজে আগ্রহ ও উৎসাহ পায়। তাই উন্নতমানের কাজকে কর্মী নিজের সন্তুষ্টির বিশেষ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে।

১৬.৪ অসন্তুষ্টির কারণগুলি

অন্যদিকে যে যে বিষয় কাজের মধ্যে তীব্রভাবে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করতে পারে (dissatisfier) সেইগুলি হ'লো—

(১) বেতন (Salary)

(২) কোম্পানীর নীতি (Company policy) ও প্রশাসন (Administration)

(৩) তদারকি (Supervision)

(৪) কাজের শর্তাবলী (Working condition)

(৫) ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক (Interpersonal relations)

১৬.৫ নিবারণমূলক উপাদান

হার্জবার্গের মতে কর্মস্পৃহা ও সাংগঠনিক সুস্বাস্থ্যগত বা Motivation-Hygiene-তত্ত্বে কাজের সন্তুষ্টির এবং কাজের অসন্তুষ্টির উপাদানগুলি পরস্পর বিপরীত বিন্দুতে না থেকে একই বিন্দুতে (unipolar traits) অবস্থান করে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় কাজ করে। কাজের Hygiene উপাদান হচ্ছে নিবারণমূলক (preventive)। শরীরের ক্ষেত্রে যেমন স্বাস্থ্যবিধি অনেকটাই নিবারণমূলক, তেমনই কোন কাজের ক্ষেত্রে নিবারণবিধির প্রয়োগকে কার্য্যকর হতে দেখা যায়। তাই Hygiene বা নিবারণবিধির তত্ত্বকে হার্জবার্গের তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কারণ Hygiene উপাদানগুলি হচ্ছে কাজের অসন্তুষ্টির উপাদান।

নিবারণমূলক উপাদানের চাইতে কর্মস্পৃহা বা কাজের প্রেষণা (Motivation) অনেক বেশি উপযোগী বলে

হার্জবার্গ মনে করেন। প্রেষণাদীপ্ত উপাদানগুলি কাজকে ক্রমবর্দ্ধমান আকারে ধরে রাখে। অন্যদিকে নিবারণমূলক উপাদানগুলিকে বারে বারে পুনরাবৃত্তি করতে হয়। তাই বারে বারে নতুন আকারে নিবারণমূলক উপাদানকে কার্য্যকর করতে হয়। এক্ষেত্রে উপায় হচ্ছে কাজের সামগ্রিক পরিবেশকে এমনভাবে উন্নত করা যার ফলে শ্রমিকদের কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা বা উদ্দীপনার উপর কোন চিরস্থায়ী আঘাত নেমে না আসে।

অবশ্য যে কোন সংগঠনেই সংগঠনের লক্ষ্য পূরণের সাফল্য অর্জনে কর্মীদেরকে উদ্দীপ্ত করে প্রেষণা বিধি জাগ্রত করার তুলনায় নিবারণমূলক স্বাস্থ্য উপাদান (যেমন, বেতন ইত্যাদি) থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় দ্বারা কর্মীরা কাজে অধিক আগ্রহী হয়। তবে এই ধরনের ভীতি-নীতি যে কোন সংগঠনের সুদূরপ্রসারী অবস্থার পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। তাই কর্মীদেরকে প্রেষণাশক্তি দ্বারা উদ্দীপ্ত করে (motivate) সংগঠন পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়। এই জন্য হার্জবার্গ কাজের উন্নতি (job enrichment) এবং উল্লম্ব দৃষ্টিভঙ্গী (vertical knowledge)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

"কাজের উন্নতি" বলতে বোঝায় এমন এক কৌশল যার সাহায্যে সংগঠনের পরিচালকবর্গ দ্বারা প্রত্যেক কর্মীকে প্রেষণা শক্তিতে উদ্দীপিত (motivate) করা হয়। এটাই কাজের সন্তুষ্টির প্রকৃত উৎস। কাজের উন্নতির ধারণায় উৎপাদন ও পরিচালনা হওয়া চাই লাভজনক। কর্মী তথা জনসাধারণের পক্ষেও কাজের অভিজ্ঞতা হবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'কাজের উন্নতি'-র তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে যে—কর্মীবৃন্দ নিজেদের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদেরকে কাজে নিয়োজিত করেন। অর্থাৎ কাজের নিজস্ব ধরনই কর্মীগণকে কাজে উদ্দীপিত করে। এখানে কাজের বাহ্যিক উপাদান—যেমন পুরস্কার, শাস্তি বা পরিবেশই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয়।

হার্জবার্গ বলেন যে, কর্মীর কাজের—উন্নতিতে পরিচালকবর্গ প্রায়শই কর্মীর ব্যক্তিগত অবদানকে ন্যূনতম করে তোলার চেষ্টা করতে পারেন। কর্মীর কাজের মধ্য দিয়ে কর্মীর উন্নতিতে পরিচালকবর্গ ততটা আগ্রহী হন না। হার্জবার্গ একে "কাজের অনুভূমিক ভার" (horizontal job loading) বলে অভিহিত করেন। এই 'অনুভূমিক কাজের ভার' কাজের উদ্দীপক "কাজের উল্লম্ব ভারের" (vertical loading)-এর বিরোধী। অন্যভাবে বলা যায় যে, কর্মীদের সমষ্টিগত কাজের দিকেই পরিচালকবর্গ বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ পরিচালকবর্গের প্রধান লক্ষ্য থাকে (horizontal job loading) অর্থাৎ "কাজের অনুভূমিক ভার"-এর প্রতি। এই অনুভূমিক ভার কেন্দ্রীক পরিচালনা কিন্তু vertical loading বা "কাজের উল্লম্ব ভারের" বিরোধী। এই "উল্লম্ব ভার" কর্মীর ব্যক্তিগত রীতিকে "সমষ্টিগত" ও "ব্যক্তিগত" ভাবে কাজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে।

১৬.৬ হার্জবার্গের তত্ত্বের সমালোচনা

হার্জবার্গের দুই উপাদান তত্ত্বের ব্যাপক প্রয়োগ ও জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও হার্জবার্গের তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করা হয়। হার্জবার্গ ফ্রেডারিক টেলর অনুসারী নন। যদিও ভিন্নভাবে টেলর-এর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন হার্জবার্গের চিন্তায় এসে যায়। টেলর-এর এই বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বের শিল্প-যন্ত্রবিদের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করায় হার্জবার্গ সমালোচিত হয়েছেন। হার্জবার্গের তত্ত্ব অধিকতরভাবে পরিচালকবর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তদারকি আধিকারিক বা সাধারণ কর্মীদের ক্ষেত্রে হার্জবার্গের তত্ত্ব ততটা প্রযোজ্য নয়। বেতন বা মজুরি কখনও কাজের সন্তুষ্টির উপাদান হ'তে

পারে। আবার কখনও কাজের অসন্তুষ্টির উপাদানও হ'তে পারে। বিশেষতঃ নিম্ন আয়সম্পন্ন কর্মীর ক্ষেত্রে। প্রায়শই দেখা যায় যে, উচ্চ বেতন অথবা মজুরি কর্মীর স্বীকৃতি ও আত্মসম্ভ্রম বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং উচ্চ বেতন হচ্ছে কাজের সন্তুষ্টি বিধায়ক উপাদান।

হার্জবার্গের বিরুদ্ধে অন্যান্য সমালোচনা হ'ল যে—(১) কোন একটি বিষয় বা উপাদান দ্বারা একজন শ্রমিকের কাজ সম্পর্কে সন্তুষ্টি আসে, কিন্তু ঐ একই উপাদান বা বিষয় দ্বারা অন্য শ্রমিক কাজ সম্পর্কে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে না ; (২) একই বিষয় বা উপাদান একই শ্রমিকের মধ্যে কাজ সম্পর্কে সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি উভয়ই সৃষ্টি করতে পারে ; (৩) কাজ সম্পর্কে সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির ব্যাপারে যে কোন কাজের বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা—সাংগঠনিক সুস্বাস্থ্যগত উপাদান (motivation-hygiene factors) ধারণার বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হ'ল যে, প্রথমেই এখানে কাজকে ব্যাখ্যা করা হয় এবং মালিকপক্ষের কাজ-সংক্রান্ত উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়। কিন্তু আজকের দিনে দেখা যায় যে, মালিক পক্ষের এই সকল উপাদান 'প্রেষণা' এবং 'সুস্বাস্থ্য'—উভয়প্রকার উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন, মজুরি বা বেতন অর্থাৎ নগদ অর্থ প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা (motivation) হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ নিম্ন আয়ভোগীদের ক্ষেত্রে কাজ করে। আবার দেখা যায়, একটি প্রশাসনিক সংগঠনের কাজের বিভিন্ন স্তরে প্রেষণা এবং সুস্বাস্থ্যগত উপাদান ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে। এছাড়া শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে কাজের পরিবেশ 'সন্তুষ্টি' উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে বা নাও পারে। অর্থাৎ কাজের পরিবেশে উপযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী নিযুক্ত হ'লে 'সন্তুষ্টি উপাদান' দেখা দিতে পারে।

দুই-উপাদান ঃ প্রেষণা-সুস্বাস্থ্যগত উপাদান (motivation-hygiene) তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা সত্ত্বেও কাজের প্রেষণা বা স্পৃহার এবং সংগঠনের পরিবেশকে সুস্বাস্থ্যগত উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। গুরুতব দান করার ব্যাপারে হার্জবার্গের অমূল্য অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। অতীতে একটি কাজের মধ্যে প্রেষণা বা স্পৃহার উপাদানকে একেবারে উপেক্ষা করা হ'তো। কাজের সম্পাদন নয়, কাজের উন্নতিবিধানের ধারণা জন-প্রশাসনে প্রবর্ত্তন করায় হার্জবার্গের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৬.৭ আব্রাহাম মাসলোর তত্ত্বের অর্থ ও প্রকৃতি

মানুষের প্রয়োজন ও প্রেক্ষা দ্বারা প্রশাসনের আচরণ ব্যাখ্যায় আব্রাহাম মাসলোর নিজস্ব অবদান হচ্ছে—প্রয়োজনীয়তার স্তর বিন্যাসের তত্ত্ব (Needs Hierarchy)। এই তত্ত্ব তিনি উপস্থিত করেছেন মানুষের কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা ব্যাখ্যায়। মাসলোর মতে আচরণ (behaviour) এবং প্রেষণা (motivation) এক বস্তু নয়। আচরণের অন্যতম একটি নির্ধারক হচ্ছে প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা। আচরণের পেছনে সব সময় কোন প্রেষণা বা স্পৃহা কাজ করে। এগুলি হলো বিশেষ করে জৈবিক, সাংস্কৃতিক ও পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনবোধ। মানুষের আচরণের ভিত্তি হিসেবে মানুষের "প্রয়োজন"-কে (Needs) ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে প্রেষণা তত্ত্ব বা কর্মস্পৃহার তত্ত্ব (Theory of Motivation) মাসলো ব্যাখ্যা করেছেন।

১৬.৮ মাসলোর 'প্রয়োজন' ধারণার ব্যাখ্যা

মাসলোর মতে, মানুষের 'প্রয়োজন' একটি স্তর বিন্যস্ত কাঠামোতে বিধৃত থাকে। এই স্তর বিন্যস্ত কাঠামোর সর্বনিম্নস্তরে থাকে জৈবিক প্রয়োজনীয়তা ও নিরাপত্তাজনিত প্রয়োজনীয়তা। সর্বোচ্চস্তরে থাকে আত্মোপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে সামাজিক ও আত্মমর্যাদার প্রয়োজনীয়তা। সর্বনিম্নস্তরের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হ'লেই সর্বোচ্চস্তরের প্রয়োজনীয়তা পূরণ সম্ভব হ'তে পারে। মাসলোর মতে প্রয়োজনীয়তার স্তরবিন্যাসের রূপরেখার সর্বোচ্চ স্থানে থাকে আত্মোপলব্ধি। তারপর ক্রমান্বয়ে নীচে থাকে মর্যাদা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং জৈবিক প্রয়োজনীয়তা।

মাসলো এই পাঁচ প্রকার প্রয়োজনের [(১) জৈবিক প্রয়োজন, (২) সামাজিক নিরাপত্তাজনিত প্রয়োজন, (৩) আত্মমর্যাদার প্রয়োজন, (৪) সামাজিক মর্যাদার প্রয়োজন, (৫) আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন।] বিশদ আলোচনার পর বলেছেন যে, এই পাঁচ প্রকার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে বিভাজনের কোন কঠিন রেখা নেই। যেমন কোন ব্যক্তি সামাজিক প্রয়োজনীয়তার তুলনায় আত্মমর্যাদাকে বড় আকারে দেখতে পারেন। আবার কোন ব্যক্তি সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয়তার জন্য নিম্নস্তরের জৈবিক প্রয়োজনীয়তাকে বিসর্জন দিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনের স্তরবিন্যাসের ধারণা হচ্ছে একটি শিথিল ধারণা, কারণ "প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি" বা সন্তুষ্টিবিধান হচ্ছে একটি আপেক্ষিক বোধ। নিম্নস্তরের প্রয়োজন পূরণের পর উচ্চস্তরের প্রয়োজন হঠাৎ হয় না, তা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত ঃ সাধারণ মানুষ নিজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ততটা সচেতন থাকে না।

চতুর্থত ঃ সমাজ ও সংস্কৃতি নিরপেক্ষভাবে মানুষের প্রয়োজন বা আকাঙ্খা প্রায় একই রকমের থাকে।

পঞ্চমত ঃ মানুষের আচরণ বহু প্রকার স্পৃহা বা প্রেষণা দ্বারা পুষ্ট হ'তে পারে। তাই কেবল একটি "প্রয়োজন" দ্বারা মানুষের আচরণ কখনও নির্ধারিত হয় না।

সর্বশেষে, প্রয়োজনীয়তার পরিতৃপ্তি বা পরিতৃপ্ত প্রয়োজন কখনও "প্রেষণা" হিসেবে কাজ করতে পারে না।

১৬.৯ মাসলোর তত্ত্বের সমালোচনা

মাসলোর "প্রয়োজনের স্তর কাঠামো" তত্ত্বকে পরিশীলিতবোধ, তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রয়োজনের কাঠামোর গঠনাকৃতির কারণে সমালোচনা করা হয়। অনেকে বলেন যে, সব সময় "প্রয়োজন" নিম্নস্তর থেকে উর্ধ্বস্তরে যায় না। এছাড়া, মাসলোর "আত্মমর্যাদার" ধারণাটিও অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট।

প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা ঃ উপরোক্ত সমালোচনা সত্বেও মাসলোর তত্ত্ব "প্রেষণা" আলোচনার ক্ষেত্রে গবেষণার নূতন দিক উন্মোচিত করেছে। ডানহামের মতে, মাসলোর তত্ত্ব শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়তার স্তর উপলব্ধি করতে এবং সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক-কর্মচারীগণকে বিশেষ সুযোগ ও পুরস্কার প্রদান করতে বিশেষ উপযোগী।

১৬.১০ সারাংশ

এই এককে হার্জবার্গের কর্মস্পৃহা সাংগঠনিক সুস্বাস্থ্যগত তত্ত্ব আলোচনা করে এই তত্ত্বের কার্যকরী করে শক্তিগুলিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হার্জবার্গ আমাদের দেখিয়েছেন যে, কর্মীদের মধ্যে নানা অসন্তুষ্টির কারণগুলি সমাধান না করলে কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা বৃদ্ধি ব্যহত হয়। অপর দিকে মাসলোর তত্ত্ব বলে কর্মীর প্রতিদিনের জীবনে নানা প্রয়োজনগুলি কর্মীর মধ্যে কর্মস্পৃহা জাগিয়ে তোলে। তবে এই দুটি তত্ত্ব কোনটিই সমালোচনা মুক্ত নয়।

১৬.১১ অনুশীলনী

অনুশীলনী—১

১। "কাজের উন্নতি-তত্ত্বের" মূল কথা কি?

২। কাজের "সন্তুষ্টি" এবং "অসন্তুষ্টি"-র ব্যাপারে হার্জবার্গকে কিভাবে সমালোচনা করা হয়ে থাকে?

৩। হার্জবার্গের দুই উপাদানের তত্ত্ব কি?

অনুশীলনী—২

৪। আব্রাহাম মাসলোর তত্ত্ব "প্রয়োজন স্তরবিন্যাস"-এর স্তরগুলি উল্লেখ করুন।

৫। "প্রয়োজন স্তরবিন্যাস" তত্ত্বটিকে কিভাবে সমালোচনা করা হয়ে থাকে?

১৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

1. Chandan J. S : *Management Theory & Practice.* Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1987.

2. S. R. Maheswari : *Administrative Thinkers.*

3. Prasad Ranindra D. (et) : *Administrative Thinkers.* Sterling Publishers. New Delhi, 1989.

পরিশিষ্ট—১ ঃ

হার্জবার্গের দুই উপাদান তত্ত্বকে (Motivation-Hygiene) নিম্নলিখিত ছক আকারে প্রকাশ করা যায়—

সাংগঠনিক সুস্বাস্থ্যগত উপাদান	প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা
(Hygiene/maintenance factors)	(Motivators)
সাংগঠনিক নীতি এবং প্রশাসন	প্রেষণা বা কর্মস্পৃহা সাফল্য
(Company policy and Administration)	(Achievement)

তদারকি	স্বীকৃতি
(Supervision)	(Recognition)
বেতন বা মজুরি	নির্দিষ্ট কাজটি
(Salary)	(Work itself)
ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ	দায়িত্ব
(Interpersonal Relations)	(Responsibility)
পারিপার্শ্বিক কাজের পরিমণ্ডল	অগ্রগতি
(Physical Working Conditions)	(Advancement)

পরিশিষ্ট—২ ঃ

মাসলোর "প্রয়োজন স্তরবিন্যাস" ঃ

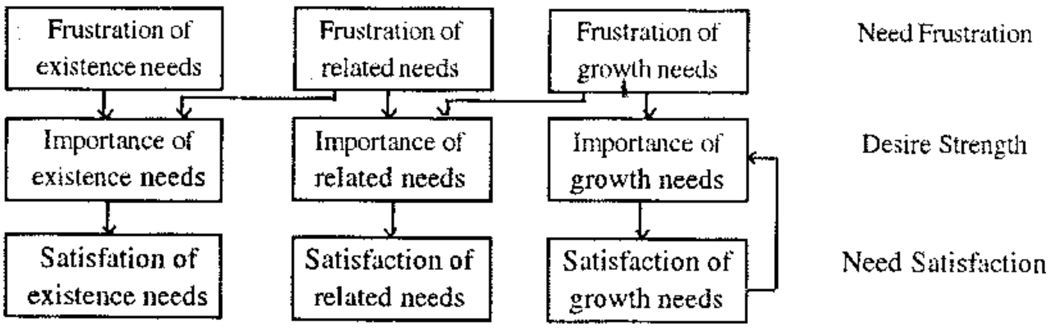

একক ১৭ ❑ ডগলাস ম্যাক্‌গ্রেগরের পরিচালন তত্ত্ব (McGregor's Theory of Management) এবং কৃস আরগিরিস-এর তত্ত্ব (Theory of Chris Argyris)

গঠন

১৭.০ উদ্দেশ্য

১৭.১ প্রস্তাবনা

১৭.২ ম্যাক্‌গ্রেগর "X" তত্ত্ব

১৭.৩ ম্যাকগ্রেগর "Y" তত্ত্ব

১৭.৪ কৃস আরগিরিস তত্ত্ব

১৭.৫ কৃস আরগিরিসের তত্ত্বের সমালোচনা

১৭.৬ সারাংশ

১৭.৭ অনুশীলনী

১৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১৭.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- ডগলাস ম্যাক্‌গ্রেগর "X" তত্ত্বের অর্থ ও প্রকৃতি
- তাঁর পরিচালনা সংক্রান্ত "Y" তত্ত্ব
- কৃস আরগিরিসের কর্মী সম্পর্কের উপর ব্যাখ্যা করে পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন ধ্যানধারণার বিশ্লেষণ।

১৭.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি জন-প্রশাসন তত্ত্বে শেষ পর্যায়ের শেষ একক। শেষ এককে পরিচালনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। ডগলাস ম্যাক্‌গ্রেগর একজন সুখ্যাত আচরণবাদী এবং মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাবিদ। তাঁর পরিচালনার "X" তত্ত্বটি সংগঠন পরিচালনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে থাকে। একই সঙ্গে তাঁর "Y" ধারণাটি তার

পূর্বতন ''X'' তত্ত্বের আধুনিক রূপ দিয়ে থাকে। কৃস আরগিরি সংগঠন পরিচালনার কর্মী সম্পর্কের উপর যে তত্ত্বটি জ্ঞাত করিয়েছেন এই এককের শেষে তাই আলোচিত হবে। পরিশেষে দুটি তত্ত্বেরই মূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে।

১৭.২ ডগলাস ম্যাক্‌গ্রেগর ''X'' তত্ত্ব

১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় ডগলাস ম্যাক্‌গ্রেগরের বিখ্যাত গ্রন্থ The Human Side of the Enterprise। এই গ্রন্থটি শিল্প পরিচালনায় একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সংগঠন শাস্ত্রের তাত্ত্বিক হিসেবে ম্যাক্‌গ্রেগর মনে করতেন যে, পরিচালনার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ পরিচালকদের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতর বাইরে থেকে আসে অর্থাৎ শুধুমাত্র কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার চেয়ে বেশি কিছু। ম্যাক্‌গ্রেগর বলেন যে, সর্বোচ্চ প্রশাসকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে—"কর্মীবৃন্দকে পরিচালনা করার জন্য সব থেকে কার্যকরী কৌশল কি হতে পারে?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলেন যে, মানুষের আচরণ বা কার্যকলাপকে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করার উপায় দুটি—(১) বলপ্রয়োগ দ্বারা বাধ্যতামূলক উপায়ে কর্মীদেরকে কাজ করানো অথবা (২) কর্মীদেরকে উদ্দীপিত করে কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা শক্তি দ্বারা স্ব-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাজ করানো।

নানাপ্রকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাঁর এই ধারণাকে তিনি পরীক্ষা করে তাঁর মতের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর তত্ত্ব ''X'' এবং ''Y'' তত্ত্ব নামে অধিক পরিচিত

''X'' তত্ত্ব অধুনা প্রচলিত অনেক তত্ত্বসমূহের মধ্যে দেখা যায়। ''X'' তত্ত্বের প্রধান কয়েকটি ধারণা হলো যে,—

(১) মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করতে চায় না। মানুষের প্রবৃত্তি হচ্ছে কাজে ফাঁকি দেওয়া;

(২) তাই মানুষকে কাজ করানোর জন্য পরিচালনা, নির্দেশের প্রয়োজন হয় এবং কাজের সঙ্গে শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন;

(৩) সাধারণ মানুষরা খুব উচ্চাকাঙ্খী নয় বলে নিজেদের নিরাপত্তাকে প্রধান বিষয় বলে গণ্য করে এবং নিজেরা দায়িত্ব এড়িয়ে অপরের নির্দেশেই কাজ করতে আগ্রহী থাকে।

এই সমস্ত ধারণা সংগঠন পরিচালনায় নানাভাবে কাজ করে বলে ম্যাক্‌গ্রেগর মন্তব্য করেছেন। এই সমুদয় ধারণা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। তার ফলে প্রশাসনের প্রতি কর্মীদের এক ধরনের পিতৃতান্ত্রিক নির্ভরতার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে দেয়।

ম্যাক্‌গ্রেগর বলেন যে, যতক্ষণ প্রশাসনিক সংগঠনে ''X'' তত্ত্ব কাজ করে ততক্ষণ সংগঠন পরিচালনায় সাধারণ কর্মী বা মানুষ থেকে সম্ভাব্য সকল শক্তি ও সহযোগিতা প্রশাসনের পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর হয় না।

তাই ম্যাক্‌গ্রেগর 'Selective adaption' বা 'পরিস্থিতিকে মানিয়ে চলা'র সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি দ্বারা প্রশাসন পরিচালনার কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ''X'' তত্ত্বের বিপরীত ''Y'' তত্ত্ব উপস্থিত করেন।

১৭.৩ ডাগলাস ম্যাক্‌গ্রেগর "Y" তত্ত্ব

"Y" তত্ত্বের ধারণা অনুসারে—

(১) খেলাধূলা বা বিশ্রামের মতোই কাজকে গ্রহণ করে মানুষ ;

(২) স্ব-নির্দেশের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে বলেই মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে কাজে আত্মনিয়োগ করে ;

(৩) সংগঠনের লক্ষ্যে ও কার্য পরিচালনায় যুক্ত হওয়াকে কর্মী নিজের পুরস্কার বলে গণ্য করে ;

(৪) সাধারণ মানুষ সাধারণ পরিস্থিতিতে যে কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে, শুধু তাই নয়, কাজের প্রতি দায়িত্বশীল থাকে ;

(৫) সংগঠন পরিচালনার সমস্যাসমূহের সমাধানের বিষয়টি ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ;

(৬) আধুনিক শিল্প সভ্যতার যুগে সাধারণ মানুষের বৌদ্ধিক ক্ষমতার কেবলমাত্র আংশিক প্রকাশ ঘটে।

ম্যাক্‌গ্রেগরের তত্ত্ব অনুসারে প্রশাসন-পরিচালনা ব্যবস্থায় কর্মীরা যদি অলস, উদাসীন, দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক, অসহযোগী, সৃজনশীল-প্রতিভাহীন হন তাহলে ত্রুটি হচ্ছে পরিচালকবর্গের সংগঠন পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির ;

"Y" তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে প্রশাসন-পরিচালনায় কেন্দ্রীয় নীতি হবে কর্মীর মধ্যে সহযোগিতা ও সংহতি বৃদ্ধি। কারণ এর দ্বারা সংগঠনের সাফল্যের সাথে কর্মীবৃন্দ নিজেদের সাফল্যকে যুক্ত করতে পারে।

ডাগলাস ম্যাক্‌গ্রেগর তাঁর "Y" তত্ত্বকে অভিনব তত্ত্ব বলে অভিহিত করেছেন। তিনি কয়েকটি পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ব দ্বারা সংগঠন পরিচালনা সমর্থন করলেও সকল পরিস্থিতিতে, সকল সময় কর্তৃত্ব দ্বারা সংগঠন পরিচালনা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে, কর্মীদের পরিচালনা-দক্ষতা অর্জনের জন্য চাই—

(ক) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা প্রত্যর্পণ

(খ) কাজের পরিধির বিস্তৃতি

(গ) পরিচালনায় পরামর্শদান ও অংশগ্রহণ

(ঘ) কাজের মূল্যায়ন।

ম্যাক্‌গ্রেগর পরিচালন-ব্যবস্থাকে উত্তেজনামুক্ত করে দলগত মনোভাব তৈরী করার জন্য তিনটি কৌশলের উল্লেখ করেছেন—

(ক) বিভাজন ও শাসন

(খ) মতপার্থক্যকে দমন

(গ) মতপার্থক্যের মধ্য দিয়েই কাজ করা।

প্রথম দুইটি নীতি "X" তত্ত্বের প্রতিফলন এবং শেষ নীতিটি "Y" তত্ত্বের প্রতিফলন।

একজন পেশাদারী দক্ষ প্রশাসক নিজেকে কর্মীদের পারস্পরিক বিদ্বেষ, গুপ্ত আচরণ এবং রাজনীতি থেকে রক্ষা করবেন। শুধু তাই নয়, সকল ধরনের মতপার্থক্যকে নিয়েই উদ্ভাবনী শক্তির উপর নির্ভর করে সংগঠনের সিদ্ধান্ত রূপায়ণে ও কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার জন্য কর্মীদের নানা ধরনের পার্থক্যকে কাজে লাগাবেন।

১৭.৪ কৃস আরগিরিস তত্ত্ব

কৃস আরগিরিস সংগঠনের সঙ্গে কর্মীর সম্পর্কের উপর অধিক আলোকপাত করেছেন। সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও কর্মীর ব্যক্তিগত মানসিকতার দ্বন্দ্বকে বিশদ আকারে গুরুত্বদান করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেকটি শ্রমিক-কর্মচারীর ব্যক্তিগত প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে পারলে সংগঠন উপকৃত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল যে, প্রচলিত সংগঠন তত্ত্ব সমূহে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মীর ব্যক্তিগত প্রতিভার বিকাশকে বাধা দেওয়া হয়। কর্মীর মনস্তত্ত্বকে ঠিক মত গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

আরগিরিস বলেন যে, প্রশাসনের আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক চাহিদা ও কর্মীদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের মধ্যে কিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায়। উদাহরণ—সংগঠনের নীতিসমূহ যেমন—শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ যদি কঠোরভাবে অনুসৃত হয় তাহলে কর্মীদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবার পরিবর্তে কর্মীরা ক্রমশঃ পরিচালকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কর্মীগণ নিস্পৃহ ও উদ্যমহীন হয়ে পড়ে। ফলে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক সংগঠন বা কাঠামো নিজের কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিগত হতাশা ও বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করবে।

পরিচালকের নিয়ন্ত্রণ যদি অত্যধিক হয় তাহ'লে কর্মীরা তাদের উর্ধ্বতন কর্মী বা ওপরওয়ালার (Boss) প্রতি নির্ভরশীল থাকেন। বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণে কর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত তদারকি-আধিকারিকদের সম্পর্কে কর্মীরা আতঙ্কে দিন কাটায়। ফলে কর্মীদের উৎসাহ কম দেখা যায় এবং কাজ কম হয়। এমতাবস্থায় আর্থিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের ফলে কর্মীদের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় সংগঠনের ক্ষতি হয়। এই ক্ষতিকে মানবিক ক্ষতি বা human loss বলে অভিহিত করা হয়।

এযাবৎ সংগঠনে কর্মীদের কায়িক ও বৌদ্ধিক উন্নতির উপর গুরুত্ব অরোপ করা হয়ে এসেছে। যদি কর্মীরা পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে সংগঠন অধিকতর ভালোভাবে কাজ করতে পারে বলে মনে করা হয়।

আরগিরিসের মতে, প্রশাসনিক নেতৃত্বের কাজ হ'ল সংগঠনের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ বুঝতে কর্মীকে সাহায্য করা, কর্মীদের আকাঙ্খাকে বাস্তবানুগ করে তোলা এবং কর্মীদেরকে আন্তঃব্যক্তি সম্পর্কের মুখোমুখি করানো। এই অবস্থায় প্রত্যেক কর্মী তার নিজের কর্মক্ষেত্রে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ অধিকমাত্রায় বজায় রাখতে পারে ও তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে অধিকতর অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

১৭.৫ কৃস আরগিরিসের তত্ত্বের সমালোচনা

প্রথমত ঃ সংগঠনের সঙ্গে কর্মীর সম্পর্ক এবং কর্মীর আত্মবিকাশ সম্পর্কে তার ধারণাকে অতি-কাল্পনিক বলা হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ কর্তৃত্বকে যেভাবে আরগিরিস অপছন্দ করেছেন সেটাকে তাঁর অতিরিক্ত ভীতিজনিত উদ্বেগ বলা হয়।

তৃতীয়ত ঃ সংগঠনে কর্মীরা কেবলমাত্র কর্তৃত্বের বিরোধী মনোভাব পোষণ করে—এই রকম একটি ধারণা অভিজ্ঞতাবাদী তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। বরং অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, অনেক শ্রমিক-কর্মচারী কর্তৃত্ব ও সংগঠনের লক্ষ্যকে মেনে নিয়েছে, কারণ এই দুটি বিষয়ই তাদের প্রয়োজনীয় স্বার্থকে পূরণ করে।

তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আরগিরিস মানবিক সম্পর্ক তত্ত্বের বিভিন্ন দিককে যথেষ্ট ভালোভাবে আলোচনা করেছেন এবং সংগঠনের পরিচালনায় কর্মীদের "অংশীদারী" তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১৭.৬ সারাংশ

এই এককে ডগলাস ম্যাক্‌গ্রেগরের তত্ত্বটি সংগঠন পরিচালনায় তাত্ত্বিক মূল্য কতখানি তা দেখানো হয়েছে। নানাপ্রকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাঁর এই ধারণাকে তিনি পরীক্ষা করে তাঁর মতের যে সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা জন-প্রশাসনে 'X' এবং 'Y' নামে খ্যাত। অন্যদিকে কৃস আরগিরিস সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও কর্মীর ব্যক্তিগত মানসিকতার উপর বিশদ আকারে গুরুত্বদান করেছেন। তবে দুটি তত্ত্বেরই সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা আছে বলেই জন-প্রশাসনের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পঠন বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আশাকরি নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে জন-প্রশাসন তত্ত্বের চারটি পর্যায় পড়ে আপনারা এই জন-প্রশাসন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছেন। জন-প্রশাসন সম্পর্কে পরবর্তী অন্যান্য পর্যায় পড়ার জন্য আগ্রহী হয়ে থাকবেন।

অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য তাঁর New Horizons of Public Administration, (১৯৯৮) গ্রন্থে কর্মস্পৃহা বা প্রেষণাকে (Motivation) সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন। তাঁর চিন্তা অনুসারে Motivation in ''What makes a man work or withdraw from work''. অর্থাৎ কর্মস্পৃহাই মানুষকে কাজে অনুপ্রাণিত করে অথবা কখনো কর্মবিমুখ করে তোলে।

সর্বোপরি অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বৃহত্তর রাজনৈতিক সমাজে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেভাবে রাজনীতি পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় ঠিক সেই একইভাবে ক্ষুদ্রাকার সংগঠন পরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এবং সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় কর্মীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং বলা যায় যে, রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং সাংগঠনিক তত্ত্ব "অংশগ্রহণের"-র প্রশ্নে এক জায়গায় সংযুক্ত হয়ে অবস্থান করতে পারে। তাই বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রশাসন পরিচালনা পদ্ধতি উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

কাজের প্রেষণা বা কর্মস্পৃহার আলোচনার উপসংহারে বলা যায় যে, কর্মীদের কাজে স্পৃহা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সংগঠনের গণতান্ত্রিক পরিচালন-ব্যবস্থা সর্বাধিক কার্যকরী ব্যবস্থা। পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থায় থাকায় সংগঠন পরিচালনায় বা কারখানার উৎপাদনে কর্মীদের কর্মস্পৃহা বা প্রেষণা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো অনুন্নত দেশে এবং আধাগণতান্ত্রিক সমাজে (সামন্ততান্ত্রিকতা ও ঔপনিবেশিকতায় জর্জরিত সমাজে) কিংবা কমিউনিস্ট সমাজে (পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনে) গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া যদি সংগঠন পরিচালনার সর্বস্তরে থাকে তাহলে বিপরীত ফল দেখা যায়। কর্মস্পৃহার বদলে কর্মবিমুখতা দেখা যায়। তাই অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, কর্মীদের কর্মস্পৃহা থাকার জন্য গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়া কেবল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ও গণতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব।

১৭.৭ অনুশীলনী

১। ম্যাক্‌গ্রেগর-এর "X" তত্ত্বের আলোচনা করুন।

২। ম্যাক্‌গ্রেগর তাঁর "Y" তত্ত্বকে অভিনব আখ্যা দেন কেন?

৩। পরিচালন ব্যবস্থাকে উত্তেজনা মুক্ত করতে কি কি ব্যবস্থার নির্দেশ দেন?

৪। সংগঠনে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আরগিরিস কি মত ব্যক্ত করেন?

৫। সাংগঠনিক চাহিদার কঠোরতা কর্মীর ব্যক্তি উদ্যোগ-এর ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলে?

৬। সংগঠনের মানবিক ক্ষতি (human loss) বলতে কি বোঝায়?

৭। কর্মস্পৃহা সৃষ্টিতে সংগঠনের ভূমিকা কি?

৮। গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতি অনুন্নত দেশ বা অর্ধগণতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক সমাজে কর্মস্পৃহার ওপর কি প্রভাব বিস্তার করে?

১৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Mohit Bhattacharya : *New Horizons of Public Administration.*

2. S. R. Maheswari : *Administrative Thinkers.*

3. D. Ravindra Prasad, V. S. Prasad, P. Satyanarayana : *Administrative Thinkers.*

4. রুমকি বসু, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ঃ লোক প্রশাসন।